ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

প্রথম বর্ষ □ নবম সংখ্যা □ জানুয়ারি ২০১৩ □ ৩০ টাকা

Subscribe Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

ছেলেবেলা

- বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের ‘ছেলেবেলা’ উপহার দিতে পারেন।
- একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ ‘ছেলেবেলা’ পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

অনলাইন গ্রাহক হতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Subscribe online: www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ ফ্যাক্স: ২২৮৭ ৬৪৪৮ ই-মেল: chhelebela@swarnakshar.in

www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

বাঙালিমননে নবতরঙ্গ

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতায় সর্বত্র পাবেন
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

এক বছরের ১২টি সংখ্যার গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

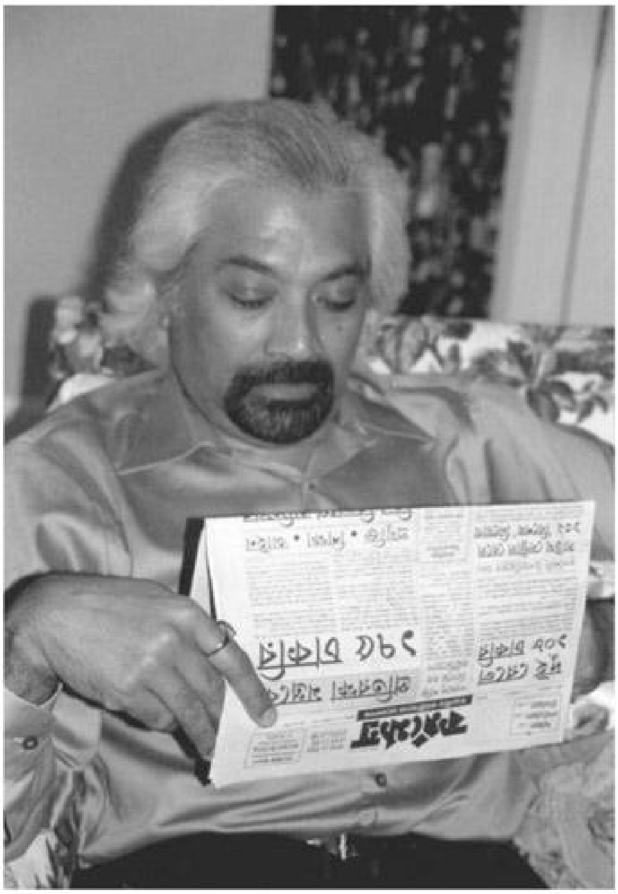

সাম পিত্রোদা: আমেরিকার ওয়ার্ল্ড টেল লিমিটেডের কর্ণধার, আঁত্রেপ্রেনারশিপ ও টেলি-কমিউনিকেশনস্-এ বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সরকারের টেলিকম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। 'রিসার্জেন্স অব বেঙ্গল' কর্মসূচির উপদেষ্টা।

'একবার ভেবে দেখুন গোটা ভারতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেই কত রকম যোগ্যতার কত লোকের দরকার। এরকম আরও নানা ক্ষেত্রে, ধরুন কৃষিনির্ভর শিল্প ফুড প্রসেসিংয়ে, লক্ষ লক্ষ কাজ আছে। আপনি 'কর্মক্ষেত্র'-য় প্রকাশিত যেসব কর্মপরিকল্পনার কথা বললেন, যেমন পাকা তেঁতুল প্যাকেট করা, বা তরমুজের রস বোতলবন্দী করা, কিংবা পাটের জিনিসপত্র বানানো— এগুলো তো গ্রামে গ্রামে শুরু হওয়া দরকার। উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইনফরমেশন টেকনোলজির সুফল এইসব কাজেও প্রয়োগ করা উচিত। সরকারের ভূমিকা এইখানেই। আর পরিকাঠামো জোগানোয়। বাকি সব নিজেদেরই করতে হবে। কাজের জাত বিচার করে যাঁরা বসে থাকবেন তাঁদের জীবন নিয়ে ভাবনায় কোনও ভুল হচ্ছে কি না সেটাই আগে ভাবা দরকার।'

৫ জুলাই, ২০০১-এ বস্টনে একান্ত সাক্ষাৎকারে 'কর্মক্ষেত্র'-র প্রধান সম্পাদককে সাম পিত্রোদা

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

প্রথম বর্ষ। নবম সংখ্যা। জানুয়ারি ২০১৩। মাঘ ১৪১৯

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৫

ক্ষণের বচন ৮। শব্দবক্র ৮।

চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডী লাহিড়ী। পাঠশালার শাস্তি ৭

পু র নো অ্যা ল বা ম

শরৎ প্রসঙ্গ। কালিদাস রায়, কবিশেখর ৬২

কাজের বাংলা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৯

হেঁয়ালির ছন্দ। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০

দেবেশ রায়ের দাওয়াত ৩৩

এবারের অতিথি ছোটগল্পকার

পারভেজ হোসেন

ডুবোচর ৩৩ কড়ির বাজার ৩৬

ধা রা বা হি ক

আমার ছবিজীবন। শুভাপ্রসন্ন ২৫

একাত্তরের দিনগুলি। জাহানারা ইমাম ১৫

গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি। সমরেশ মজুমদার ২৩

বিষাদগাথা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৬৯

নেকড়ের চোখ। দানিয়েল পেনাক ৮২

অনুবাদ মৈত্রেয়ী নাগ

পাঠকের প্রতি

২০১২-র ২ সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'কালের কষ্টিপাথর'-এ ময়লা রঙের কাগজের জন্য যাঁরা ক্ষোভ জানিয়েছেন, তাঁদের সকলকে জানাই, কলকাতায় আমাদের পরিচিত ও বন্ধুপ্রতিম এক ভদ্রলোকের কথায় ভুলে তাঁর দুবাইবাসী বন্ধু কাগজ-ব্যবসায়ীর মাধ্যমে আমরা ইউ-কের মিল থেকে ৬০ মেট্রিক টন এই কাগজ আনিয়ে চূড়ান্ত বিপন্ন। কলকাতাবাসী বন্ধুপ্রতিম ভদ্রলোকের উদ্যোগে ও পুনঃপুনঃ অনুরোধে, সেইসঙ্গে আমাদের পত্রিকা ছাপার উপযুক্ততার সুনিশ্চিত আশ্বাসে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা এই কাগজের অর্ডার দিয়েছিলাম।

পাঠকদের জানাই, চূড়ান্ত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও ওই নিকৃষ্ট কাগজের বদলে আপাতত অনেক বেশি দামের বই-ছাপার সাদা কাগজে 'কালের কষ্টিপাথর' ছাপা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ইউ-কের ময়লা রঙের কাগজের তুলনায় অনেকটাই সাদা, উৎকৃষ্ট কাগজ ফিনল্যান্ডের কারখানা থেকে আনবার ব্যবস্থাও হয়েছে।

মহাজনসঙ্গ। অমিতাভ চৌধুরি

কানন দেবী ১১ সন্তোষকুমার ঘোষ ১৩

ল ঘু ভা ষ - গু রু ভা ব

মৃত্যু: জীবনের প্রথম পাঠ। পবিত্র সরকার ৪৬

ক বি তা র পা তা

পাপিয়া ঘোষালের কবিতা ৫৫

চিত্র: শুভাপ্রসন্ন, বিজন চৌধুরী, রবীন মণ্ডল, জহর দাশগুপ্ত ও প্রকাশ কর্মকার

কবিতা-পরিচয়

'মুখ': প্রেমেন্দ্র মিত্র ৫৭

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা, কবির উত্তর ■ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৬১

ভ্র ম ণ ক থা

তুরস্কের এফেসুস আর পামাক্কুলে। প্রতাপকুমার রায় ৩৯

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ। সবিতেন্দ্রনাথ রায়

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সান্নিধ্যে ৬৫

বুড়োক্রেজি। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢিলটি মারলে... ৮০

সাময়িকপত্রে সেকালের লেখা। বারিদবরণ ঘোষ। বসুমতী ৭৭

নি য় মি ত

কয়েকটি চিঠি ৮৫। বই ঠেক ৮৭। খোলা খাতা ৮৯

প্রচ্ছদচিত্র: ঘুড়ি-উৎসব। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮

ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in

Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

Editor Amarendra Chakravorty.

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

সারা বছর, প্রতি মাসে

ছেলেবেলা

ছোটদের আশ্চর্য পত্রিকা

- ✓বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' উপহার দিতে পারেন।
- ✓একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ 'ছেলেবেলা' পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- ✓চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- ✓যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে।

একবছরের গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে ২৬০ টাকা)

চেক বা M.O. পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

অনলাইন গ্রাহকমূল্য পাঠাতে লগ অন করুন:
www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭ ৬৪৪৮
ই-মেল: chhelebela@swarnakshar.in

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের স্টলে

ছোটদের বই

মহাশ্বেতা দেবীর তুতুল ₹২৫
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বকবকম ₹১৫
কানাইলাল চক্রবর্তীর
চলো দেখে আসি ₹২০ চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫
মৈত্রেয়ী নাগের বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর হীরু ডাকাত ₹৪৫
শাদা ঘোড়া ₹৩০ আমাজনের জঙ্গলে ₹৫০
ছেঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫ গৌর যাযাবর ₹৪০ ঋষিকুমার ₹২০
পাখির খাতা ₹৪০ তালগাছের ডোঙা ₹২০
হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫ আমার বনবাস ₹১২

স্বর্ণাক্ষরের ৩০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বরফের বাগান
১২০ টাকার বই বইমেলায় মাত্র ২০ টাকা

ভ্রমণ বই

বিমল মুখার্জির দুচাকায় দুনিয়া ₹১৫০
নবনীতা দেব সেনের ভ্রমণের নবনীতা ₹৯০
শঙ্খ ঘোষের ইছামতীর মশা ₹১৫০
প্রতাপকুমার রায়ের দেশে দেশে ₹৭৫
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বন্ধুভরা বসুন্ধরা ₹১২০
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া ₹৬০
রবীন চক্রবর্তীর বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে ₹৬০
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণকাহিনী ১ম খণ্ড ₹৩৫০ ২য় খণ্ড ₹২৭৫
ভ্রমণ ট্রেকিং ₹১০০
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর গল্পসংকলন নিমফুলের মধু ₹৬০
কবিতার বই মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা
গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সংগীত ও পরিচালনা: দীপক চৌধুরী
অভিনয়: সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে
ভাষ্যপাঠ: অনসূয়া মজুমদার
গান: স্বপন বসু ও আরও অনেকে

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

আমাদের ওয়েবসাইট:
www.swarnakshar.in
www.bhraman.com
www.ebhraman.com
www.ekashtipathar.com
www.echhelebela.com
www.ekarmakshetra.com

আমাদের সব বই
সব পত্রিকা
হীরু ডাকাতের সিডি
এখানেও পাওয়া যায়:

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট)
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে।

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর ৩০
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** info@swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

মাঘ ১৪১৯ □ জানুয়ারি ২০১৩

উৎসর্গ

দিব্যেন্দু পালিত

‘বৃষ্টির পরে’ সজল শ্যামল
বাংলার প্রকৃতির বদলে
আমাদের রক্তস্নাত সমাজ
দেখিয়ে দিয়ে
‘সহযোদ্ধা’র অপরাজেয়
বিবেকসঙ্গী করে আপনি
সাহিত্য-পাঠকের মর্মসঙ্গী
হয়ে উঠেছেন।
‘কালের কষ্টিপাথর’-এর
এই সংখ্যা আপনাকে উৎসর্গ
করে আমরা ধন্য।

স ম্পা দ কী য়

তোকে দেখি, মেয়ে, মনে মনে হয় ভয়
শৈশবের শেষে যেন আসন্ন জীবন
… … …
তোকে দেখি; হাত রাখি মাথায় আদরে
আর হয় অনায়ত্ত জীবনের ভয়।

একাদশী/বিষ্ণু দে

‘কালের কষ্টিপাথর’ এখনও বাংলার সাহিত্যিক ঐতিহ্যে যত মনোযোগী, সমকালীন সৃষ্টিশীলতায় ততটাই স্পন্দিত নয়— এ অভিযোগ পাঠকের পাশাপাশি সম্পাদকেরও। এই অভাব বা অসংগতির সমর্থনে নয়, এর অপরিহার্য কারণ হিসেবে বলা যায়, আজকের বহুমুখী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিনোদনের বিপুল বিস্তার দেখে গোড়াতেই বহু পাঠকের মনে বাংলার সাহিত্যসম্পদ ও ভাববৈভব কিছুটা হলেও উসকে দিতে চেয়েছি। লেখকের সাহিত্যসৃষ্টির কালবিভাজনের চেয়ে পাঠকের সাহিত্যমনস্কতার উত্থান-পতন আমাদের বেশি ভাবিয়েছে।

ক্রমশ বাংলার শক্তিশালী সাহিত্যসৃষ্টির অনতিঅতীত পর্ব পাড়ি দিয়ে, শুধু নবীন বর্তমান নয়, আসন্ন ভবিষ্যতের দিকেও ‘কালের কষ্টিপাথর’ এগিয়ে যাবে— এই আমাদের আশা।

ঐতিহ্য থেকে সমকালীনতা, আবার সমকালীনতায় ঐতিহ্যসন্ধান— এ-ই হয়তো সাহিত্যের চিরকালীন যাত্রাপথ।

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

বইমেলায় ৩৫৬ নং স্টলে

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

দাম ২০ টাকা

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজ পাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

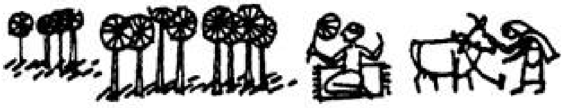

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

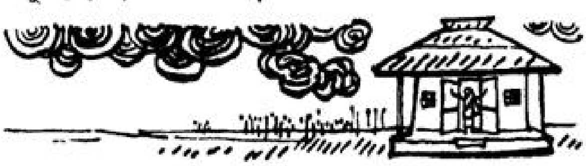

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের

কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

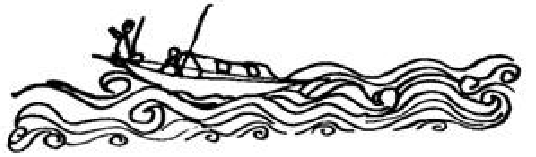

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

অনলাইনে পেতে হলে লগ অন করুন
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

পাঠশালার শাস্তি

লেখা ও ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী

পাঠশালা সম্পর্কে একালের অনেকের কোনও ধারণাই নেই। পাঠশালা আর ইস্কুল এক জিনিস নয়। যদিও দুটি পদ্ধতিতেই লেখাপড়া শেখানো হয়। স্কুলে চেয়ার বেঞ্চ এসব থাকে। পাঠশালায় সবাই মাটিতে চাটাই বা আসন পেতে পড়তে বসে। ইস্কুলে টিচারকে 'স্যার' বলতে হয়। পাঠশালায় শিক্ষককে পণ্ডিতমশাই বলে ডাকাই ছিল নিয়ম।

আমি একবার পাঠশালায় পড়েছিলাম। পণ্ডিতমশাইয়ের হাতের কাছে ছিল দুটি বেত। একটির রং লাল— অন্যটি শুকনো সবুজ। লাল রঙেরটির শুদ্ধ নাম হল রক্তাম্বর, সবুজ রঙেরটির নাম দিগম্বর।

পাঠশালার সবচেয়ে দুষ্টু ছেলেটির নাম মাধাই। একবার খুব দুষ্টুমি করায়, পণ্ডিতমশাই তাকে বেত দিয়ে প্রহার করতে থাকেন। দু-চার ঘা মারার পরেই বেতটি ভেঙে যায়। তখনও তার শিক্ষা পূর্ণ হয়নি। পণ্ডিতমশাই মাধাইয়ের হাতে একটি দা দিয়ে বললেন— যা পাশের বাঁশবাগান থেকে ভালো মতো ছড়ি কেটে আন। চল্লিশ ঘা এখনও বাকি।

মাধাই চালাক। সে জানে সরু লিকলিকে বেত আনলে সে বেত তো তার পিঠেই পড়বে। সে একটা আস্ত বাঁশ কেটে এনে পণ্ডিতকে দিল। এবার পণ্ডিত নিজে জব্দ। বেত দিয়ে যে রকম মেরে সুখ, বাঁশ দিয়ে আদৌ সে রকম মারা যাবে না। পণ্ডিতের নিজের হাত ব্যথা হবে।

ক্ষণের বচন

৪৭

শাসক নিজের বলে ভাবে যে ক্ষমতা
গচ্ছিত রেখেছে সেটা আসলে জনতা

৪৮

সর্বগুণান্বিত যারা নিজেকেই ভাবে
সর্বদোষ দুইবেলা তাকে গিলে খাবে

৪৯

সকলের ভালো যদি চাও
প্রত্যেকের দুঃখে মন দাও
সাফল্যের প্রদীপের নীচে
কেউ কষ্ট পেলে সব মিছে।

৫০

ভালোবাসা রক্তচক্ষু উচ্চরব নয়,
তাকে তুমি বুকে রেখো দুঃখের সময়।
দেশের প্রেমিক যদি দেশের শাসক
সে যেন হৃদয়ে ধরে যা দুঃখ, যা শোক।

৫১

ভালোবাসাই শ্রেষ্ঠ গুণ
মাঘের শীতে কাঠের আগুন

৫২

আইন বাঁচিয়ে বড় বেআইনি কাজ—
বংশীধ্বনি দিয়ে ঢাকে বাজের আওয়াজ

ক্ষণকথক

শব্দবক্র

৪৭। ঠেসবিন্যাস

বিশেষ্য; সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের আগে কোনও বক্তব্যের মধ্যেকার আক্রমণাত্মক বাক্যগুলির শানিত সমাবেশ:
—মাত্র দু'মিনিটে বলা হয়ে যাবে, তার জন্য এত কী লিখছিস?
—লেখা তো কখন হয়ে গিয়েছে। তবে ঠেসবিন্যাসটা ঠিক জুতের হচ্ছে না।

৪৮। শকসংবাদ

বিশেষ্য; খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বিকট ছবি সহযোগে যে খবর জানানোর চেয়ে হানা দেয় বেশি।

৪৯। বিজয়কেত্তন

বিশেষ্য; ভোটে জিতে ক্ষমতাসীন হওয়ার বহুদিন পরও সেই জয়ের নিয়মিত পুনরাবৃত্তি > জেতার পর বছর ঘুরে গেল, দেশে হাহাকার বেড়েছে বই কমেনি, এদিকে তেনাদের বিজয়কেত্তন আর থামে না।

৫০। টনকল্যাণ

বিশেষ্য; জনতার টনক নড়িয়ে কিছু সদভ্যাস তৈরি করার উদ্যোগ > জনকল্যাণ তো অনেক হল, দেশের লোক তো এখনও আবর্জনা কী করে ফেলতে হয় তাই শেখেনি। এবার টনকল্যাণের জন্য একটা দুঁদে টিম তৈরি করো দেখি।

৫১। ভণ্ডালিকা

বিশেষ্য; যে প্রহেলিকার দরুন সর্বোচ্চ ক্ষমতাধিকারী নিজেকে দলিত বা সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতিনিধি ঘোষণা করে বিবিধ সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

৫২। আটদৌড়ে

বিশেষণ; নানা ছোটখাটো কাজে সারাদিন ধরে দৌড়ে বেড়াতে হয় যে চাকরিতে > সকালে ধর্মতলা, দুপুরে গড়িয়া, বিকেলে ঠাকুরপুকুর— এমন আটদৌড়ে কাজের কি কোনও কদর থাকে?

৫৩। ঝুলনযাত্রী

বিশেষ্য; বাসে বা ট্রেনে যে ব্যক্তিকে প্রতিদিন ঝুলে ঝুলে যেতে হয়:
— এই ভিড় ট্রেনে উঠবেন! এক পা বই দু'পা রাখার তো জায়গা নেই...
— আরে আমাদের মতো ঝুলনযাত্রীদের কি অত ভাবলে চলে? উঠে পড়ুন চোখ বুজে, ঠিক অভ্যেস হয়ে যাবে।

শব্দবক্রমুণি

কাজের বাংলা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

। পর্ব ৯ ।

অব্যয়

কথায় কথায় চলে এসেছি অনেক দূর। পাততাড়ি গোটানোর আগে পিছনে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, অনেক কিছু না-বলা থেকে গেল। কেননা অনেক কিছুই আমার নাগালের বাইরে। বাংলা ভাষায় যে পদটির কোনও বিকার নেই, সেটি হল অব্যয়। নির্বিকার হয়েও অব্যয়ের গুণ অনেক। পদ আর বাক্যের মধ্যে হয় সম্বন্ধ ঘটায়, নয় বাক্যের মধ্যে থেকেও নিজেকে আলাদা করে রাখে।

পদান্বয়ী অব্যয়

যেমন: তুমি ওর কাছে থাকো। সঙ্গে, ছাড়া, বিনা, সুদ্ধ, ভেতর, বাইরে, পিছন, সামনে, পাশে ওপরে, জন্যে, চেয়ে— এইরকমের বিস্তর অব্যয় আছে। বাক্যের মধ্যে নামপদের লেজুড় হয়ে বসে ক্রিয়াকে স্থান কাল পাত্র আর প্রকার বিষয়ে হদিশ দেয়।

বাক্যান্বয়ী অব্যয়

এইসব অব্যয় একাধিক বাক্যকে হয় একত্র, নয় পৃথক করে। ও, আর, এবং; বা, অথবা, কিংবা; তবু, কিন্তু, বরং; কারণ, কেননা, সেজন্যে, তাই বলে; যদি-তবে, যেমন-তেমনই, যে-সে, হয়-নয়; তাই, সুতরাং; সবে, হঠাৎ, তৎক্ষণাৎ; না হলে, নইলে, নয়তো। এইসব অব্যয়ে জোড়াতোড়া অর ঠেকো দেওয়ার কাজ হয়। সকাল সকাল যাব আর বেলাবেলি চলে আসব। তুমি বইটা পাঠিয়ে দিও কিংবা আমিই আনাবার ব্যবস্থা করব। কাল বাজার হবে না; কারণ, ওরা কাল বন্‌ধ ডেকেছে। যদি ছাতা থাকত, তবে এভাবে ভিজতে হত না। হয় এস্পার, নয় ওস্পার।

আর আছে নানান ভাব প্রকাশের অব্যয়। অ্যাঁ, বটে, ইস, সত্যি; বাঃ, বেশ, খাসা; ছি, ছ্যা, ধিক; আচ্ছা, আলবৎ, আজ্ঞে, হ্যাঁ; না, আজ্ঞে না, উঁহু; ওরে, ওহে, ধ্যুস, ধুত্তোর, ছাড়ো তো; হায় হায়, সর্বনাশ; কী, কি, কবে, কেন; মতো, যেন, যেমন: যে, না, বা; বিস্ময়, প্রশংসা, নিন্দা, সায়, অস্বীকার, ডাক, বিরক্তি, শোক, জিজ্ঞাসা, তুলনা— মনের যাবতীয় ভাব এইসব অব্যয় দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। যেমন: এ কথা সে বলতে পারল, অ্যাঁ! আ মরি, বাংলা ভাষা। কে এখানে থুথু ফেলল, ছি! যা বলেছ, একেবারে খাঁটি কথা। দূর, এ আমি বলতেই পারি না। ওহে, এদিকে একবার তাকাও। কী জ্বালা, গেল কোথায় লোকগুলো? হায় রে, ওর আর আপন বলতে কেউ রইল না। কী বলো, আমি তাহলে বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে নিই? আহা, তখন নেতারা কী সব দেবতুল্য মানুষ ছিলেন।

আদিমকালের মানুষ প্রকৃতিকে আত্মস্থ করে শুরু করেছিল প্রকৃতিকে বশে আনার চেষ্টা। এই জাদু করার চেষ্টা থেকেই একদিকে ধর্মের, অন্যদিকে বিজ্ঞানের উদ্ভব।

আদিমকালের মানুষ প্রকৃতিকে আত্মস্থ করে শুরু করেছিল প্রকৃতিকে বশে আনার চেষ্টা। এই জাদু করার চেষ্টা থেকেই একদিকে ধর্মের, অন্যদিকে বিজ্ঞানের উদ্ভব।

অনুকার শব্দ

বাংলা ভাষায় এত যে অনুকার শব্দের ছড়াছড়ি, তারও কারণ, কথার জাদু দিয়ে মনস্কামনা পূর্ণ করা।

ভাষার কাজই হল কানে শুনিয়ে মনশ্চক্ষে ছবি ফোটানো। এ কাজে নকলনবিশ অব্যয়ের জুড়ি নেই। তার কিছু নজির দিয়ে এবার এই আসরের পাট ওঠাব।

কিচির মিচির, কুট কুট, কল কল, খুট খাট, খচ খচ, খল বল, গজ গজ, গল গল, গুম গুম, ঘড় ঘড়, ঘিন ঘিন, ঘুর ঘুর। চোঁ চোঁ, চিন চিন, চক চক, ছোঁক ছোঁক, ছম ছম, ছ্যাঁক ছ্যাঁক, জ্বল জ্বল, জব জব, জুল জুল, ঝম ঝম, ঝাঁ ঝাঁ, ঝটপট। টিম টিম, টস টস, টুপ টাপ, ঠুং ঠাং, ঠক ঠক, ঠা, ঠা, ড্যাব ড্যাব, ডিগ ডিগ, ড্যাডাং ড্যাং, ঢুলু ঢুলু, ঢক ঢক, ঢল ঢল। তর তর, তুল তুল, তিড়িং বিড়িং, থল থল, থিক থিক, থই থই, দপ দপ, দুড় দাড়, দমাদম, ধক ধক, ধুপ ধাপ, ধুক ধুক, নড় বড়, নিস্‌পিস, নট খট। পিট পিট, প্যাঁ পোঁ, পটাপট, ফিস ফিস, ফোঁস ফোঁস, ফ্যাল ফ্যাল, বক বক, বিড় বিড়, ব্যা ব্যা, ভুট ভাট, ভোঁ ভোঁ, ভন ভন; ম' ম', ম্যাজ ম্যাজ, মিন মিন। রী রী, রে রে, রই রই, লী লী, লিক লিক, লটর পটর, শোঁ শোঁ, শন শন, শুনশান, সির সির, সপাং, সুড় সুড়, হাহা হিহি, হিড় হিড়, হাপুস হুপুস।

নিখরচায় ফরমাশ খাটে যে অব্যয় পদ, তার খুরে খুরে দণ্ডবৎ হয়ে এখানেই দাঁড়ি টানি।

আগামী সংখ্যায় শেষ

নির্বিকার হয়েও অব্যয়ের গুণ অনেক। পদ আর বাক্যের মধ্যে হয় সম্বন্ধ ঘটায়, নয় বাক্যের মধ্যে থেকেও নিজেকে আলাদা করে রাখে।

হেঁয়ালির ছন্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকস্মৃতি, যা নিয়ে ফোকলোর-বিদ্যা, তার বিপুল উপকরণের একটা বড় ভাগ ছড়া-প্রবাদ-হেঁয়ালির ভাগ। হেঁয়ালি— সেও বহুলতই হেঁয়ালি ছড়া। একটু ভাষার বেঁক আর একটু ছন্দের দোলা দুয়ে জোড়া হয়ে সে হয়েছে স্মরণযোগ্য, উপভোগ্য।

বিদেশেও হেঁয়ালির খেলা দেখতে পাই পার্লার গেমের মধ্যে। কিন্তু দেশ-বিদেশের ধাঁধা-হেঁয়ালির যত সঞ্চয় আজ স্তূপিত হয়ে উঠেছে তার প্রায়টাই পুরনো লোকস্মৃতি। লোকমুখের সেসব হেঁয়ালি-কথার ওপরে সংগ্রাহকের ভাষার ছন্দের দাগরাজি চড়েছে কোথাও, অন্তঃকরণ তাতে হয়তো বদলায়নি।

।।১।।
জ্বালো দীপ, বলো, কতটুকু ওর দীপ্তি!
তবে কোথায় উজালা হয়ে ওঠে আরো দীপটি?

।।২।।
বাবার কাস্তে ঝুলিয়ে রেখেছে
মায়ের কাপড়ে
টানিয়ে,
নীল ঝলমল করে শাড়িখান
তা নিয়ে!
ধার ঝলমল করে কাস্তের
দু ফলা,
নীল শাড়ি দেখি চোখের নিমিষে
রূপোলা।

।।৩।।
ঘুরল ফুলবাগে, প্রান্তরে।
পেরোলো ভরা নদী মন্তরে।
উড়ন ঘোড়াতে সে ঘুরছে দেখে দেখে—
ডিঙিয়ে যায় গিরি, সাত-সাগর।
মাস ছ-মাস যায়, ঘোরে বছর।
বরফ গলে ফের ফুলের, পাখিদের
হাসিতে— ভেঙে যায় ঘুম হঠাৎ!
মিলিয়ে গেছে বাগ, পাখির কুহু ডাক
কালি-জমাট ঘরে তখনও রাত!

।।৪।।
ছোটো ঘুঘুপাখি।
হেন হাট নেই দেখি নে রে ভাই
ছোটো ঘুঘুপাখি।
যে হাটেই যাই— সাজ-খেলাপাতি-
শাক-সবজির—
ঘুঘুপাখি ডাকে কিচিরমিচির।

।।৫।।
পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম রে ভাই— দেখি, এক সে মেটে বাড়ি।
মেটে বাড়ির ভেতর যেতেই দেখি আরেক সে কেঠে বাড়ি।
কেঠে বাড়ির মধ্যে ঢুকি— ও মা! সেথায় এতখানি
সায়রদিঘি কানাকানি।

।।৬।।
বাড়ি ভর্তি
গাড়া ভর্তি,
তুলতে পারো না
হাঁড়ি ভর্তি।

।।৭।।
মরা বাছুরটা ডাকে না— ডোকে না।
লেজে ধরে টান দিয়েছে যেই না,
চার ধারে লোক শুনছে— ও বাবা!
বাছুর ডাকছে— হাম্বা— হাম্বা—

।।৮।।
বাবা রাগ-রাগ,
মা ভারি ঝিমুনো,
হীরের টুকরো
ছেলেমেয়েগুনো,
নাতিনাতনীরা
কাঠের পুতুল,
জাঁতিকাটা ক'রে
ভাঙছে সে ভুল।

।।৯।।
উত্তর দাও তো ধাঁধার?
সে তোমার খুব আপনার!
মাথা না, বা হাত-পা দুটি,
পাট করা চুল, চুনোট ধুতি,
না সখের সামিগ্রিও—
অথচ পরম প্রিয়।

।।১০।।
টায়-টায় উঁচু চার ভাই,
গোটা চাদর মেলেছে একটাই।
চারটে মাথায় চাদরটা বয়
টায়-টায় উঁচু চার ভাই।

।।১১।।
এক পাখির বারোটা ডিম:
চারটি নরম, চারটি গরম,
বাকি চারটি কালো হিম।

।।১২।।
দু ভাই দু বীর
দিনরাত্তির
বোঝা বয়ে বয়ে
প্রাণ অস্থির।
কী বোঝা! কী বোঝা!
বওয়া সে কি সোজা?
খুলে গেল গা-র
ইস্ক্রু-কবজা।
তবু সেও সয়—
কাজে ভরে থাকা,
কাজ ফুরোলেই
একদম ফাঁকা।

।।১৩।।
চোখা নাক, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধাই—
পশু, পাখি— নই কোনোটাই।
রুখে যদি মারো, সে আঘাত
তোমারই করবে রক্তপাত।

উত্তর:
(১) অন্ধকার। *ফিলিপিনো*। (২) আকাশে এক কলা চাঁদ। *সুইডেন*। (৩) স্বপ্ন। *তুর্কি*। (৪) টাকা। *রোরুবা*। (৫) নারকোল। *বিলিতি*। (৬) কুয়াশা। *বিলিতি*। (৭) ঘণ্টা। *সারবিয়া*। (৮) কাঁঠাল। *তেলেগু*। (৯) তোমার নাম। *গেলিক*। (১০) দেয়াল। *তুর্কি*। (১১) বর্ষা গ্রীষ্ম শীতের চার-চার ক'রে বারো মাস। *বাংলা*। (১২) জুতো জোড়া। *বিলিতি*। (১৩) মশা। *রুশ*।

ম হা জ ন স ঙ্গ

অমিতাভ চৌধুরি

। পর্ব ১৫।

কানন দেবী

চলচ্চিত্রে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার কৃতিত্ব তাঁরই। 'মুক্তি' ছবিতে তাঁর গাওয়া 'আজি সবার রঙে রং মেশাতে হবে' এবং 'তার বিদায় বেলার মালাখানি' আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তারপর 'পরাজয়' ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর

'সবসময়ই প্রফুল্ল-আনন, এই যে আসুন দেবী কানন।' ছিলেন কাননবালা দাসী, ধীরে ধীরে নিজগুণে হয়ে গেলেন কানন দেবী। এই উত্তরণ বাঙালি সমাজে ও সংস্কৃতিতে অসাধারণ। আজকাল সিনেমা পাড়ায় কেউ কেউ 'দেবী' থেকে 'দাসী' হয়ে যাচ্ছেন, আর তখন ছিল ঠিক তার উল্টো। আমি কাননবালা দেবীর ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম, তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন এবং আমিও দেখা হলেই তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম। আমার বাড়ির অদূরেই তাঁর বাড়ি ছিল। আমি প্রায়ই যেতাম। তাঁর স্বামী হরিদাস ভট্টাচার্য ছিলেন অতি রূপবান, হৃদয়বান ও সজ্জন ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজুর এ-ডি-সি। একটি গানের আসরে কাননদির সঙ্গে আলাপ। আলাপ থেকে হৃদ্যতা এবং অবশেষে শুভবিবাহ। তদুপরি তিনি ছিলেন সিলেটি— আমার দেশের ভাই সুকুর মামুদ, তাই হৃদ্যতা হয়েছে সহজে।

কাননদির বিরাট বাড়ির সজনে ডাঁটা ও কাঁঠাল কত যে খেয়েছি। আসা যাওয়ার পথে প্রায়ই তিনি আমার বাড়ির নীচে গাড়িতে বসে হাঁক দিতেন, 'আমি এসেছি, নিয়ে যাও।' আমি যেতাম, নিয়ে আসতাম এবং আনন্দে গল্পে কথায় মেতে উঠতাম। তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ সেবাব্রত গুপ্তের বাড়িতে। তারপর প্রায়ই যেতাম তাঁর বাড়িতে। সস্ত্রীক। যাওয়ামাত্র তাঁর 'এসো, ভাই' ডাক মধু ঝরাত। বাড়ির বারান্দায় বসে থাকতেন, নাতিদের আদর করতেন, তরকারি কুটতেন আর বিরাট ফুলের বাগানের পরিচর্যা করতেন। সাদামাঠা পোশাক, সাদাসিধে কথাবার্তা, মুখে ভুবন-ভোলানো হাসি— দেখে মন জুড়িয়ে যেত।

কাননদি আগে থাকতেন কবির রোডের বিশাল বাড়িতে। তাঁর প্রথম বিয়ে কট্টর ব্রাহ্ম নেতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের ছেলে অশোক মৈত্রের সঙ্গে। সেই বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। কিন্তু তাঁর প্রথম শাশুড়ি মৈত্র মহাশয়ের স্ত্রীকে তিনি বিচ্ছেদের পরও শ্রদ্ধা করে এসেছেন। রোজ বাড়ির দুধ ওঁর জন্য তিনি পাঠাতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদও পেয়েছিলেন। চলচ্চিত্রে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার কৃতিত্ব তাঁরই। 'মুক্তি' ছবিতে তাঁর গাওয়া 'আজি সবার রঙে রং মেশাতে হবে' এবং 'তার বিদায় বেলার মালাখানি' আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তারপর 'পরাজয়' ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর রবীন্দ্রসঙ্গীত। সেইসময় তাঁর গানের শিক্ষক ছিলেন অনাদিকুমার দস্তিদার। কবির রোডের বাড়ি থেকে বেরনোমাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। তিনি তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রকে ওই বাড়ি থেকে বেরতে দেখে অবাক। প্রিয় ছাত্রের 'অপরাধে' বাড়ি ফিরে গঙ্গাজল সহযোগে তৎক্ষণাৎ স্নান করে বিশুদ্ধ হন। এই ছিল সেদিনকার অবস্থা। তারপর সত্তরের দশকে অনাদিকুমার দস্তিদারের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন, তখন সেই সভায় প্রচুর বিদ্বজ্জন সমবেত হয়েছিলেন। এমনকি নেপালচন্দ্র রায় মশায়ের ছেলেও হাজির

সহ-অভিনেতা কে এল সায়গল। ছবির নাম 'পরিচয়' (১৯৪১)

ছিলেন। কাননদি সেদিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন অসাধারণ। আর একবার উদয়শঙ্করের জন্মদিনে রবীন্দ্রসদনে তিনি নাচ সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা ছিল বারবার শোনার মতো। আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম তাঁর বাকবৈদগ্ধ্য। ইংরিজিতেও তিনি ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন। ফরাসি ভাষায়ও দখল ছিল তাঁর।কাননদির সামনাসামনি গান শোনার সৌভাগ্য হয়নি আমার। বলতেই বলতেন, 'ও, আমার ঠাকুর গোবিন্দকে নিবেদন করে ফেলেছি। আর গাই না।'

অথচ 'সিঙ্গিং আর্টিস্ট' হিসেবে তাঁর ভারত-জোড়া নাম ছিল। বাংলা এবং হিন্দি— দুটি ভাষাতেই তাঁর গান ছিল মধুর ও দরাজ। বাংলার বাইরে তাঁর পরিচিতি 'সিঙ্গিং আর্টিস্ট' হিসেবেই। কাননদির কাছেই শুনেছি, তিনি যেবার 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার পেলেন, তখন রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি বলেন, 'আমি আপনাকে এই পুরস্কার দিয়ে নিজেও সম্মানিত। কবে থেকে আপনার নাম জানি, ছবি দেখেছি, গান শুনেছি।' সত্যি কথা, অতি সাধারণ অবস্থা থেকে মহীয়সী নারীতে তাঁর উত্থান সত্যিই বিস্ময়কর।

কাননদির কাছেই শুনেছি, তিনি যেবার 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার পেলেন, তখন রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি বলেন, 'আমি আপনাকে এই পুরস্কার দিয়ে নিজেও সম্মানিত।

শুধু অভিনেত্রী বা গায়িকা হিসেবে নয়, একজন সমাজসেবী নারী হিসেবেও তিনি চিহ্নিত। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের জন্য তাঁর সুপরিকল্পিত দান প্রচুর। শেষজীবনে স্বামীর সঙ্গে তাঁর ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল এবং তাঁর স্বামী আমার বাড়িতে নিয়মিত গল্প করতে আসতেন বলে, তাঁর মনে হয়েছিল আমি বোধহয় তাঁর দিকে নেই। ভুল ধারণা। একদিন আমার স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'সেদিন অমিত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল প্যারিস হলে, ও আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলল না।' হতে পারে, কিন্তু সেটা ইচ্ছাকৃত নয়।

তার কিছুদিন পর সত্যজিৎ রায় মশায়ের মৃত্যুর পর স্টুডিওপাড়ায় যে বিশাল শোকসভা হয়, সেখানে অন্য অনেকের সঙ্গে কাননদি ও আমি বক্তা ছিলাম। তাঁকে দেখামাত্র আমি সামনে গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আগে বাড়িতে কতবার গিয়েছি আর নেমন্তন্ন করে কতবার কত পদ যে খাইয়েছেন। বিশাল ব্যবস্থা থাকত। একবার বিকেলে ওঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি, পাশে একজন বয়স্কা বিধবা মহিলা বসে আছেন। কে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, 'আমার মা, কয়েকদিনের জন্য এসেছেন।' শোনামাত্র আমি উঠে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আশীর্বাদ করলেন। পরে আমার স্ত্রী সুনন্দা একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলল, 'কী দরকার ছিল ওকে প্রণাম করার। জানোই তো কোন পাড়ার মেয়ে উনি।' আমি বললাম, যে-পাড়ারই হোন না কেন, তিনি তো কাননদেবীর মা। যে এমন মেয়ের জন্ম দেয়, সে বরাবরই প্রণম্য। আমি ভুল করিনি। ঠিক জায়গাতেই প্রণাম দিয়েছি।

। পর্ব ১৬।

সন্তোষকুমার ঘোষ

> সাংবাদিকতা সন্তোষদাকে যেমন খ্যাতি ও অর্থ দিয়েছে, তেমনই ধ্বংস করেছে তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে।... তাঁর সঙ্গে রোজ আঠারো ঘণ্টা কাজ করে আনন্দ এবং নিরানন্দ— দুটোই উপভোগ করেছি।

স্বীকার করা ভালো যে, বাংলা সাংবাদিকতার গুরু ১৯৫৯ সালে সন্তোষকুমার ঘোষের হাতে। বরাবর তিনি ইংরিজি খবরের কাগজেই কাজ করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। দিল্লির ইংরিজি কাগজ থেকে এসে কলকাতার বাংলা কাগজ 'আনন্দবাজার'কে তিনি বিপুল প্রচারে ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে তোলেন। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি আগেই খ্যাতিমান, পরে সাংবাদিক হিসেবেও তিনি শীর্ষে ওঠেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তবে স্বীকার করা ভালো, সাংবাদিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি অসাধারণ গল্পকার ও ঔপন্যাসিককে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই কথা তিনি নিজে মানতেন না, কেউ বললে চটে যেতেন, কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, শেষ দিকে তাঁর লেখা গল্প বা উপন্যাস কথার কচকচিতে ভর্তি। ওদিকে তাঁর হাত দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা খ্যাতি ও প্রচারে ওপরের দিকে উঠেই চলেছে।

একথা কেউ বললে তিনি চটে যেতেন। সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও মনকাড়া হেডিংয়ের তলায় চাপা পড়ে যায় তার সব চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের লেখা অসাধারণ গল্পগুলি। 'কানাকড়ি', 'চীনে মাটি', 'পনেরো টাকার বউ', 'ধাত্রী', 'অমৃতস্য' ইত্যাদি তাঁর লেখা গল্প অসাধারণ। অসাধারণ তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'কিনু গোয়ালার গলি'। পরে তিনি অনেক লিখেছেন বটে, কিন্তু 'জাদুঘর', 'জোড় কি জোড়', 'ঘর ঘরা' ইত্যাদি গল্পে সন্তোষকুমার ঘোষ আর ছিলেন না।

তাই বলি, সাংবাদিকতা সন্তোষদাকে যেমন খ্যাতি ও অর্থ দিয়েছে, তেমনই ধ্বংস করেছে তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে। বহু সাংবাদিককে তিনি ঘষেমেজে তৈরিও করেছেন। এই ধরুন আমি। তার সৃষ্টিকর্তাও সন্তোষ। সাংবাদিক হিসেবে যা যা করণীয় সব তিনি হাতে ধরে ধরে শিখিয়েছেন। রাগী অথচ স্নেহময়, খামখেয়ালি, অভিমানী ইত্যাদি নানা আবেগে উদ্দাম এসব মানুষ আমি কম দেখেছি। তাঁর সঙ্গে রোজ আঠারো ঘণ্টা কাজ করে আনন্দ এবং নিরানন্দ— দুটোই উপভোগ করেছি। আনন্দ এই কারণে যে, এমনভাবে দুজনে কাজ করতাম যে, কাজকে কখনও কাজ বলে মনে হয়নি। তিনি কাজ করছেন, ভাবছেন এবং তা দেখে দেখে কাজ আমি শিখেছি। এই ব্যাপারে আমাদের কাগজে সম্পাদক অশোককুমার সরকারের কথাও বলা দরকার। তিনি ধীরস্থির স্থিতধী মানুষ। তবু কাজের মানুষ বলে সন্তোষদার অনেক খামখেয়ালিপনাকে তিনি মেনে নিয়েছেন এবং এই প্রসঙ্গে বলি অশোকবাবু আমাকেও স্নেহ করতেন, তাই একজন জুনিয়র রিপোর্টারকে আনন্দবাজারের নিউজ এডিটর বানাতে তাঁর দেরি হয়নি। অত্যন্ত বিচক্ষণ অথচ স্নেহময় মানুষ ছিলেন এই অশোকবাবু।

সন্তোষদা আমাকে স্নেহ করতেন প্রধানত দুটি কারণে। এক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসা এবং দুজনের কাজের সমান ওয়েভ লেংথ। কাজ করতে করতে বা আড্ডা মারতে মারতে আমি তাঁর মনের কথাটা সহজেই আঁচ করতে পারতাম দ্রুত। তাঁর ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনাও মিলে যেত। তাই যখন আমি আনন্দবাজার ছেড়ে অন্য কাগজে যোগ দিই, তখন এক অনুষ্ঠানে তিনি বলে বসেন— 'অমিত চলে যাবার পরে আমি এখন নিরানন্দবাজারে কাজ করছি।'— বেফাঁস কথা যত্রতত্র বলায় তিনি ছিলেন সিদ্ধকণ্ঠ।

১৯৮২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাজভবনে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে বাঁদিক থেকে অমলাশঙ্কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরি, শঙ্কর ঘোষ ও ডাঃ সুনীল সেন।

একদিকে তিনি যেমন ভালোবাসার কাঙাল, তেমনই ছিলেন প্রচণ্ড কানপাতলা লোক। কেউ কিছু বলেছে শুনলে যাচাই না করেই বিশ্বাস করতেন। ফলে গোড়ায় তাঁর সঙ্গে মেলামেশায় খুব টেনশন হতো, ভুল বোঝাবুঝি অবশ্য বেশি দিন থাকত না। নিজেই এসে হয়তো বলতেন, কী খাওয়াবে খাওয়াও। কিংবা হয়তো বলতেন, আজ দুপুরটা তোমার এখানেই থাকব। তারপর হাসি, ঠাট্টা, গান, কলকাতার ভুগোল নিয়ে গল্প। নানা বিষয়ে অজস্র কথাবার্তা। কে বলবে দুদিন আগেই ভ্রূকুটি তুলে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন।

সন্তোষদার ভালোবাসাবাসির একটি ক্রমপর্যায় ছিল। উইম্বলডন টেনিস খেলোয়াড়দের বেলায় যেমন থাকে। এই ক্রমপর্যায় আবার ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাল্টাতেন। আজ দুপুর বারোটায় আমি হয়তো আছি শীর্ষে। রাত ৯টায় দেখা গেল আমি নেমে গিয়েছি সাত নম্বরে। কোনও কোনও দিন আবার আনলিস্টেড থাকতাম শুধু আমি নয়— গৌরদা, নীরেনদা, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় বসুরায়, বরুণ— সকলের বেলায় তাই ঘটতো এবং আড়ালে এ নিয়ে আমরা খুব হাসাহাসি করতাম।

তাঁর কাজের টেবিলের সামনে আমরা আড্ডা মারতাম, তর্ক করতাম। আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করার আনন্দে ডুবে থাকতাম। মনে মনে বলতাম— 'মোদের যেমন খেলা, তেমন যে কাজ, জানিসনে কি ভাই, কাজকে কভু আমরা না ডরাই।' সংবাদ নির্বাচন, কিংবা সংবাদের শিরোনাম স্থির করার ফাঁকে রবীন্দ্রসঙ্গীত, বিশেষ কোনও শব্দের ব্যবহার নিয়ে চটজলদি আলোচনায় মেতে উঠতাম। সমাচার সম্পাদক হওয়ার পর তিনি আমাকে হাতে ধরে কাজ শেখাতেন। গোড়ায় সকাল দশটায় আমাকে অফিসে হাজিরা দিতে হতো এবং রাত দেড়টায় নিজের গাড়িতে করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। সে এক আনন্দের দিন গিয়েছে। সন্তোষদা নেই, আমার আনন্দের দিনও চলে গিয়েছে। আনন্দবাজার ছেড়ে যুগান্তরে যোগ দেওয়ার পর একটা ভালো হেডিং করার পর ভাবতাম— সন্তোষদা, কী বলবেন? সন্তোষদার ভালো লাগবে তো? অনেক সময় পরদিন সকালে বাড়িতে ফোন করে বলতেন— 'অমিত, দারুণ হয়েছে।' আমি সবচেয়ে বড় পুরস্কার পেয়ে যেতাম।

অনেকেই জানেন না, সন্তোষদার বাতিক ছিল ছবি আঁকার। কথা বলার মাঝখানে, কিংবা একনিষ্ঠ বন্ধু জ্যোতির্ময় বসুরায় কিংবা বাল্যবন্ধু সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনার সময় লাল-নীল পেনসিল দিয়ে তিনি নানা ছবি আঁকতেন। তারপর ফেলে দিতেন টেবিলের নীচে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। আমি তাঁর অনেকগুলো কুড়িয়ে নিজের কাছে রেখেছিলাম। ১৯৭৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিনে সেই ছবিগুলো ভালো কাগজে সেঁটে একটা বড় ও সুন্দর অ্যালবাম করে তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম। জানি না, সেটা তাঁর ছেলে টিটো এখনও রেখেছে কিনা!

সন্তোষদার বেশ কিছু গল্প ও উপন্যাস 'আমার লেখা'। না, চমকাবেন না, আমারই লেখা। তিনি রোজ ডিক্টেশন দিতেন, আমি লিখতাম। কখনও বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে, কখনও অফিসের কাজের টেবিলে। 'জল দাও', 'স্বয়ং নায়ক' এবং 'শেষ নমস্কার' বইয়ের বহুলাংশ ওই ভাবেই লেখা। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর সাপ্তাহিক কলাম 'ভ্রাণাক্ষরে' এইভাবে আমারই লেখা। তাছাড়া তাঁর বহু সম্পাদকীয় প্রবন্ধও 'আমার লেখা'। তার কারণ প্রথমত তিনি নিজের হাতে লিখতে চাইতেন না, এবং দ্বিতীয়ত আমি শুদ্ধ বানানে দ্রুত লিখতে পারতাম। বাংলা বানানে ভুল তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বাংলা বানান সংস্কারে আমি তাঁর প্রধান সহযোগী হয়েছিলাম বলে তিনি খুশি হয়েছিলেন।

সন্তোষদার সঙ্গে মান অভিমান ও ভালোবাসার কথা লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। একটি প্রাণবন্ত এবং প্রতিভাবান মানুষের পূর্ণ পরিচয় দেওয়াও সম্ভব নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাই সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী ঠাকুর প্রভৃতি গাইয়েদের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল। আবার শুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে তিনি এত কড়া ছিলেন যে, দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ্য লড়াইয়ে তিনি নেমেছিলেন। খবরের কাগজে এবং মঞ্চে। পূরবী মুখোপাধ্যায়, বনানী ঘোষ, সুমিতা মুখোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিনয় রায় প্রমুখ গায়কদের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল। তিনি অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে গেলে সেখানে ভিড় জমাতেন বেশি রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়ক-গায়িকারা। মৃত্যুর ঠিক আগে বাড়িতে বলেন, তাঁর বুকে যেন একটা গীতবিতান রাখা হয়। গিয়ে দেখেছিলাম, শেষ শয্যায় ফুলে ফুলে ঢাকা বুকের ওপর একটি গীতবিতান রাখা।

সন্তোষদা নেই। আমার একটি প্রশ্রয়ের জায়গাও খালি। ওঁর বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু গিয়ে কী হবে? সন্তোষদাও নেই। আমাকে কাজ শেখানোর, আমাকে আরও বেশি রবীন্দ্রমনস্ক করার এবং আমাকে একজন কাজের মানুষ করে গড়ে তোলার ভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন, তার অভাব রোজ অনুভব করি। সম্বল, তাঁর লেখা আমাকে দেশ-বিদেশ থেকে অজস্র চিঠি। শুধু আক্ষেপ, আজকালকার সাংবাদিকরা জানতে পারল না যে কাগজ গড়ার কারিগর এবং বাংলা সাংবাদিকতার প্রাণপুরুষ এই প্রতিভাধর মানুষটির কথা। কালেরা কালোয় সব মুছে যায়!

জাহানারা ইমাম

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

নয়

স্বাধীন বাংলাদেশে কাজী নজরুল ইসলামকে স্বাগত জানাচ্ছেন শেখ মুজিবর রহমান

২৫ মে, মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী। বেশ শান-শওকতের সঙ্গে পালিত হচ্ছে ঢাকায়। এমনকি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পর্যন্ত একটা অনুষ্ঠান করছে।

সন্ধ্যার পর টিভির সামনে বসেছিলাম, জামী সিঁড়ির মাথা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, 'মা শিগগির এস। নতুন প্রোগ্রাম।'

দৌড়ে ওপরে গেলাম, স্বাধীন বাংলা বেতারে বাংলা সংবাদ পাঠ করছে নতুন এক কণ্ঠস্বর। খানিক শোনার পর চেনা চেনা ঠেকল কিন্তু ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না। সালেই আহমদ নামটা আগে কখনও শুনিনি। রুমী বলল, 'নিশ্চয় ছদ্মনাম।'

বললাম, 'হতে পারে। তবে ঢাকারই লোক এ। এই ঢাকাতেই এই গলা শুনেছি। হয় নাটক, নয় আবৃত্তি।'

এইসব গবেষণা করতে করতে বাংলা সংবাদ পাঠ শেষ।

আজকের প্রোগ্রামেও বেশ নতুনত্ব। কণ্ঠস্বরও সবই নতুন শুনছি। একজন একটা

কথিকা পড়লেন— চরমপত্র। বেশ মজা লাগল শুনতে, শুদ্ধ ভাষায় বলতে বলতে হঠাৎ শেষের দিকে একেবারে খাঁটি ঢাকাইয়া ভাষাতে দুটো লাইন বলে শেষ করলেন।

অদ্ভুত তো। কিন্তু এখানে আলটিমেটামের মতো কিছু তো বোঝা গেল না।

শরীফ বলল, 'ওই যে বলল না একবার যখন এ দেশের কাদায় পা ডুবিয়েছ, আর রক্ষে নেই। গাজুরিয়া মাইরের চোটে মরে কাদার মধ্যে শুয়ে থাকতে হবে, ওইটাই আলটিমেটাম।'

'কী জানি।'

জামী জানতে চাইল, 'গাজুরিয়া মাইর কী জিনিস?'

রুমী বলল, 'জানি না। আমার ঢাকাইয়া বন্ধু কাউকে জিজ্ঞেস করে নেব।'

ওই যে মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতার কথা বলল-ঢাকার ছ'জায়গায় গ্রেনেড ফেটেছে, আমরা তো সাত আটদিন আগে এ রকম বোমা ফাটার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করিনি। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি? আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি! সত্যি সত্যি তাহলে ঢাকার আনাচ-কানাচে মুক্তিফৌজের গেরিলারা প্রতিঘাতের ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ জ্বালাতে শুরু করেছে? এতদিন জানছিলাম বর্ডার-ঘেঁষা অঞ্চলগুলোতেই গেরিলা তৎপরতা। এখন তাহলে খোদ ঢাকাতেও?

মুক্তিফৌজ! কথাটা এত ভারী যে এরকম অত্যাচারী সৈন্য দিয়ে ঘেরা অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে বসে মুক্তিফৌজ শব্দটা শুনলেও কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। আবার ওই অবিশ্বাসের ভেতর থেকেই একটা আশা, একটা ভরসার ভাব ধীরে ধীরে মনের কোণে জেগে উঠতে থাকে।

২৬ মে, বুধবার ১৯৭১

আজ লেবুগাছ আনতে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শরীফ দুপুরে অফিস থেকে ফিরে জানাল বিকেলে মিনিভাইদের বাসায় যেতে হবে। রেবার খালাতো বোনের স্বামীকে গোপালপুরে মেরে ফেলেছে— খবর এসেছে। ওদের খুব মন খারাপ।

সাড়ে চারটেয় গুলশান গেলাম। রেবার খালাতো বোন শামসুন্নাহারের স্বামী অনোয়ারুল আজিম রাজশাহী জেলার গোপালপুর সুগার মিলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিল। তাকে এবং সেইসঙ্গে মিলের আরও অনেক বাঙালি অফিসার ও শ্রমিককে পাক আর্মির লোকেরা গুলি করে মেরে ফেলেছে। আজিমের বউ-বাচ্চার কী হয়েছে, কেউ জানে না। রেবা-মিনিভাইয়ের দ্বিগুণ মন খারাপ আরও একটি কারণে। শামসুন্নাহারের ছোট ভাই

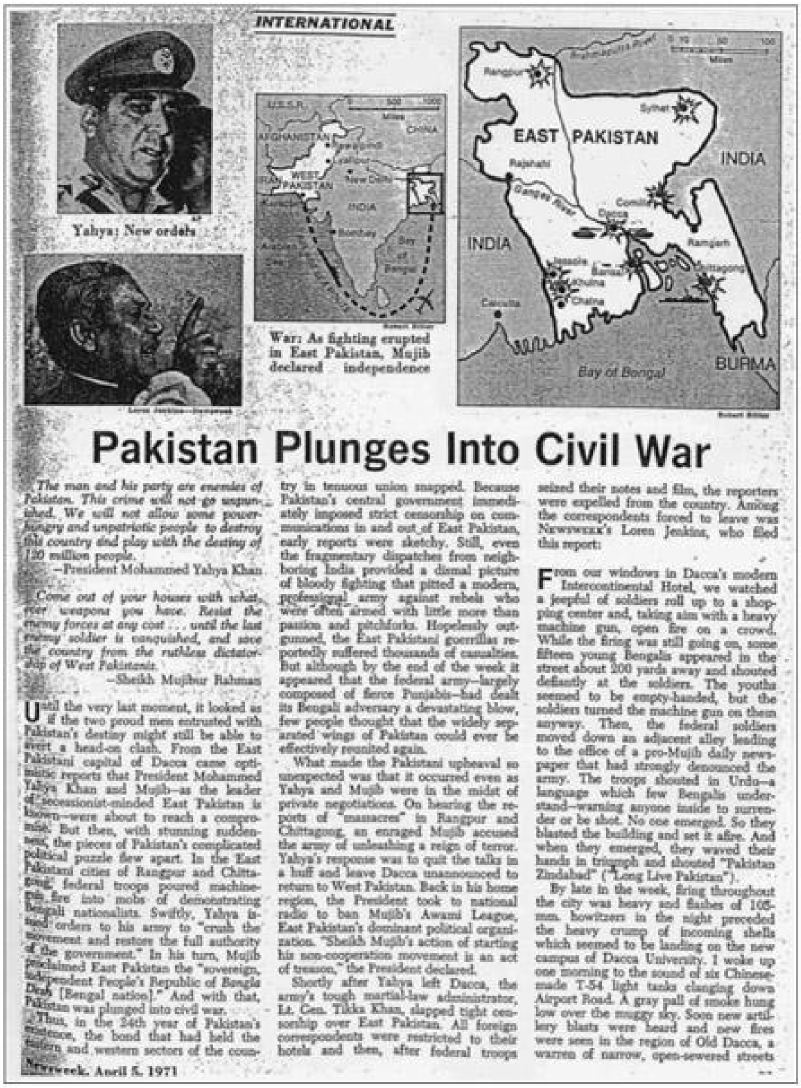

INTERNATIONAL

Yahya: New orders

War: As fighting erupted in East Pakistan, Mujib declared independence

Pakistan Plunges Into Civil War

The man and his party are enemies of Pakistan. This crime will not go unpunished. We will not allow some power-hungry and unpatriotic people to destroy this country and play with the destiny of 120 million people.

—President Mohammed Yahya Khan

Come out of your houses with whatever weapons you have. Resist the enemy forces at any cost . . . until the last enemy soldier is vanquished, and save the country from the ruthless dictatorship of West Pakistanis.

—Sheikh Mujibur Rahman

Until the very last moment, it looked as if the two proud men entrusted with Pakistan's destiny might still be able to avert a head-on clash. From the East Pakistani capital of Dacca came optimistic reports that President Mohammed Yahya Khan and Mujib—as the leader of secessionist-minded East Pakistan is known—were about to reach a compromise. But then, with stunning suddenness, the pieces of Pakistan's complicated political puzzle flew apart. In the East Pakistani cities of Rangpur and Chittagong, federal troops poured machine-gun fire into mobs of demonstrating Bengali nationalists. Swiftly, Yahya issued orders to his army to "crush the movement and restore the full authority of the government." In his turn, Mujib proclaimed East Pakistan the "sovereign, independent People's Republic of Bangla Desh [Bengal nation]." And with that, Pakistan was plunged into civil war.

Thus, in the 24th year of Pakistan's existence, the bond that had held the eastern and western sectors of the country in tenuous union snapped. Because Pakistan's central government immediately imposed strict censorship on communications in and out of East Pakistan, early reports were sketchy. Still, even the fragmentary dispatches from neighboring India provided a dismal picture of bloody fighting that pitted a modern, professional army against rebels who were often armed with little more than passion and pitchforks. Hopelessly outgunned, the East Pakistani guerrillas reportedly suffered thousands of casualties. But although by the end of the week it appeared that the federal army—largely composed of fierce Punjabis—had dealt its Bengali adversary a devastating blow, few people thought that the widely separated wings of Pakistan could ever be effectively reunited again.

What made the Pakistani upheaval so unexpected was that it occurred even as Yahya and Mujib were in the midst of private negotiations. On hearing the reports of "massacres" in Rangpur and Chittagong, an enraged Mujib accused the army of unleashing a reign of terror. Yahya's response was to quit the talks in a huff and leave Dacca unannounced to return to West Pakistan. Back in his home region, the President took to national radio to ban Mujib's Awami League, East Pakistan's dominant political organization. "Sheikh Mujib's action of starting his non-cooperation movement is an act of treason," the President declared.

Shortly after Yahya left Dacca, the army's tough martial-law administrator, Lt. Gen. Tikka Khan, slapped tight censorship over East Pakistan. All foreign correspondents were restricted to their hotels and then, after federal troops seized their notes and film, the reporters were expelled from the country. Among the correspondents forced to leave was NEWSWEEK's Loren Jenkins, who filed this report:

From our windows in Dacca's modern Intercontinental Hotel, we watched a jeepful of soldiers roll up to a shopping center and, taking aim with a heavy machine gun, open fire on a crowd. While the firing was still going on, some fifteen young Bengalis appeared in the street about 200 yards away and shouted defiantly at the soldiers. The youths seemed to be empty-handed, but the soldiers turned the machine gun on them anyway. Then, the federal soldiers moved down an adjacent alley leading to the office of a pro-Mujib daily newspaper that had strongly denounced the army. The troops shouted in Urdu—a language which few Bengalis understand—warning anyone inside to surrender or be shot. No one emerged. So they blasted the building and set it afire. And when they emerged, they waved their hands in triumph and shouted "Pakistan Zindabad" ("Long Live Pakistan").

By late in the week, firing throughout the city was heavy and flashes of 105-mm. howitzers in the night preceded the heavy crump of incoming shells which seemed to be landing on the new campus of Dacca University. I woke up one morning to the sound of six Chinese-made T-54 light tanks clanging down Airport Road. A gray pall of smoke hung low over the muggy sky. Soon new artillery blasts were heard and new fires were seen in the region of Old Dacca, a warren of narrow, open-sewered streets

Newsweek, April 5, 1971

সালাহউদ্দিনও বোনের কাছে ছিল। সেসুদ্ধ পুরো পরিবারের কোনও খোঁজখবর নেই।

আমরাও মন খারাপ করে চুপচাপ বসে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর একসময় উঠে বাড়ি ফিরে এলাম।

বাসায় ঢুকে দেখি একরাম ভাই, লিলিবু এসেছেন। বাবার সঙ্গে আলাপ করছেন। একরাম ভাই বরিশালের এডিসি হয়ে বদলি হয়েছেন।

এরকম সময় ঢাকা থেকে সুদূর বরিশালে বদলি হওয়াতে একরাম ভাইয়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। একি দুর্দৈব! কিন্তু না গিয়েও তো উপায় নেই। ক্র্যাকডাউনের পরে কঠিন মার্শাল ল' শাসন। এ সময় বদলি ক্যানসেলের কোনওরকম তদবিরেরই অবকাশ নেই। তবে একটা সান্ত্বনা— বদলিটা প্রমোশনের।

একরাম ভাই প্রথমে একাই যেতে চান। কিন্তু

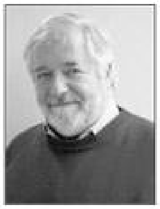

লোরেন জেংকিনস

পাঁচ এপ্রিলের নিউজউইকের প্রবন্ধটার শিরোনাম হল— পাকিস্তান গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। ভেতরে রয়েছে সাংবাদিক লোরেন জেংকিনসের রিপোর্ট।

লিলিবু গোঁ ধরে বসেছেন তিনিও সঙ্গে যাবেন। আমরা লিলিবুকে বোঝালাম— এরকম দুর্দিনে তাঁর প্রথমে না যাওয়াই ভালো। একরাম ভাই দুয়েকটা ছেলে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে যান, পরে অবস্থা বুঝে লিলিবু যাবেন। এখানেও তো ছেলেমেয়েরা সবাই রয়েছে— বাবা-মা দুজনেই একসঙ্গে গেলে ওরাও তো মুষড়ে পড়বে। তাছাড়া এখানে অনেক কাজও রয়েছে। একরাম ভাই বদলি হলেন, ঢাকার সরকারি বাসা রাখতে পারবেন না, বাসা খোঁজা, সেখানে পুরো সংসার উঠিয়ে নিয়ে গোছানো— লিলিবুর এখানে এখন থাকাটা খুবই জরুরি।

২৮ মে, শুক্রবার ১৯৭১

আজ উঠোনে বিরাট ও গভীর গর্ত করে লেবুগাছ লাগানো হল। গতকাল বিকেলে অফিসের একটা পিক-আপ নিয়ে অনেক হুজ্জত করে গাছটা আনা হয়েছে। আনতে আনতে সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছিল বলে গতকাল আর পোঁতা হয়নি, গ্যারেজের পাশে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এমনই যত্ন করে বিরাট পরিধি নিয়ে মাটি কেটে তোলা হয়েছিল এবং আজকে এমনই নিখুঁত, অনড় অবস্থায় গাছটা লাগানো গিয়েছে যে আশা হচ্ছে, গাছটার একটা পাতাও মরবে না।

অবশেষে শরীফ নিউজউইক, টাইম ম্যাগাজিনের সেই দুর্লভ সংখ্যাগুলোর টাইপ করা কপি বাড়ি আনতে পেরেছে। আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। তিনটে কপি— দুটো নিউজউইকের ৫ এপ্রিল আর ১২ এপ্রিল সংখ্যা। টাইম ম্যাগাজিনের ৩ মে সংখ্যা। পাতলা টাইপ-কাগজে টাইপ করা ম্যাগাজিনে নিশ্চয় ছবিটবি ছিল, টাইপ কাগজে তার স্বাদ পাওয়া গেল না। তবু যে পড়তে পারছি, এটাই বা কম কী?

পাঁচ এপ্রিলের নিউজউইকের প্রবন্ধটার শিরোনাম হল— পাকিস্তান প্লাঞ্জেস ইন টু সিভিল ওয়ার— পাকিস্তান গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। ভেতরে রয়েছে নিউজউইকের সাংবাদিক লোরেন জেংকিনসের রিপোর্ট। পড়ে অবাক হলাম, হোটেল ইন্টারকনে গৃহবন্দি থাকা অবস্থাতেও লোরেন জেংকিনস ঢাকার আর্মি ক্র্যাকডাউনের পুরো ঘটনা কী করে জেনে সেগুলো হুবহু তার কাগজে তুলে দিয়েছে সারা বিশ্বকে জানাবার উদ্দেশে। এই ঘটনা জানার পর তো আর কোনও দেশের বলা উচিত নয় যে পূর্ব বাংলায় যা ঘটেছে, তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার; কিংবা পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রে কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রদ্রোহী দলকে সামরিক সরকার যোগ্য শাস্তি দিয়েছে?

বারো এপ্রিলের সংখ্যায় লোরেন জেংকিনস আরও চমৎকার করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। শিরোনাম দিয়েছে— দি অ্যাওয়েকনিং অব এ পিপল— একটি জাতির জাগরণ। টাইম ম্যাগাজিনের কপিটা আরও পরের, ৩ মে তারিখের। টাইমের সংবাদদাতা ড্যান কোগিন তার প্রবন্ধের নাম দিয়েছে, ঢাকা, সিটি অব দ্য ডেড— লাশের শহর ঢাকা।

সবাই মিলে ভাগাভাগি করে এগুলো পড়তেই আজ সারাদিন কাবার!

২ জুন, বুধবার ১৯৭১

সকালে একরাম ভাইয়ের ট্রাংকল পেলাম। ভালোমতো পৌঁছেছেন।

গতকাল বিকেলের রকেট পি, আর, এস-য়ে বরিশাল রওনা হয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল বড় ছেলে আবু আর ভাস্তে আঞ্জু।

এখন ট্রাংকল পেয়ে খবরটা লিলিবুকে দেওয়ার জন্য বেরলাম। ওখানে খানিকক্ষণ বসে মা'র বাসা গেলাম।

গতকাল থেকে সর্দি লেগেছে, সেইসঙ্গে অল্প জ্বরজ্বর ভাব। আজ বিছানায় শুয়ে থাকলে ভালো হত। কিন্তু একবার বেরিয়ে যখন পড়েছিই, তখন সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল না। মার সঙ্গে আমার খালার বাড়ি বেড়াতে গেলাম। সেখান থেকে মাকে আবার ৬ নংয়ে পৌঁছিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেড়টা।

সর্দি সারানোর দেশি টোটকা কাঁচাপেঁয়াজ কুচি, শুকনো মরিচ পোড়া আর খাঁটি সর্ষের তেল গরম ভাতে মেখে খেলাম।

এত হাঙ্গামা করে এতবড় লেবু গাছটা এনে এত কষ্ট করে পুঁতলাম, কিন্তু কোনও কাজ দিল না। আজ দেখছি, এর পাতাগুলো মরতে শুরু করেছে। রুমী বলল, 'যে কেউ দেখে বুঝে ফেলবে এর তলায় কিছু লুকনো আছে। গাছটা তুলে ফেলে দিতে হবে।'

এতবড় গাছ তুলে ফেলা কী চাট্টিখানা কথা? ডালগুলো ছোট ছোট টুকরো করে কেটে, কাণ্ডটাও টুকরো করে কেটে গোড়াটা তুলে ফেলা হল। তারপর গাড়ির বুটিতে নিয়ে দূরের একটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসা হল। খুব কষ্ট লাগে গাছটা এভাবে কসাইয়ের মতো টুকরো করে কাটতে। ছোটবেলা থেকে জেনে আসছি— ফলের গাছ নষ্ট করতে নেই। কিন্তু কী করব, জান বাঁচানোর তাগিদে গাছ কেটে ফেলে দিতে হল।

এখন আবার নতুন করে চিন্তা কর— আর কোথায় কীভাবে গহনা লুকিয়ে রাখা যায়।

আজ সর্দিটা খুব বেড়ে গেছে। জ্বরটাও যেন। সর্দি সারার একমাত্র ওষুধ বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম। দুটো নোভালজিন গিলে শুয়ে রইলাম। একটু পরেই আবার ফোন: টাট্টু আমাদের বাসায় এসেছে কি না?

কী ব্যাপার?

খুব উদ্বেগেও রেবার গলা সহজে কাঁপে না। রাগ হলেও সে চেঁচিয়ে কথা বলতে পারে না। খুবই ঠান্ডা মেজাজের মেয়ে। কিন্তু আজ ফোনে তার গলায় কাঁপন বুঝতে পারলাম।

দুপুরে আরও দুটো নোভালজিন খেয়ে জ্বরটা দাবালাম। বিকেল হতে না হতেই রুমী, জামী, শরীফসহ গুলশানের দিকে ছুটলাম। গিয়ে দেখি রেবা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে, চারপাশে তার আত্মীয়স্বজন বিষণ্ন বদনে বসে আছে। মিনিভাই, রেবা ও জাহিরের মুখে টুকরো টুকরো করে পুরো ঘটনাটা শুনলাম: সকালে টাট্টু দেরি করে ঘুমোয়। নাশতা হলে ডেকে তুলতে হয়। আজও ডাকাডাকি হচ্ছিল, কিন্তু আজ আর তার সাড়া পাওয়া যায় না। শেষে, রেবা ঘরে ঢুকে দেখে মশারি ফেলাই আছে কিন্তু টাট্টু ভেতরে নেই। প্রথম দিকে হইচই না করে টাট্টুর বড় ভাই জাহির খুব সন্তর্পণে টাট্টুর বন্ধুদের কাছে খবর নেয়। না, টাট্টু তাদের কারও কাছে যায়নি। তবে টাট্টুর দুই বন্ধুকেও তাদের নিজ নিজ বাড়িতে পাওয়া যায়নি। জাহির একটু আধটু আঁচ পেত— টাট্টু কিছু একটার সঙ্গে জড়িত আছে। কিন্তু টাট্টু কোনওদিন খোলাখুলি বড় ভাইয়ের সঙ্গে এ নিয়ে কোনও আলোচনা করেনি। তবে সবাই ধারণা করছে টাট্টু লুকিয়ে মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। আবার ভয়ও হচ্ছে, পথে কোথাও খানসেনাদের হাতে ধরা পড়ল কি না? ধরা পড়লেও তো জানবার কোনও উপায় নেই।

রেবাকে এই প্রথম আকুল হয়ে কাঁদতে দেখলাম। মিনিভাই-ও খুব বিচলিত, তবে বাড়ির কর্তা বলেই বোধহয় শান্তভাবটা বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, ভেতরটা তাঁর ভেঙে যাচ্ছে।

সন্ধের মুখে বাসায় ফিরে এলাম। কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। টাট্টু একলাইনের একটা চিঠি রেখে গেলেও তো পারত।

আজ স্বাধীন বাংলা বেতারেও তেমন মন লাগাতে পারলাম না। সেই কে যেন, আজও 'চরমপত্র' পড়লেন। রোজই পড়েন। কে পড়ছেন, নাম শোনার জন্য প্রথম কদিন কান খাড়া করেছিলাম। কিন্তু না, কোনও নাম বলা হয়নি।

ঘুরেফিরে খালি টাট্টুর কথাই মন এলোমেলো করছে। জামীর মুখ চুন। টাট্টু তাকেও কিছু বলেনি। বন্ধুর এই 'বিশ্বাসঘাতকতায়' জামী খুবই মর্মাহত। আমি হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললাম, 'চল' নীচে যাই। মুড়ির মোয়া বানাব।' একটা কিছু কাজ করা দরকার।

আজকের কাগজে দুই ইঞ্চি মোটা আট কলামজুড়ে হেডিং ছাপা হয়েছে: পাঁচশো ও একশো টাকার নোট অচল ঘোষণা। নোট অচল ঘোষণা করার ফলে কী যে হইচই পড়ে গেছে সারা শহরে। কতজন যে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

সঙ্গের ছবিতে সেই ৫০০ টাকার নোট

৩ জুন, বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ বিছানায় সটান। বেশ জ্বর। গত তিনদিন ধরে আদার রস দিয়ে বারবার চা খাওয়ার ফলে সর্দি বসে গিয়ে কষ্ট আরও বেড়েছে। বুকে ব্যথা, নিঃশ্বাস নিতে হাঁপ ধরে।

লুলু বিকেলে এসে বলল, 'মামি, পাঁচশো আর একশো টাকার নোট নাকি অচল করে দেবে?'

'কে বলল? কোথায় শুনলি?'

'সবাই তো বলাবলি করছে।'

'গুজব। কোন রিলায়েবল সোর্স আছে কী না, খোঁজ নে।'

নোট অচল হলে তো মুশকিল। ঘরে দু-তিন হাজার টাকা রাখা আছে। বেশির ভাগই পাঁচশো আর একশো টাকার নোট।

রাতে শরীফ ঢাকা ক্লাব থেকে ফিরলে ওকে নোট অচলের গুজবটা বললাম। ও বলল, ঢাকা ক্লাবেও অনেকে একথা নিয়েই আলোচনা করছে। আমি বললাম, 'কালই আমাদের ঘরের টাকাগুলো ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিও।'

'আরে অত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে? কথাটা গুজবও তো হতে পারে।'

'তা হোক। আমাদের টাকা পয়সা বেশি নেই। কালকে জমা দিয়ে দাও তো— তারপর না হয় আবার তুলে রাখা যাবে।'

শরীফ একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে ড্রেসিং রুমের দিকে চলে গেল কাপড় বদলাতে। অর্থাৎ কথাটা তার মনঃপুত হয়নি।

৫ জুন, শনিবার ১৯৭১

আজও শরীর খুব খারাপ। তবে গত দু'দিন যেমন উঠতেই পারিনি, সেরকম নয়। জ্বর বন্ধ হয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছি। আজ একটু-আধটু উঠে হেঁটে বেড়াতে পারছি।

সকালে খবরের কাগজ দেখিয়ে শরীফ বলল, 'শুধু শুধু খাটালে। এই দেখ।'

দেখলাম কাগজে হেডলাইন: কোনও কারেন্সি নোট অচল নয়। গুজব ভিত্তিহীন।

খবরে বলা হয়েছে: পাকিস্তান সরকারের সকল কারেন্সি নোট চালু থাকবে। জনসাধারণের কাছে আইনসম্মত মুদ্রা হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা অব্যাহত থাকবে। কোনও কোনও কারেন্সি নোট অচল করা হয়েছে বলে যে গুজব ছড়িয়েছে, এবং কোনও কোনও খবরের কাগজে যে লেখা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন এবং তার পিছনে কোনও সত্যতা নেই।

চুপ করে রইলাম। গতকাল আমার জেদে শরীফকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাকা জমা দিতে হয়েছে। কেবল আমারই নয়, মায়েরও। শুক্রবার এগারোটা পর্যন্ত ব্যাঙ্কিং— নটাতেই রুমীকে মার বাড়ি পাঠিয়ে মার একশো টাকার পাঁচটা নোট আনিয়ে আমাদের পুরো তিন হাজার টাকা শরীফের হাতে তুলে দিয়েছি জমা দেওয়ার জন্য। দিলকুশা কমার্শিয়াল এরিয়াতে শরীফের অফিসের পাশেই ব্যাঙ্ক। ঘণ্টাখানেক পরে আবার ফোন করে জেনেছি— শরীফ টাকা জমা দিয়েছে কিনা!

কাসেম এসে বলল, 'আম্মা, আর অ্যাক ব্যালার মতো চাউল আছে। চাউল কিনন লাগব।' রেশনের চালে আমাদের সপ্তাহ যায় না। খোলাবাজার থেকেও কিনতে হয়।

ধমক দিয়ে বললাম, 'দু'তিনদিন আগে থেকে বলতে পারিস না? তোদের সবসময় বলি না সব জিনিস ফুরোবার দু'তিনদিন আগে থেকে বলবি? তা যদি মনে থাকে। মাত্র তিনদিন বিছানায় পড়ে আছি-'

শরীফ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

আমি কাঁচুমাচু মুখে বললাম, 'চাল কেনার জন্য-'

শরীফ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এখন তো সাভার যাচ্ছি বাঁকার সঙ্গে, ফিরতে ফিরতে একটা বেজে যাবে। কালকে টাকা তুলব।' বেশ খুশি মুখ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি কাসেমকে ধমক দিয়ে বললাম, 'যা, বেরো সামনে থেকে, হতচ্ছাড়া। চালে না কুলোয়, রুটি বানাবি।'

শরীফের ফিরতে ফিরতে তিনটে হল। উদ্বিগ্ন হয়ে দোতলার বারান্দায় পায়চারি করছিলাম। এত দেরি হওয়া তো উচিত নয়। কী জানি কিছু হল নাকি?

না, ওই যে গাড়ি এসে থেমেছে গেটে। শরীফ হাঁকডাক করে ডাকল কাসেম-বারেককে। ওপর থেকে দেখলাম, ড্রাইভার ও কাসেম ধরাধরি করে একটা চালের বস্তা নামাচ্ছে! বারেক নামাচ্ছে দু'জোড়া মোরগ!

৮ জুন, মঙ্গলবার ১৯৭১

আজকের কাগজে দুই ইঞ্চি মোটা আট কলামজুড়ে হেডিং ছাপা হয়েছে:

পাঁচশো ও একশো টাকার নোট অচল ঘোষণা।

গত রাতেই টিভি'তে অবশ্য এই চাঞ্চল্যকর ঘোষণা দেওয়া হয়ে গেছে। স্তম্ভিত যা হওয়ার, লোকে গতকাল রাতেই হয়েছে। সে সময়টা আমি খুব পরিতৃপ্ত মুখ নিয়ে চুপ করেছিলাম। শরীফও চুপ করে ছিল, তবে ভ্রূ কুঁচকানো অবস্থায়। অবশ্য আমার এ পরিতৃপ্তি বেশিক্ষণ বজায় থাকেনি, রুমী একটা কথায় বেলুন ফুটো করে দিল, 'আম্মা, আমার প্যান্টের মুড়িতে পাঁচটা একশো টাকার নোট সেলাই করা আছে!'

বিকেলে নজলু আর কলিম এসেছে। নোট অচল ঘোষণা করার ফলে কী যে হইচই পড়ে গেছে সারা শহরে। সেই সব কথাই শুনলাম ওদের মুখে। কতজন যে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ করে ছোট ব্যবসায়ীরা— যারা কখনও ব্যাঙ্কের ধার ধারে না, নগদেই সবসময় কারবার করে, তাদের মাথায় বাড়ি। যে বুড়ো লোকটা আজ তার মেয়ের বিয়ের বাজার করার জন্য গতকাল ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক হাজার টাকা তুলেছিল তার কী উপায় হবে? কতজনে কত জরুরি পেমেন্ট আজ সকালেই করবার জন্য গতকাল টাকা তুলেছে, তাদের মহাসর্বনাশ। পাওনাদারদের কাছে তাদের মুখ নষ্ট। কারও কারও বাড়িতে বাজার করার মতো টাকা পর্যন্ত নেই। এককথায় নোট অচল করে সামরিক সরকার দেশের সমগ্র জনজীবন স্থাণু করে দিয়েছে।

৯ জুন, বুধবার ১৯৭১

আজ শরীর একদম ভালো। গোসল করে সাড়ে এগারোটাতে তৈরি হয়ে নিলাম। নজলু আসবে এখুনি। ওকে নিয়ে মা'র বাসায় যাব। গহনা রাখার বন্দোবস্ত অবশেষে হয়েছে। মা'র বাড়ির একতলায় সিঁড়িঘরে সিঁড়ির নীচে ছোট্ট একটা বাথরুম আছে। কয়েক মাস আগেই বাথরুমটা করা হয়েছে, এখনও 'প্যান' বসানো হয়নি। এই প্যান বসানোর খালি জায়গাটায় গহনার বাক্স রেখে সিমেন্ট করে দেওয়া হবে। রাজমিস্ত্রির কাজটা আমরাই করব। বালি, সিমেন্ট মা'র বাড়িতেই রয়েছে। নজলুর বাড়িতে তার বউয়ের ছাড়াও কয়েকজন আত্মীয়ের গহনাও আছে। পরের আমানত নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। নজলুও সেসব গহনা মা'র বাড়িতে পুঁতে রাখবে। নজলু এলে রিকশা করে মার বাড়ি গেলাম। আমার গহনা, মা'র গহনা, নজলু এবং তার আত্মীয়ের গহনা— সবগুলো একটা বড় বিস্কুটের চ্যাপটা টিনে রাখা হল। সব গহনার লিস্ট করে তার তিনটে কপি করা হল। একটা লিস্ট গহনার বাক্সে থাকবে— বাকি তিনটে তিনজনের কাছে।

যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে তিনজনে মিলে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে গেলাম। বিস্কুটের বাক্স প্রথমে তিন-চার পরত প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে দড়ি বাঁধলাম। যাতে বাক্সের ভেতর পানি না ঢোকে। বাক্সটা গর্তে বসিয়ে তার চারপাশে ছোট ছোট ভাঙা ইটের টুকরো দিয়ে তারপর বালি বিছিয়ে ওপরটা সমান করলাম। তারপর সিমেন্ট করতে গিয়ে একেবারে হয়রান। যাই হোক, কাজ শেষ করে তিনজন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারিফ করলাম। খুব খারাপ হয়নি। মাকে বললাম, 'আপনি কাল থেকে রোজ দু'বেলা এটা পানি দিয়ে ভেজাবেন চার/পাঁচ দিন। তারপর আমরা আবার এসে বাড়ির যত ড্রাম, টিন, মটকা, কলসি হাবিজাবি জিনিস আছে, সব এখানটায় ঠেসে এটাকে স্টোররুম বানিয়ে ফেলব।'

নজলু হেসে বলল, 'আশা করি তার আগেই খানসেনারা এসে হামলা করবে না।'

আমি ধমকে উঠলাম, 'বালাই ষাট। অকথা কুকথা কেন বলছ?'

মা বললেন, 'কোনও ভয় কোরও না। রোজ আমি দোয়া-দরুদ পড়ে বাড়ি বন্ধ করি। আল্লার রহমতে কোনও খানসেনা কি বিহারি এ বাড়িতে আসতে পারবে না।'

মা'র প্রত্যয়ে আমরাও অনেকখানি ভরসা পেলাম।

১০ জুন, বৃহস্পতিবার ১৯৭১

দুপুরে খেয়ে কেবল একটু শুয়েছি, অমনি ফোন বেজে উঠল। একটু বিরক্তই হলাম। কে এমন অসময়ে—

ফোনে রেবার গলা: 'আপা, টাট্টু ফিরেছে। এই এক্ষুনি।'

ফোন রেখে তড়াক করে উঠে হাঁক

প্রতিদিনই নতুন নতুন ছেলে গিয়ে হাজির হচ্ছে। অধ্যাপক তাদেরকে রিক্রুট করে, বাছাই করে কোম্পানি গঠন করে তারপর প্লাটুনে ভাগ করে দিচ্ছেন। একজন ল্যান্স নায়েক ছেলেদেরকে ট্রেনিং দেন।

সঙ্গের ছবিতে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে যোদ্ধারা

ইয়াহিয়া খান

উ থান্ট

ইয়াহিয়া সরকার বেশ ভালো ফ্যাসাদেই পড়ে গেছে মনে হচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও জাতিসঙ্ঘকে ভালোমতো বুঝিয়ে উঠতে পারছে না যে, পূর্ব পাকিস্তানে যা চলছে, তা বিচ্ছিন্নতাবাদী কতিপয় দুষ্কৃতকারীর নাশকতামূলক কাজের বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ মাত্র।

পাড়লাম, 'রুমী, জামী, শিগগির তৈরি হ। গুলশান যাব। টাট্টু ফিরেছে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে চারজনে বেরিয়ে পড়লাম গুলশানের পথে।

রুমী বলল, 'আম্মা, তুমি যেন মেলাই প্রশ্ন কোরও না। ও নিজে থেকে যেটুকু বলবে, সেইটুকু শুনে সন্তুষ্ট থেকো।'

একটু রাগতস্বরে বললাম, 'ঠিক আছে, মুখে তালা এঁটে রাখলাম।'

রেবার বিছানার ওপর টাট্টু বসে আছে— এলোমেলো চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গর্তে বসা লাল চোখ। এমনিতেই সে রোগা-পাতলা, মুখটা চিকন। এখন মনে হচ্ছে কতদিন না খেয়ে খেয়ে মুখ দড়িপানা হয়ে গেছে।

টাট্টু অসম্ভব ক্লান্ত। এর আগে নিশ্চয় বাড়ির সবাইকে বলতে হয়েছে তার উধাও হওয়ার কাহিনি। তবু আমাদেরকে আবার সব বলল সে।

দু'জন বন্ধুর সঙ্গে টাট্টু দাউদকান্দিতে নদী পেরিয়ে পর্যায়ক্রমে বাসে, রিকশায় ও পায়ে হেঁটে বর্ডার ক্রস করে। ওপারে নগরদা বলে একটা জায়গায় যে ক্যাম্পটা ছিল, সেখানে ওরা ওঠে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের এক অধ্যাপক ওখানে এই ক্যাম্পটা অর্গানাইজ করেছেন। প্রতিদিনই নতুন নতুন ছেলে গিয়ে হাজির হচ্ছে। অধ্যাপক তাদেরকে রিক্রুট করে, বাছাই করে কোম্পানি গঠন করে তারপর প্লাটুনে ভাগ করে দিচ্ছেন। একজন ল্যান্স নায়েক ছেলেদেরকে ট্রেনিং দেন। তাঁকে সবাই ওস্তাদ বলে, নাম তোফাজ্জল মিয়া। প্রত্যেক দলের চারদিন করে ট্রেনিং। একেবারেই এলিমেন্টারি ট্রেনিং। টাট্টুরা যাওয়ার পরদিন ওদের ট্রেনিং শুরু হল। প্রথম দিকে গুলিগোলা বুলেট গ্রেনেড এসব কম ছিল বলে ট্রেনিং পাওয়ার পর সব দলই অপারেশনে যেতে পারত না। টাট্টুর কপাল ভালো, সেই সময় কিছু গুলিগোলা গ্রেনেড পাওয়া গিয়েছিল। তাই টাট্টু দুয়েকটা অপারেশনে যেতে পেরেছিল।

রুমীর নিষেধ ভুলে মুখ ফসকে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে এল, 'এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে?'

টাট্টু বলল, 'আমাকে ঢাকাতেই কিছু কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েছে। ওখানে ক্রমেই ছেলেদের ভিড় বাড়ছে। থাকার জায়গার অভাব, খাবার অভাব। খাওয়া শুধু ভাত আর ডাল। তাও সবসময়ই চাল জোগাড়ের ধান্দায় থাকতে হয়। তার ওপর বৃষ্টি। সে যে কী কষ্ট। ভাতের কষ্ট তো ছিলই, বৃষ্টিতে ভিজে, স্যাঁতসেঁতে মাটিতে শুয়ে বহু ছেলের জ্বর হয়ে গেল। আর পেটের অসুখ। ওষুধেরও অভাব। তাই অধ্যাপক একেক দলকে একেক দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন দিকে পাঠাতে লাগলেন।'

আমি আবার একটা প্রশ্ন করে ফেললাম, 'এ ক'দিন ঘুম-খাওয়া কিছুই হয়নি নাকি?'

টাট্টু হাসল, 'খাওয়া মোটামুটি হয়েছে। ঘুমোনোর সময় একেবারেই পাইনি। একে টেনশনও তো ছিল। তাছাড়া ওখানে যাওয়ার চারদিন পর ক্যাম্প সরাবার অর্ডার হল। সব ভেঙেচুরে নিজেরাই মাথায় বয়ে তিন মাইল দূরে গিয়ে নতুন ক্যাম্প করা হল।

আমি আর থামতে পারলাম না। আবার প্রশ্ন: 'কী ভেঙে নিয়েছিলি?'

'ঘরের বেড়া, তাঁবু, বাঁশ, চাটাই। হাঁড়িকুড়ি, অন্যান্য জিনিসও মাথায় বইতে হয়েছে। সে খাটনিটাও কম ছিল না। তবে একটা সান্ত্বনা ছিল, নতুন ক্যাম্পে এসে একটা ফ্রেশ পুকুর পাওয়া গেল?'

'ফ্রেশ পুকুর মানে?'

টাট্টু হেসে ফেলল, 'সাধারণত ক্যাম্প করা হয় পুকুর বা নদীনালার পাশে— যাতে পানি পাওয়া যায়। নগরদা ক্যাম্পের পাশে একটা পুকুর ছিল, সেটার পানি নাওয়া-খাওয়া, ধোয়াপাখলা সব কাজ করতে করতে একেবারে পচে যাওয়ার মতো হয়েছিল। তাই তিন মাইল দূরে যে পুকুরটার পাশে নতুন ক্যাম্প করা হল, সেটার পানি তখনও ফ্রেশ ছিল। অবশ্য এটাও জানতাম— এতগুলো ছেলে ব্যবহার করতে করতে কয়েকদিনের মধ্যে সেটাও পচিয়ে ফেলবে।'

আমরা উঠলাম। এতদিনে মুক্তিযুদ্ধের একটা বাস্তব ছবি মনের চোখে ফুটে উঠল। এর আগে বহুবার শুনেও যেন বিশ্বাস হতে চাইত না। মুক্তিযুদ্ধ সত্যি সত্যি হচ্ছে। এখন মুক্তিযুদ্ধের একটি ক্যাম্প থেকে ফিরে আসা একটি ছেলের মুখে শুনে মনে হল সত্যি সত্যিই মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে। এবং দলে দলে ছেলে যুদ্ধ করতে ছুটে যাচ্ছে।

ঘর থেকে বেরবার আগে রুমী বলল, 'এক কাজ করো। খুব ভালো করে সাবান ঘষে গোসল করে পেট ভরে ডাল-ভাত খাও। তারপর দরজা বন্ধ করে কষে একটা ঘুম দাও।'

সারাটা সময় জামী একটাও কথা বলেনি।

১১ জুন, শুক্রবার ১৯৭১

ইয়াহিয়া সরকার বেশ ভালো ফ্যাসাদেই পড়ে গেছে মনে হচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও জাতিসঙ্ঘকে ভালোমতো বুঝিয়ে উঠতে পারছে না যে, পূর্ব পাকিস্তানে যা চলছে, তা বিচ্ছিন্নতাবাদী কতিপয় দুষ্কৃতকারীর নাশকতামূলক কাজের বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ মাত্র। এবং সে ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আইন ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর পাকিস্তানের সশস্ত্র সেনাবাহিনী এখন রিলিফ ও পুনর্বাসনের কাজে প্রাদেশিক সরকারকে সাহায্য করছে। প্রদেশের সর্বত্র এখন স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ সব পুরোদমে চলছে। কল-কারখানায় পুরোদমে উৎপাদন চলছে। বাস, কোচ, ট্রেন, স্টিমার সব পুরোদমে চলছে। জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি ইয়াহিয়া মোটেও ভোলেননি। পূর্ব পাকিস্তানের ওই 'বিচ্ছিনতাবাদী দুষ্কৃতকারীদের নাশকতামূলক' আন্দোলনের জন্যই তার ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাটি একটুখানি পিছিয়ে গেছে মাত্র। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য অভ্রান্ত রয়েছে: তিনি নির্বাচন বিফলে যেতে দেবেন না। জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা তিনি অতিশীঘ্রই ঘোষণা করবেন। তবে হ্যাঁ, জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গিয়ে তিনি দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে দিতে পারেন না। সেইজন্যই একটুখানি দেরি হচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ সদস্যদের খুঁজে বের করার জন্য ইয়াহিয়া বেগম আখতার সোলায়মানকে ঢাকা পাঠিয়েছে তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণার পর পরই। বেগম আখতার ঢাকায় এসে ইতোমধ্যেই অনেক আওয়ামী লীগ এম এল এ ও এম পি এ-র সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছেন! খবরের কাগজে প্রকাশ: তিনি ১০৯ জনের স্বাক্ষর জোগাড় করে ফেলেছেন! (খুবই নিবেদিতপ্রাণ করিতকর্মা মহিলা, বোঝা যাচ্ছে।)

বার বার এসব কথা বলে, রেডিও-টিভি খবরের কাগজের প্রচারমাধ্যমে এত সব সাফাই গেয়েও পাকিস্তান সরকার বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে ভোলাতে পারছে না। চলতি বছরের বৈদেশিক ঋণের মে-জুন মাসের কিস্তি ৩ কোটি ডলার শোধ দেওয়া পাকিস্তানের পক্ষে এখনই সম্ভব নয় বলে এইড কনসর্টিয়ামের কাছে পাকিস্তান ছয় মাসের সময় চেয়েছিল গত মাসের পয়লা তারিখেই। সে সময় দেওয়া হবে কি না, এখনও পর্যন্ত তার কোনও সুরাহা হয়নি। গত মাসের শুরুতেই এসব বিষয়ে সরজমিনে তদন্ত (পাকিস্তানি প্রচারমাধ্যমের ভাষায় 'আলোচনা'!) করার জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের এইড-টু-পাকিস্তান কনসর্টিয়াম-এর চেয়ারম্যান মিঃ পিটার কারগিল একদল সহকর্মী নিয়ে ইসলামাবাদে হাজির। কয়েকদিন সেখানে খোদ প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম এম আহমদ পর্যন্ত অনেক বড় বড় কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কী হল, আল্লা জানে। কদিন পর এম এম আহমদ দৌড়োলেন ওয়াশিংটনে, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারার কাছে দরবার করতে। তারপরও তো মাস কাবার হয়ে গেল। মরিয়া হয়ে ইয়াহিয়া ২৪ মে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাও ঘোষণা করলেন। কিন্তু কোথায় কী? বিশ্বব্যাঙ্ক মিশন এখন দশদিন ধরে পূর্ব পাকিস্তান সফর করছে।

ওদিকে উ থান্ট পূর্ব পাকিস্তানকে সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে, তবে সে সাহায্য জাতিসঙ্ঘের বিশেষ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। পাকিস্তান তাতে রাজি নয়। পাকিস্তান সরকার জোর গলাতে মাথা নেড়ে বলছে— পাকিস্তানের নিজস্ব রিলিফ সংস্থা এসব সাহায্যসামগ্রী বিতরণের কাজে যথেষ্ট পটু। কিন্তু উ থান্ট-ভবি তাতে ভুলছে না!

জাতিসঙ্ঘের হাইকমিশনার ফর রিফিউজিজ প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানও এখন

জাতিসঙ্ঘের হাইকমিশনার ফর রিফিউজিজ প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান ও শেখ মুজিবর রহমান

ঢাকায় আসার আগে প্রিন্স সদরুদ্দিন ইসলামাবাদে কয়েকদিন ছিলেন। গতকাল ঢাকায় পৌঁছেই প্রিন্স ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, 'খাঁটি পাকিস্তানিদের' পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে গভর্নর থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে।

ঢাকায়। তাকে বোধহয় 'মুশকিল আসান' হিসেবে ইয়াহিয়া জাতিসঙ্ঘ থেকে ডেকে এনেছেন।

'পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় যেসব প্রকৃত পাকিস্তানি, বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতকারীদের ভীতি ও হুমকি প্রদর্শনের মুখে পাকিস্তান ত্যাগে বাধ্য হয়ে সীমান্তের অপর পারে গমন করেছেন' তাঁদের সকলকে সাদরে ফিরিয়ে নিয়ে পুনর্বাসিত করবেন- এই মর্মে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক বিবৃতিতে আশ্বাস প্রদান করেছেন। এবং এর প্রেক্ষিতে গত সপ্তাহেই ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথের ওপর অভ্যর্থনা শিবির খোলা হয়েছে।

ঢাকায় আসার আগে প্রিন্স সদরুদ্দিন ইসলামাবাদে কয়েকদিন ছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে যথাযোগ্য ব্রিফিং নেওয়ার জন্যই। গতকাল ঢাকায় পৌঁছেই প্রিন্স ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, 'খাঁটি পাকিস্তানিদের' পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে গভর্নর থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে। তিনি আজই চুয়াডাঙ্গা আর বেনাপোলের কাছে দুটো অভ্যর্থনা কেন্দ্র পরিদর্শন করে এসেছেন।

(কি নিষ্ঠা! কি উদয়াস্ত পরিশ্রম!)

ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসঙ্ঘ রাষ্ট্রদূত তিনদিন আগেই উ থান্টকে জানিয়েছেন যে, আমেরিকান সরকার আরও অতিরিক্ত পনেরো মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছেন ভারতে পূর্ব পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য। আরও খবর— মিশর ভারতে পাঠাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে কলেরা ভ্যাকসিন।

কল্পনার চোখে দেখলাম ইয়াহিয়া এ খবর পেয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছেন। আর উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিনকে 'কোনও কম্মের নয়' বলে গাল দিচ্ছেন!

আজ থেকে ঢাকায় সান্ধ্য আইন সম্পূর্ণ প্রত্যাহার।

১২ জুন, শনিবার ১৯৭১

শহরে কলেরার প্রকোপ বাড়ছে। দেশের অন্যান্য জায়গায় কলেরার কথা আগেই কানে এসেছে। কলকাতার শরণার্থী শিবিরে কলেরা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। মজার কথা, দেশের প্রচারমাধ্যমগুলোতে কলকাতার কলেরার কথা যতটা ফলাও করে বলা ও লেখা হচ্ছে, দেশের কলেরার ব্যাপার ততটাই চেপে যাওয়া হচ্ছে। কলেরা এখন ঢাকাতেও। সবাই সবাইকে বলছে 'মাছ খেয়ো না।' মাছতো কবে থেকেই খাওয়া ছেড়েছি। সেই নদীতে লাশের বহর ভেসে থাকার পর থেকেই।

টি এ বি সি ইনজেকশান নেওয়া দরকার। মিয়াকে ফোন করা হয়েছিল গতকাল। সে আজ দুপুর বারোটা নাগাদ আসবে বাসায়। মিয়া অর্থাৎ ডাঃ জহুরুল হক রেবার বড় বোনের দেবর। হোলিফ্যামিলি হাসপাতালে কর্মরত।

দশটার দিকে নিউ মার্কেটে গিয়ে ইনজেকশানের জন্য ওষুধ কিনে মার বাসায় গেলাম। টি এ বি সি দেওয়ার জন্য মা আর লালুকে নিয়ে এলাম।

পাঁচটার সময় রুমী বলল, 'গাড়িটা একটু নেব আব্বু।'

শরীফ বলল, 'আমাকে ক্লাবে নাবিয়ে দিয়ে যা।'

রুমী গাড়িতে ওঠার আগে আস্তে করে বললাম, 'সাবধানে।'

রুমী একটু হাসল আমার দিকে চেয়ে।

সন্ধ্যার আগ দিয়ে মনু এল, বললাম, 'রুমীতো একটু বেরিয়েছে। এসে পড়বে এক্ষুনি। যাও, ওপরে ওর ঘরে গিয়ে বসো।' মুন দোতলায় উঠতে না উঠতে রফিক এল। শরীফ নেই শুনে বেশিক্ষণ বসল না, আমিও চাপাচাপি করলাম না। এখন মনুর সঙ্গে কথা বলার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি।

রফিককে বিদায় দেওয়ার জন্য দরজা খুলতেই দেখি ওয়াহেদ সাহেব ঢুকছেন-শরীফের এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু! বলে উঠলাম, 'শরীফ যে এক্ষুনি ক্লাবে গেল। আপনারও নাকি যাওয়ার কথা?'

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, 'তাই নাকি? তাহলে ক্লাবেই যাই।'

উনি চলে যেতেই দরজা বন্ধ করে আমি দুদ্দাড় ওপরে উঠে এলাম। মনু আর জামী বসে বসে গল্প করছে। আমাকে দেখে মনু একটু উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসল। বললাম, 'কী খবর বলো।'

'খবর আর কী! এই চলছে। বিভিন্ন গেরিলা গ্রুপ ঢাকায় আসছে, আলাদাভাবে নির্দেশমতো কাজ সেরে আবার চলে যাচ্ছে। আমরা ইচ্ছে করেই একদল আরেক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি না। অবশ্য দেখাসাক্ষাৎ হয়েই যায়— বন্ধুবান্ধব সব গ্রুপেই আছে।'

মনু চুপ করল। আমি আর কোনও প্রশ্ন করলাম না। প্রশ্ন করা নিষেধ। বেশি জানা বিপজ্জনক। আমি অন্য প্রসঙ্গ তুললাম। 'পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা তো খুব খারাপ।'

মনু সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল। বললাম, 'তিন মাস থেকে উৎপাদন বন্ধ। রপ্তানি বন্ধ। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের লোন শোধ করার ক্ষমতা নেই, নতুন লোন পাওয়ার কোনও আশা দেখা যাচ্ছে না। অথচ বাজেট তৈরির সময় এসে গেল। এত ঢাকঢাক করার পরেও গভর্নমেন্ট এতটুকু কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে— মার্চ-এপ্রিলে প্রদেশের উৎপাদনে যা ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করা কঠিন হবে। গতবছর রপ্তানি খুব ভালো হয়েছিল। এবার একেবারে গোল্লা।'

মনু বলল, 'অথচ পাকিস্তান সরকার কীরকম দু'কান কাটা নির্লজ্জ দেখুন, বলছে- জাপানের কাছে যে তিন কোটি ডলার ধার পাওয়ার কথা ছিল, সেটা জাপান দেয়নি বলেই পাকিস্তান এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ধার শোধ করতে পারছে না।' মনু দেখছি, দেশের হালচালের বেশ ভালো খবর রাখে।

হঠাৎ একটা আওয়াজে চমকে উঠলাম। দূরে কোথাও বোমা ফাটল বোধহয়। প্রথমটার রেশ মিলাতে না মিলাতেই আরেকটা শব্দ, তারপর আরও একটা। আমি ছটফট করে উঠে দাঁড়ালাম। ঘড়িতে দেখলাম আটটা বাজে। কথায় কথায় এতটা সময় চলে গেছে। রুমী এখনও ফিরছে না কেন। ওই এক দোষ, গাড়ি হাতে পেলে হয়। সময়জ্ঞান তখন আর থাকে না। জামী রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার ধরল। আমি স্থির হয়ে শুনতে পারছিলাম না। 'তোমরা শোনো' বলে ছাদে উঠে গেলাম।

একটু পরেই গাড়িটাকে গেটে ঢুকতে দেখলাম। তরতর করে নীচে নেমে গিয়ে নিজেই দরজা খুললাম। রুমীর মুখে কাঁচুমাচু হাসি। ধমক দিয়ে বললাম, 'গাড়ি হাতে পেলে হুঁশ থাকে না, না? ওদিকে মনু এসে বসে আছে সেই সন্ধে থেকে। কোন রাস্তা দিয়ে এলি? কোনও শব্দ পেয়েছিস?

'পেয়েছি। ঠিক বুঝতে পারলাম না কোথায়।'

একটু পরে শরীফ বাড়ি ফিরল। বলল, ওরা ঢাকা ক্লাব সুইমিং পুলের বারান্দায় বসেছিল। উত্তরদিকে বোমা ফাটার শব্দ পেয়েছে। খুব সম্ভব রেডিও স্টেশনে ফেটেছে। কারণ ঢাকা ক্লাবের উত্তরেই রেডিও স্টেশন।

রুমী হঠাৎ বলে উঠল, 'না, না, রেডিও স্টেশনে না, রেডিও স্টেশনে না। নিশ্চয় ইন্টারকনে। ওখানে এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক মিশনের লোকজন আর ইউনাইটেড নেশনস-এর প্রিন্স সদরুদ্দিন আছে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি— বোমা ওখানেই ফেটেছে।'

আমাদেরও তাই মনে হল। ওখানে বোমা ফাটানোর যৌক্তিকতাই সবচেয়ে বেশি।

মনু উঠে দাঁড়াল, রুমীর দিকে চেয়ে, ধীর শান্ত গলায় বলল, 'আমরা পরশুদিন সকালে রওনা দেব।'

(ক্রমশ)

গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি

সমরেশ মজুমদার

পূ র্বা নু বৃ ত্তি

পড়াশোনা করার জন্য বাবা-মা পাঠিয়ে দিলেন জলপাইগুড়িতে পিতামহ এবং বিধবা পিসির সংসারে। পাশের বাড়ির কমলা কাকিমার এবং ঝুমুরদির প্রভাবে স্বপনকুমার, শশধর দত্ত ও ক্রমে নীহাররঞ্জন গুপ্তের গোয়েন্দা গল্প দিয়ে বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রবেশ। এরপর বাবুপাড়া পাঠাগারে নাম লিখিয়ে নীপা নামের এক শ্যামবর্ণা কিশোরীর সঙ্গে আলাপ, 'শেষের কবিতা' পড়ে লাবণ্যের সঙ্গে বন্ধু নিশীথের মায়ের মিল খুঁজে পাওয়া। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একদিন রাতে লুকিয়ে সিনেমা দেখতে যেতে হয়েছে। এরপর অসুস্থ নীপাকে 'জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা' দিতে ওদের বাড়ি গেলে নীপা 'বনলতা সেন' কবিতাটি পড়তে বলল। মনে হল, বনলতা সেন খুবই চেনা। তিনি সিনেমার সেই নায়িকা। এদিকে নিশীথ আর স্বপনের প্রেমপত্র লিখে দিতে হয়। কোটেশনের জন্য নতুন নতুন বই চাই। হাতে এল 'সঞ্চয়িতা'। নীপার কথায় 'চাঁদের পাহাড়' পড়েও মুগ্ধতার শেষ নেই। স্কুলের শেষ পরীক্ষা শেষ হল। লাইব্রেরিতে গিয়ে হাতে এল চিনা উপন্যাসের অনুবাদ 'রিক্সাওয়ালা'। সেখানে বারবণিতা পল্লির কথা পড়ে বন্ধুদের বলতেই তারা একদিন নিয়ে গেল বারবণিতাপল্লির মধ্য দিয়ে। পরিবেশ দেখে মনে হল, যেন উপন্যাসের পটভূমিটাই উঠে এসেছে বাস্তবে। কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনোর সুযোগ বাড়ল। বাংলা গল্পে মোপাসাঁ আর ও হেনরির প্রভাব তখন জাঁকিয়ে বসেছে। অর্থাৎ, গল্পের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় হঠাৎ রাশ টেনে একেবারে শেষ দিকে গল্পের অভিমুখ বদলে দিয়ে পাঠককে স্তম্ভিত করে দেওয়া।

১০

রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছিলেন বলেই শিক্ষিত বাঙালি তাঁর মৃত্যুর সত্তর-একাত্তর বছর পরেও স্বস্তিতে বাঁচতে পারছে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন তাঁর কবিতার শতবর্ষ পূর্তিতেও বাঙালি পাঠক তাঁকে ত্যাগ করবে না। সেই পাঠক কে, কী তার পরিচয় তা জানার কৌতূহল ছিল রবীন্দ্রনাথের। কজন কবি এমন আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে পারেন? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত জানতেন না যে তাঁর গান বাঙালির হৃদয়ে ঠিকঠাক বসতে অন্তত বাহাত্তর বছরও কম সময়, বসার পর তা মুক্তিমন্ত্র হয়ে বেঁচে থাকবে যতদিন বাঙালি বাংলায় কথা বলবে।

গীতবিতানের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবি এইসব গান তাঁর মনে কখন এল? প্রেম পর্যায়ের নয় নম্বর গানে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে।' বেশ কথা। সেসময় কবি কী করছিলেন জানি না কিন্তু, 'তখন তুমি ছিলে না মোর সনে' লিখে একাকীত্ব বুঝিয়েছেন। তাহলে কি রাতের বেলা একা থাকলে তাঁর মনে মাঝে মাঝে গান আসত? কেউ, বিশেষ কেউ কাছে থাকলে তাকে যে কথাটা বলা যায় না, বলতে বাধে, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, সেই কথাটা একা হলেই জ্বলে ওঠে সুরের হোমানলে? লিখেছেন, যখন তুমি আমার সঙ্গে থাকো তখন প্রাণপণে চাইলেও বলতে চাওয়া কথায় সুর লাগে না।

অতএব ধরেই নিতে পারি তিনি এইসব গান, যা তাঁর প্রাণের কথা, যা আমাদেরও কথা, লিখে গিয়েছেন যখন তাঁর পাশে কেউ ছিল না। মনে পড়ছে অমিয়া ঠাকুরের মুখে শোনা একটা ঘটনা। অমিয়া ঠাকুর হয়তো অতি-প্রচারিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ছিলেন না, সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। পরে বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতবিশেষজ্ঞ সুভাষ চৌধুরীর সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। বেকবাগানের কাছে থাকতেন। বার্ধক্যে পৌঁছেও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাউদ্রেককরা সৌন্দর্যের অধিকারী। তখন আমি যুবক। তাঁর কাছে ঠাকুরবাড়ির গল্প শুনতে যেতাম। অমিয়া ঠাকুরের গলায় লিখি, 'আমি তখন ঠাকুরবাড়ির নতুন বউ। সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকি, যদি কোনও ভুল করে ফেলি। তা এক ছুটির দুপুরে, খুব গরম পড়েছিল সেদিন, চারধার চুপচাপ, যে যার ঘরে ঘুমোচ্ছে, আমার কৌতূহল হল জানার, বাবামশায় কী করছেন! এখন ভাবলেই অবাক হই। আমি তখন পুঁচকে মেয়ে, কী সাহসে উঁকি মেরেছিলাম তাঁর ঘরে। দেখলাম তিনি শূন্য ঘরে একা বসে আছেন চেয়ারে। চোখ বন্ধ, হাতে তাল দিচ্ছেন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। আমি সরে আসার আগেই তিনি চোখ খুললেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ওখানে?'

আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে দরজায় দাঁড়াতেই বললেন, 'ও, তুমি! ভালো হয়েছে। এদিকে এসো।'

কী শাস্তি দেবেন এই আশংকা নিয়ে কাছে যেতেই চেয়ার ঘুরিয়ে কাগজ খুঁজলেন। না পেয়ে একটা পোস্টকার্ডের পিছন দিকটায়, মানে যেদিকে ঠিকানা লেখা থাকে তার পাশের ফাঁকা জায়গাটায় দ্রুত কিছু লাইন লিখতে শুরু করলেন। তারপর লেখা হয়ে গেলে হাসলেন, 'ব্যাস, হয়ে গেল।' বলে ওই পোস্টকার্ডটা আমায় দিয়ে বললেন, 'এটা তোমার কাছে রেখে দাও। কিন্তু গানটা পরিষ্কার করে লিখে আমাকে দিয়ে যেও।'

আমি ঘাড় নেড়ে পোস্টকার্ড উল্টে দেখতে পেলাম, ওটা ওঁকে লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর চিঠি। উনি আমার মনের কথা বুঝে মাথা নেড়েছিলেন, 'ঠিক আছে। নিয়ে যাও।'

এই ঘটনা প্রমাণ করে তাঁর মনে একলা হলেই গান আসত। হাতের কাছে কাগজ না থাকায় সেইসব গানের কিছুটা নিশ্চয়ই আমাদের অজানা থেকে গিয়েছে। গানের কথা এবং সুর মনে এলে হারিয়ে যেতে বেশি সময় নেয় না। তবু রবীন্দ্রনাথ কতগুলো গান লিখেছিলেন? গানগুলোর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে, পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক। এছাড়া আছে ছয়টি গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গান। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভানুসিংহের পদাবলী, নাট্যগীতি ইত্যাদি। পূজা পর্বের গানের সংখ্যা ৬১৭, স্বদেশ পর্বের গান ৪৬, প্রেম ৩৯৫, প্রকৃতি ২৮৩, বিচিত্র ১৪০, আনুষ্ঠানিক ২১ = ১,৫০২। অর্থাৎ গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ইত্যাদি ছাড়া এই পনেরোশো দুটি গানই রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম সারিতে জায়গা পেয়েছে। নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্যের প্রচুর গান যা ওই পনেরোশো দুই-এর মধ্যে নেই তা অবশ্যই প্রেম পর্যায়ে জায়গা নিতে পারে এবং আমরা নাটকের কথা মনে না রেখে গানগুলি থেকে চমৎকার তৃপ্তি পেয়ে থাকি। এইসঙ্গে প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের ১০১টি গান, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের ১৭টি গান, পূজা ও প্রার্থনার ৮৩টি গান, জাতীয় সঙ্গীত পর্যায়ের ১৬টি গান, নাট্যগীতির ১৩২টি গান, ভানুসিংহের পদাবলীর ২০টি গান যোগ করলে সংখ্যাটা হয় ১,৮৭১। এর সঙ্গে শাপমোচন, শ্যামা ইত্যাদির গান ধরলে সংখ্যাটা সম্ভবত দু'হাজারের কাছাকাছি হয়ে যাবে। এই এত গান রবীন্দ্রনাথ কি একলা থাকার সময়ে লিখেছিলেন? লিখেই দীনু ঠাকুরের কাছে পাঠাতেন সুর-স্বরলিপির জন্য? যখন জাহাজে চেপে বিদেশে যেতেন তখন দীনু ঠাকুর কোথায়? আমি জানি না, রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখার সুর নিজে কতগুলোর করেছেন, কতগুলো দীনু ঠাকুর করেছেন? কিন্তু প্রথমদিকে সমসাময়িক অনেকের লেখা গান রবীন্দ্রনাথের গান বলে চালু ছিল। এই দলে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ইত্যাদি। এর বেশির ভাগই ব্রহ্মসঙ্গীত হলেও রবীন্দ্রনাথের গানের ধারার সঙ্গে শব্দ, বাক্য এবং অর্থের ব্যবহার প্রায় মিলে যাওয়ায় ওই ভুল হয়ে গিয়েছিল। প্রথম সংস্করণের গীতবিতানের (খ) পরিশিষ্টে এগুলোর সংযোজন ভুলবশত হলেও পরে বর্জিত হয়েছে। আবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অন্তত পঁচিশটি লেখা গানে সুর দিয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে অতি উল্লেখ্য গান হল, অনেক দিয়েছ নাথ আমায়, প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, দে লো সখী, দে পরায়ে গলে, নীরব রজনী দ্যাখো মগ্ন জ্যোছনায়। কিন্তু ক্রমশ সময় স্মৃতি ভুলিয়ে দিয়েছে। এখন যাঁরা এই গানগুলো গান বা শোনেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সুরই শুনছেন ভেবে থাকেন।

এই যে এত গান, সেই ভানুসিংহের পদাবলী থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ লিখে গেলেন যাদের অতিক্রম করতে পরবর্তী সময়ের গীতিকাররা অক্ষম হলেন তা কবি কীভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। বলা হয়, বাংলার পল্লীগীতি, লৌকিক গীতি, বিশেষ করে লালনের গান রবীন্দ্রনাথকে পথ চিনিয়ে দিয়েছিল। লালনের গানের আধুনিক চেহারা আমরা তাঁর গানে পেয়েছি। কিন্তু তার প্রয়োগ একদম আলাদা। রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা গান মূলত কীর্তন, পল্লীগীতি, শ্যামাসঙ্গীত, টপ্পা-জাতীয় গানে সীমাবদ্ধ ছিল। নিধুবাবুর টপ্পায় অনেক আধুনিক লাইন দেখেছি যা সেই সময়ের কবিতায় দেখতে পাইনি। যেমন ভারতচন্দ্রের লাইন, আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'র মতো লাইন তাঁর কাছাকাছি সময়ের কবিরাও লিখতে পারেননি। মধুসূদন দত্ত চতুর্দশপদী অথবা কাব্যনাট্য লিখেছেন। অসাধারণ লাইন আছে সেখানে। কিন্তু তার প্রকাশ সময় ছাড়িয়ে তেমনভাবে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ, সম্ভবত এঁদের কাছ থেকেই শিক্ষা নিয়েছেন, নিয়ে নিজেকে তৈরি করেছেন। এই তৈরি হওয়াটা এত নিপুণভাবে হয়েছিল যে এখন মনে হয় তিনি তাঁর সময়ের অনেক পরের মানুষের জন্য জন্মেছিলেন।

প্রেম পর্যায়ের একশো চুয়ান্ন নম্বর গানটি আমার কাছে বিস্ময়ের। কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে। গানটি শুনলেই মনের ভেতর একটা গল্প তৈরি হয়ে যায়। এখন বন্ধ দুয়ারে কেউ আঘাত দিচ্ছে, যা শুনে মনে পড়ছে কেউ এর আগেও এমনি আঘাত দিয়েছিল, যে আঘাত দিয়ে চলে গিয়েছিল সে কি আবার এখন ফিরে এসেছে? এই যে প্রশ্নটি গানের কথায় উঠে এসেছে গাইবার সময় শিল্পীরা কি তার তাৎপর্য বুঝে গেয়ে থাকেন? যে আঘাত দিয়ে বন্ধ দরজা খোলা না পেয়ে চলে গিয়েছিল সে এই রাত্রে কি আমাকে আবার খুঁজতে ফিরে এল? নাকি যে এসেছিল সে আমার জীবনের সব আকুলতার সঙ্গী হয়ে আমাকে মগ্ন করে ফিরে গিয়েছিল একাকী রেখে? আমি তার জন্য প্রদীপ নিবিয়ে আজও একা বসে আছি। সেই সেদিনের নবীন অতিথি কি আবার ফিরে এল? নাকি এখন যে দুয়ারে আঘাত করছে সে নতুন কেউ, অজানা কেউ!

এই যে রহস্যের মধ্যে ডুবে থাকা, আমাদের ডুবিয়ে রাখা তা তাঁর আগে আর কেউ সক্ষম হননি। গীতবিতান নিজেকে আবিষ্কার করার গ্রন্থ নয়, মনের মালিন্য দূর করার জন্য মানবিক ঝরনাধারা। তাই গীতবিতান ছুঁয়ে বসে থাকি সর্বনাশের আশায়।

লেখকের সাময়িক অসুস্থতা বশত এই ধারাবাহিক লেখার প্রকাশ আপাতত স্থগিত রইল।

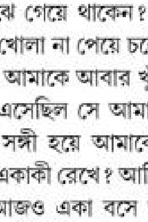

আমার ছবি জীবন

শুভাপ্রসন্ন

৫

আমি তখন রোগা। প্রায় বন্ধুহীন। কারও সঙ্গই আমাকে গভীর আকর্ষণ করে না। ঘুরে বেড়াই। জলরং আর ক্রমাগত স্কেচ করে চলি। এ অবস্থা অনেকদিন চলেছিল। অদ্ভুত অনিশ্চয়তায় উৎসাহহীন, উদ্দীপনাহীন তারুণ্য আর যৌবনের খাদে বয়ে চলেছিল। ক্রমশ আমার টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। আর্ট কলেজের ফাঁকে কাজ জোটাবার রোজকারের ইতিউতি সন্ধান করে বেড়াই। নানান ধরণের অলংকরণের কাজ করি, প্রচ্ছদ আঁকি যৎসামান্য পয়সায়। তাই-ই আমায় সন্তুষ্ট রাখে। ক্রমশ পরিচিত হতে থাকি সাহিত্যিক কবি, চিত্রীদের সঙ্গে, এই কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় আমার চেয়ে অনেক বড় খালেদদাও (খালেদ চৌধুরি) ঘুরে বেড়ান। একদিন মনে আছে, হ্যারিসন রোডের ওপর কোনও এক বাড়ির দোতলায় প্রকাশকের ঘরে বসে আছি। কদিন থেকে ঘুরছি একটি প্রচ্ছদ নিয়ে। এঁকে দেখাই আর প্রকাশক বলেন কিছু কিছু বদলে দিতে। আবার যাই, উৎকণ্ঠায় থাকি, পছন্দ হবে তো? পছন্দ হলে এক থেকে দেড় মাস পরে পঞ্চাশ টাকা পাব।

আমি লাগামছাড়া। গৃহবন্দি নই। যা করি সবই বাড়ির অমতে। পরিচিত ছকে, নিয়মে, নির্দেশে খাপ খাওয়াতে পারি না। তবে গোড়া থেকেই বাবার কিছু নির্দেশ মনের মণিকোঠায় ঢুকিয়ে রেখেছিলাম— যা আজও খোয়া যায়নি!

মনে আছে আর্ট কলেজের গোড়ার দিকে চিন-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী পটভূমি। চিন আমাদের ঘাতক, তাই হিন্দি চিনি ভাই ভাই— এই আবেগ বর্জন করে সম্পূর্ণ একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে চিনের কোনও সংস্রব, চিনকে নিয়ে কোনও আবেগ, সম্পর্ক মুছে দেওয়ার চেষ্টায় মাতলাম। তখন মনোজ বসুর 'চিন দেখে এলাম' প্রকাশ পেয়েছে। ওটাকেই মনে হল চিন-ভারত আবেগের জ্বলন্ত উদাহরণ। আমরা দশ-পনেরোটা বই জোগাড় করলাম। কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে এক-একটা ছিঁড়ে পোড়াতে লাগলাম সেই বই। 'চিন দেখে এলাম' বইতে মনোজ বসু চিন সম্পর্কে ভালো ভালো কথা লিখেছিলেন। আমাদের প্রতীকী বিপ্লব এরকম হতে লাগল। আবার, আর্ট কলেজের বন্ধুরা মিলে সিনিয়র দাদা-দিদিদের কথায় মিউজিয়ামে আমাদের ছবির প্রদর্শনীর আয়োজনে মেতে উঠলাম— উদ্দেশ্য চাইনিজ অ্যাগ্রেশন ডিফেন্স ফ্রন্টে আমাদের ছবি বিক্রির টাকা দান করা। আমাকে

পাড়ায় পাড়ায় লুকিয়ে লুকিয়ে এক রোম্যান্টিক বিপ্লবীয়ানার আঁচ দেখতে পাই চারদিকে। 'চার অধ্যায়'-এর এলা-অতীন পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠে। কত তরুণ অতি বিপ্লবী হয়ে উঠেছিল তা কিন্তু চারু মজুমদারের আদর্শে নয়, পাশের বাড়ির অসংখ্য এলার প্রেমে।

যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন ভালোবাসতেন তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম ওই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে।

হ্যাঁ, আরেকটা সেই সময়ের ঘটনা মনে আছে— খুব ছেলেবয়েসে আমার বিস্ময়ের কেন্দ্র ছিল 'কুমারটুলি'। কী সুন্দর দেবীমূর্তি গড়ে তোলেন ওঁরা। মাঝে মাঝে চলে গিয়ে লক্ষ করতাম, কাঠামো গড়া থেকে মাটি দেওয়া, মসৃণ করা, শুকিয়ে গেলে রং করা, আঠা, রাংতা, শোলায় অলংকরণ করা— দেখে দেখে শিখে নিয়েছিলাম। বাড়িতে এসে সেই কবে ছেলেবয়েসে কালীমূর্তি গড়েছিলাম, তার পুজো সাজসজ্জা সবই আমি। কবেকার কথা। সেই বাহবা পাওয়ার কালে সবই করে ফেলতে পারতাম। এই সময় পাশের পাড়ার বন্ধুরা অনুরোধ করল কালীপুজোর মূর্তি গড়তে। সর্বজনীন কালীপুজোর মূর্তি গড়ার দায়িত্ব কম কথা নয়। উদ্দেশ্য, সেই মজুরি বাঁচিয়ে চিন-যুদ্ধের অর্থভাণ্ডারে দান করা। গড়েছিলাম সেই মূর্তি। প্রফুল্ল সেন, পূরবী মুখার্জিরা এসেছিলেন উদ্বোধনে। পারিশ্রমিক বাবদ পাওয়া একশো এক টাকা দান করা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পাড়ার সেই ক্লাবের তরফ থেকে। আজ ভাবলে হাসি আসে। একশো টাকা দানগ্রহণের জন্য আরামবাগের সেই গান্ধি সহজ, সরল, সৎ, অকৃত্রিম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন এককথায় তাঁর সহকর্মী মন্ত্রী পূরবী মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে আমার ডাকে চলে এসেছিলেন। সময় কত গুণ বদলে যায়!

প্রকৃতিতে নয়, সমাজে তখন উত্তাল আবহাওয়া। কোন নিম্নচাপ থেকে তা জানি না— এ তো মৌসুমি বায়ুর প্রভাব নয়, টর্নেডো কী, সুনামি কেন হয় তা ভূবিজ্ঞানীরা, আবহাওয়াবিদরা ব্যাখ্যা দেন। উন্নত বিজ্ঞান তা নিয়ে যুগের পর যুগ ধরে গবেষণা করে যায় কিন্তু দুর্যোগ হয়, হয়ে থাকে।

পশ্চিমবাংলায় যে আন্দোলন আমাদের সমাজজীবনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিল, অজস্র তরুণ প্রাণ হারাল, গৃহযুদ্ধের অবস্থা, অস্থিরতা, নানান মতবাদের কষাকষি, তার মধ্যে ভেসে আসে নকশালবাড়ির চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, কাকা— কত নাম। আমি কলেজ স্ট্রিটে থাকি। সমস্ত অশান্ত সময়ের নোঙর এখানেই বাঁধে নাবিকরা। সন্তর্পণে ঘোরাফেরা করি। কোন বন্ধু কখন শত্রু হয়ে গিয়েছে বুঝি না। অদ্ভুত লাগে, পাড়ায় পাড়ায় লুকিয়ে লুকিয়ে এক রোম্যান্টিক বিপ্লবীয়ানার আঁচ দেখতে পাই চারদিকে। 'চার অধ্যায়'-এর এলা-অতীন পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠে। কত তরুণ অতি বিপ্লবী হয়ে উঠেছিল তা কিন্তু চারু মজুমদারের আদর্শে নয়, পাশের বাড়ির অসংখ্য এলার প্রেমে।

আর্ট কলেজে থাকাকালীন আরেকটা সংস্থায় কাজের দায়িত্ব পাই। ইলাস্ট্রেশন জানার সুবাদে। বেলাল চৌধুরি আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দেন। মৌলালির মোড়ে পত্রিকা সিন্ডিকেটের অফিস। তারা পূর্বভারতে বিখ্যাত আমেরিকান ম্যাগাজিনগুলির পরিবেশক। মালিক ছিলেন সুকমলকান্তি ঘোষ। আমার কাজ তাঁদের প্রকাশনাগুলির প্রচ্ছদ আঁকা, অলংকরণ করা, চিত্রিত করা। কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যেতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রায়ই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও গ্যালিপ্রুফ না পাওয়ায় কাজ করতে পারতাম না। এদিকে প্রকাশকমশাই চাপ দিতেন। আমি কীই বা করতে পারি! অবশেষে কারণটা জানা গেল, বেলাল চৌধুরি, যাঁর দায়িত্ব প্রুফ দেখা, তিনি অনিয়মিত। কোনও সময়ের ঠিক নেই, অথচ তাঁকে ছাড়া আমার কাজ প্রায় অসম্ভব। বেলালদার অসুবিধা নেই। কারণ, সর্বোচ্চ মালিকের সঙ্গে তাঁর গেলাসের বন্ধুত্ব। দুজনেই লুটোপুটি খান। কোনও পানশালায়, কিংবা কোনও ঠেকে। কাজেই তাঁর চাকরি যাওয়ার ভয় নেই। কিন্তু আমার? শেষপর্যন্ত বেলালদাকে ধরি, বেলালদা জানান, ওঁর বাসা একুশ নং ক্যামাক স্ট্রিট। সেখানে সকালে যেতে বলেন। প্রুফের কাগজগুলি সেখান থেকে উনি আমাকে দেবেন। কারণ দিনেরবেলা তিনি ঠিকঠাক থাকেন। সেইমতো অনুসন্ধান করে পৌঁছে যাই ক্যামাক স্ট্রিটে ভোর ছ'টায়, সপ্তাহে দু'দিন করে।

এই ডেরাটিরও একটি ছোট গল্প আছে। 'জু' নামে একটি ইন্দোনেশিয়ান ছেলে আর্ট কলেজে পড়বার জন্য কলকাতায় আসে। ভর্তিও হয় বোধহয়। একুশ নম্বর বাড়ির নীচের তলায় বুলগান নামে ওখানকার আরেক ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে চুক্তি করে ওই বহুজাতিক পাড়ায় ঘরটি সে ভাড়া নেয়। 'জু' বেলালদাকে ছেড়ে দিয়েছে ক্যামাক স্ট্রিটের ছোট ফ্ল্যাটটি। তার পরিবর্তে সে থাকে কোনও পাঁচতারা হোটেলে। অজস্র বই, আর কিছু আসবাব নিয়ে বেলালদা সংসার চালান। সংসারের বাকি সদস্যরা সাময়িক। গভীর রাতে উইন্ডসার বার থেকে ভরাট পেটে ফিরতেন একযোগে সে সংসারের বাসিন্দারা। অনেকেরই বাড়ি ফেরার মতো অবস্থা থাকত না। বেলালদার ক্যামাক স্ট্রিটের ঠেক ছিল সেইসব মার্গ পথের বন্ধুদের আশ্রয়। আমি ভোরে পৌঁছে দেখতাম ফর্সা আদুল গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে গতরাতের ঘোর কাটিয়ে বেলালদা চাঙ্গা। একচিলতে বিছানায় দুটি ঘুমন্ত দেহ। একটি দেহ মেঝেতে। একজনের মাথা অন্যজনের পায়ের দিকে। তখনও তাঁরা প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছেন। কখনও কখনও হঠাৎ উঠে পড়ছেন। আবার ধপাস করে শুয়ে পড়ছেন। একটি গানের ভাঙা কলি উগরে দিলেন কেউ। কখনও কখনও দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। ওঁদের সকাল যে কখন হবে, তা জানার সময় আমার থাকত না। ওঁরা কলকাতার সে সময়কার অত্যন্ত উজ্জ্বল নামি যুবক। কেউ সাংবাদিক, কেউ উচ্চপদে আসীন। কবি ও চাকুরিজীবী। বেলালদা আমায় লেখা ধরিয়ে বুঝিয়ে দিতেন কী কী কাজ করতে হবে।

আমার কাজের স্থল হয়ে গিয়েছিল দুটো। একুশ নং ক্যামাক স্ট্রিট ভোর ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা, আর পত্রিকা সিন্ডিকেটে সপ্তাহে একদিন কী দু'দিন। নবকান্ত বড়ুয়ার অহমিয়া বই, কবি অজিত দত্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এঁদের বই প্রকাশ পেয়েছে। আমি প্রচ্ছদ-অলংকরণ করেছি, রোজগারও হচ্ছে। এভাবেই একদিন সকালে কাজ আনতে যাই বেলালদার কাছে। দেখি, সে বাড়ির মুখে জটলা। কিছু একটা বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। অনেক মহিলা চ্যাঁচামেচি করছে। তারা ওই বাড়ির উঠোনের পাশে আশ্রিত ধোবানি। গেট পেরিয়ে প্রশস্ত উঠোন। বাঁদিকে গেলে কিছুটা ঢুকে বেলালদার আস্তানা। দেখি এক মোটাসোটা লোক দাঁড়িয়ে। হিন্দি, ইংরিজি, উর্দুতে চ্যাঁচাচ্ছেন। কিছু গালিও বর্ষণ করছেন। সমস্ত আসবাব দুমড়েমুচড়ে পড়ে আছে বাইরে। যত্রতত্র ছুঁড়ে

ফেলা বই পড়ে আছে। বেলালদা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। আমি আর কী করতে পারি! সেই দিন থেকে একুশ নং ক্যামাক স্ট্রিটের দরজা বন্ধ। বেলালদা বই ও আসবাব বিক্রি করতে চান, আমি কিনে নিই বন্ধু অ্যালবার্টের জন্য— সেই চেয়ারগুলিও। আজকের কোনও প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ সাহিত্যিক, যিনি সেদিন যুবক ছিলেন, তিনি মদ্যপ অবস্থায় কোনও ঘুমন্ত ধোবানির গায়ে পড়ে গিয়েছিলেন। এমনিতেই ওই মহল্লার কেউই এইসব মানুষকে সুনজরে দেখত না। তাঁদের সৃষ্টিখ্যাতি এসব মানুষের জানার কথা না। ওদের কাছে এরা উপদ্রব। বাড়িওলাও সুযোগ খুঁজছিল বেলালদাকে ওঠাবার। আদ্যোপান্ত বিনয়ী, ভদ্র, বেলাল চৌধুরিকে হটানো যায় না। তাই এই অছিলায় বেলালদাকে ছাড়তে হল ক্যামাক স্ট্রিট। আমার যাওয়া বন্ধ হল।

নানা কারণে বেলালদার সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল অন্যান্য অনেকের চেয়ে বেশি। মাঝে মাঝেই আমার স্টুডিওয় চলে আসতেন। ওনারও তখন পাকাপাকি কাজ নেই। এখানে-ওখানে লিখে, অনুবাদ করে আর প্রচুর বন্ধুদের ভালোবাসায় তাঁর জীবন কেটে যেত। মদ্যপানের সঙ্গে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক হয়ে যায়। মদ্যপরাই সবচেয়ে বড় সাম্যবাদী দল। জাতপাতনির্বিশেষে, ধনীদরিদ্র, সৃষ্টিশীল মানুষ— সবাই এখানে একাকার। তাই অদ্ভুত অদ্ভুত বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বেলালদার। একদিন স্টুডিওয় হাজির করালেন অমলদাকে (অমল লাহিড়ী) তখনও তাঁর বিয়ে হয়নি। কিন্তু বান্ধবী ছিলেন অপেক্ষায়। সন্ধ্যায় এলেন ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে, কী সুন্দর গোলগাল চেহারা। তাঁদের মা মারা গিয়েছেন। সামনেই শ্রাদ্ধ। মা-র ছবি এঁকে দিতে হবে। একমাত্র ফটোগ্রাফ মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়। আর কোনও সামনাসামনি মুখের ছবি নেই। বোনকে আনার কারণ, বোনের মুখের সঙ্গে মা-র নাকি ভীষণরকম মিল। আমি তাঁদের মায়ের ছবি এঁকে দিই একশো টাকার বিনিময়ে। ওঁরা খুব খুশি হয়েছিলেন। বেলগাছিয়ায় ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। রাশভারী পিতা তখনও জীবিত। প্রতিষ্ঠিত ধনী ছিলেন তাঁরা। অমলদা বম্বেতে বড় চাকরি নিয়ে চলে যান। আসতেন মাঝে মাঝে কলকাতায় বন্ধুতার মৌতাত বজায় রাখতে। কলকাতা মানে তখন শক্তিদা, সুনীলদা, তারাপদদা, শ্যামলদা...। আর তাঁদের বৈঠকখানা ধর্মতলা, খালাসিটোলা। সেই বুদ্ধিদীপ্ত, টুকটুকে ফর্সা গোলগাল, মা-হারা, পিতার আদুরে মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় তাদেরই ড্রাইভারের প্রেমে। জেদি মেয়েটি পিতৃগৃহে আর ফিরে আসেনি। কোনও এক বস্তিতে নতুন জীবন শুরু করেছিল তারা।

কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে আলাপ হয় ইন্দ্রদার সূত্রে। তখন কমল মজুমদারের মাথায় শুধু অঙ্ক-ভাবনা। আমার লাইব্রেরির পাশে ছোট নিচু ঘরখানা ব্যবস্থা করে দিলাম। শুরু হল 'অঙ্ক-ভাবনা' পত্রিকা।

কিছুদিন পরে একদিন অমলদার বোন আমার কাছে আসে। মানুষের রূপ কত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়! সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের সততার কথা নিয়ে বেলালদা কলকাতার কড়চায় লিখেছিলেন। আরেকজনকে দেখতাম। কলকাতার কবি, লেখকমহলে তাড়াতাড়ি পরিচিতি পেয়েছিলেন— যোগব্রত। হঠাৎই এক দুর্ঘটনায় হারিয়ে গিয়েছিলেন।

আর্ট কলেজের বছর এগিয়ে যায়। আমার বলয় পাল্টে যায়। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার টেমার লেনের মুখে একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলব। 'সবুজ বাহিনী'র ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গিয়েছে। শৈশবে দ্বিধাহীনভাবে সংরক্ষণশীল পরিবার থেকে যেসব ছেলেমেয়েকে জড়ো করে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শামিল করতাম— পরে তারা বড় হতে লাগল। শৈশব-কৈশোর থেকে তারুণ্য-যৌবনের দোরগোড়া খুব তাড়াতাড়ি পেরিয়ে এল। আমি সেইভাবে আর সকলকে জড়ো করতে পারলাম না। জীবনের সরলরেখা পেরিয়ে জটিল আবর্তে ঢুকে পড়েছে তারা। আমিও তখন আর ছোটদের নয়, বড়দের।

জীবনসংগ্রামের রসদ জোগাড় করা খুব কঠিন ব্যাপার। একদিকে অলংকরণ, প্রচ্ছদ আঁকা, আর অন্যদিকে পত্রপত্রিকার অফিসে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলা— এভাবেই আমার এক পরিচয় থেকে আর এক পরিচয়ের পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। যুগান্তর আর আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয়টা আরেকটু পরে। সবুজ বাহিনী, শিশু উৎসব, ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন— এসবের পালা শেষ করে টেমার লেনে পুরনো ক্লাব নবজীবন সংঘে অবশেষে জড়িয়ে পড়া। সেখানে একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলি। প্রথমে বাড়ির পুরনো বই, যার বেশিরভাগটাই বাবার সংগ্রহের, জড়ো করি লাইব্রেরির জন্য। আর চারপাশের প্রকাশকদের কাছে হাত পাতি। ওখানেই কত বন্ধু জড়ো হতে থাকে। যারা একটু অন্যরকমের। ছবি নিয়ে, কবিতা নিয়ে, গল্প নিয়ে আলোচনা চলে নিয়মিত। এদিকে দিনের বেলা ঘুরে ঘুরে রোজগারের চেষ্টা করি। নতুন নতুন প্রকাশকের দরজায় কড়া নাড়ি, প্রচ্ছদ আঁকার জন্য। কখনও কখনও মেতে উঠি মেলা সাজানো, মঞ্চ সাজানো— এসব কাজের দায়িত্বে। নাটকের দলে যুক্ত হয়ে যাই, পোস্টার আঁকি— এভাবে দিন কাটতে থাকে। এখানে একদিন হুড়মুড় করে ইন্দ্রনাথ মজুমদার ঢুকে পড়েন। তাঁর পুরনো বইয়ের ব্যবসা। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ঘর খুঁজছেন। বলিষ্ঠ, লম্বা, ফর্সা, চওড়া চেহারা। গায়ে মোটা খদ্দরের জামা, আর পাজামা। সেসময় তিনি কংগ্রেস সেবাদলের দায়িত্বে। পাইকপাড়ার বিধান ছাত্রাবাসের পরিচালক। নেশা, পুরনো বই সংগ্রহ করা। পরে পুরোপুরি সেই ব্যবসায় নেমে পড়েছিলেন। আমর সঙ্গে ঘর খুঁজতে এসে প্রথম পরিচয়। আর সেই পরিচয়-সূত্র থেকে একটা খুব সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে আলাপ হয় ইন্দ্রদার সূত্রে। তখন কমল মজুমদারের মাথায় শুধু অঙ্ক-ভাবনা। উনি আমাকে কী করতে চান সব বললেন। আমার লাইব্রেরির পাশে ছোট নিচু ঘরখানা ব্যবস্থা করে দিলাম। শুরু হল 'অঙ্ক-ভাবনা' পত্রিকা। আর অন্যান্য প্রকাশনা সেই আশ্রয় থেকে।

আমি তখন রোগা। প্রায় বন্ধুহীন। কারও সঙ্গই আমাকে গভীর আকর্ষণ করে না। ঘুরে বেড়াই। জলরং আর ক্রমাগত স্কেচ করে চলি। এ অবস্থা অনেকদিন চলেছিল। অদ্ভুত অনিশ্চয়তায় উৎসাহহীন, উদ্দীপনাহীন তারুণ্য আর যৌবনের খাদে বয়ে চলেছিল। ক্রমশ আমার টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। আর্ট কলেজের ফাঁকে কাজ জোটাবার রোজকারের ইতিউতি সন্ধান করে বেড়াই। নানান ধরণের অলংকরণের কাজ করি, প্রচ্ছদ আঁকি যৎসামান্য পয়সায়। তাই-ই আমায় সন্তুষ্ট রাখে। ক্রমশ পরিচিত হতে থাকি সাহিত্যিক কবি, চিত্রীদের সঙ্গে, এই কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় আমার চেয়ে অনেক বড় খালেদদাও (খালেদ চৌধুরি) ঘুরে বেড়ান। একদিন মনে আছে, হ্যারিসন রোডের ওপর কোনও এক বাড়ির দোতলায় প্রকাশকের ঘরে বসে আছি। কদিন থেকে ঘুরছি একটি প্রচ্ছদ নিয়ে। এঁকে দেখাই আর প্রকাশক বলেন কিছু কিছু বদলে দিতে। আবার যাই, উৎকণ্ঠায় থাকি, পছন্দ হবে তো?

ইন্দ্রদারা সদলবলে বেরিয়ে যেতেন ধর্মতলায়। কমলকুমার মজুমদার ছিলেন এঁদের পরিচালক, আর ইন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন প্রযোজক, রঙ্গমঞ্চ ছিল খালাসিটোলা। ওঁরা বলতেন কেটি।

পছন্দ হলে এক থেকে দেড় মাস পরে পঞ্চাশ টাকা পাব। একদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর যখন জানতে পারি লেখক বলেছেন রংটা বদল করতে— খুব মন খারাপ হয়। বেরিয়ে পড়ি। পাশের ঘর থেকে খালেদদা বেরিয়েছেন। মুখোমুখি হই। সিঁড়িতে নামতে নামতে সব বলি। খালেদদা বলেন, শুভা এরকম আমারও দিন গিয়েছে। কোনও এক প্রকাশক দ্বিতীয় বারের পর যখন বললেন যে লেখক বলেছেন বদল করতে, তখন আমি তাঁকে জবাব দিয়েছিলাম— লেখককে কিন্তু আমি বলিনি তাঁর লেখা বদল করতে। আপনাকে এ প্রচ্ছদ নিতে হবে না, বলে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। আমাদের সবাই বেগার মনে করে। সুতরাং, তুমি এর পরে আর ওর দোরগোড়ায় যেও না। আমি খানিকটা জোর পাই। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ঘরে ঘরে কত ঘুরেছি, কত কাহিনি, কত অভিজ্ঞতা, মান-অপমান, প্রশংসা, ঘৃণা— তাতেই অনেক কাহিনি লেখা হয়ে যাবে।

আমার জীবনে আসল পাওয়া বহু মজার মানুষের সংস্পর্শে আসার অভিজ্ঞতা। ঘরে তো থাকতাম কম— স্নান, খাওয়া আর কমার্শিয়াল কাজটুকু ছাড়া ছবি আঁকতাম বাইরে, আর বাকিটাও বাইরে। ঘরে ঠেক নড়বড়ে ছিল বলেই বাইরে অনেক ঠেকে মেতেছিলাম। পাঁচজনকে নিয়ে মেতে ওঠা সেই তখন থেকে। যেমন অন্য সংগঠনে জড়িয়েছি, তেমনই নিজেও সংগঠন করেছি অনেককে নিয়ে কারণে, অকারণে।

আমাদের বাড়ি ছিল একটু অন্যরকমের। বাড়িতে কখনও কেউ চা খেতেন না, কখনও নেশাও ঢোকেনি কোনওদিন। সিগারেট, মদ্যপান তো দূরের কথা। মূলত বাবার সুকঠিন নিয়মনির্দেশের জন্য। সেটাই আমার জীবনে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছে যা কৈশোর-তারুণ্য-যৌবন-প্রৌঢ়ত্বেও অবিচল রয়েছে। অথচ আমার সমস্ত ঘোরাঘুরি আর মেলামেশা ছিল সৃষ্টিশীল, ছন্নছাড়া— একটু অন্যরকম মানুষজনদের মধ্যে। অতি অল্পসংখ্যক লোক দেখেছি যাঁরা তথাকথিত নেশাহীন জীবনযাপন করেন। দেখেছি যাঁরা নেশায় অভ্যস্ত তাঁরা কেমনভাবে তাঁদের ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, গুরুত্ব গাম্ভীর্য, পৌরুষ এমনকি মনুষ্যত্বও অবলীলায় নষ্ট করতে পারেন— কিছু তরল কিংবা বায়বীয় অহেতুক পদার্থের জন্য!

প্রতি সন্ধ্যায় ইন্দ্রদা ঝাঁপি বন্ধ করে চলে যেতেন ধর্মতলায়। বিগত রাতে স্বাভাবিক উন্মাদনাকে ছাপিয়ে যদি কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটত পরদিন তা নিয়ে আলোচনা হত সেই আড্ডায়। আমি জানতে পারতাম সেভাবেই। কিংবা কারও মাথায় ব্যান্ডেজ, কারও চশমার কাচ ভাঙা অথবা কারও অনুপস্থিতি— এগুলোও গত রাতের ঘটনার সাক্ষ্য। ভাবলে মনে হয়, কলকাতায় এতজন সৃষ্টিশীল মানুষের আনাগোনা বোধহয় আর কোথাও হত না। সত্যজিৎ রায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, লোকনাথ ভট্টাচার্য, অশোক মিত্র, পরিতোষ সেন, রাধারমণ মিত্র প্রমুখ প্রবীণরা থেকে পরের প্রজন্মের সৃষ্টিশীল দামালরা। আলোচনা হত এঁদের নিয়ে। আনাগোনাও ছিল এঁদের। ছাপাই-বাঁধাই-প্রচ্ছদ কত কী আলোচনার বিষয় ছিল। নীরোদ মজুমদারের ছবিতে রামপ্রসাদী গানের বই প্রকাশ হচ্ছে, গায়ত্রী স্পিভাক অনুবাদ করছেন। অসীম রায়ের উপন্যাস বেরোচ্ছে। 'এক্ষণ' এর চমকপ্রদ সব সংখ্যা। কার্ল মার্কস থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি বেরোচ্ছে। একের পর এক প্রচ্ছদ এঁকে চলেছেন সত্যজিৎ রায়। 'নটী বিনোদিনী'র আত্মজীবনীর প্রচ্ছদ এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়। হাতের ড্রয়িংটা আমার দুর্বল মনে হল। অতি গুণগ্রাহী কোনও একজন বলে উঠলেন, না-না শুভা ওটা মরালের গ্রীবার মতো।

লেখক কমলকুমার মজুমদারকে ঘিরে বহু মানুষের আনাগোনা। ইতিমধ্যে ইন্দ্রদাও মহাত্মা গান্ধি রোডে একটা বড় ঘর নিয়েছেন, বই বিপণনের জন্য। নাম সুবর্ণরেখা। অসংখ্য পুরনো বই জোগাড় হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং থেকে শুরু করে হেয়ার স্কুলের মাথা পর্যন্ত পুরনো বইয়ের ঝোলানো দোকান আমি বরাবর দেখে আসছি। গোড়ার দিকে ছিল খোপ করা করা রেলিংয়ে টাঙানো বুকসেলফ কিংবা এমনই স্তূপীকৃত বই। ওটা তো বইপাড়াই। চারদিকে প্রাচীন শিক্ষামন্দির। সেই ওয়াই এম সি এ পেরোলে ভবানী দত্ত লেন চলে গিয়েছে। তারপর থেকে সারি সারি পুরনো বইয়ের দেয়াল-দোকান।

কলেজ স্ট্রিটের একটা অন্যরকম গন্ধ, অন্যরকম প্রাণ ছিল। শুনেছি, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বারিদবরণ মুখার্জি, রাধাকমল থেকে শুরু করে বইপ্রেমী আর বই জড়ো করার মানুষেরা এই ফুটপাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করতেন।

মূলত, এই পুরনো বইয়ের ব্যবসা ছিল মুসলমানদের। এই শহরের অনেককিছুই মুসলমানদের অবদান। এরা যে সকলে বাঙালি তা না। এরা যে লেখাপড়া জানা তাও নয়। কিন্তু একটা চটি বইয়ের মূল্য যে কী সেটা বুঝতেন। সংগ্রহ করতেন অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গা থেকে। নানান খোয়া যাওয়া, চুরি হওয়া রাজা-মহারাজার সংগ্রহ থেকে শুরু করে বিখ্যাত শিক্ষাবিদের মাতাল বংশধরের কাছ থেকেও বই আসত। তাই এইসব বইওয়ালার সঙ্গে কলকাতা তথা বাংলার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বহু আদি ঘরের অদ্ভুত যোগাযোগ ছিল। আমার সঙ্গেও বহু দোকানদারের আলাপ ছিল, আছে। কত প্রাচীন বই খুব কম দামে সংগ্রহ করেছি ওখান থেকে। একদিন 'সবুজ পত্র'-এর প্রথম সংস্করণের ছাপা পত্রিকাটি হাতে আসে আমার। কিনেছিলাম আট আনা দিয়ে। এদের সঙ্গে ছিল ইন্দ্রদার দহরমমহরম। প্রায়ই দেখতাম বান্ডিল বান্ডিল বই নিয়ে 'সুবর্ণরেখা'য় আসত ওরা। ওদের সঙ্গে ইন্দ্রদার ভাষা একটু অন্যরকম। ইন্দ্রদাকে ঘিরে 'সুবর্ণরেখা'য় বসত আড্ডা। পুরনো দুষ্প্রাপ্য বইয়ের টানে সে সময়ের নামি বাঙালি বিদ্বজ্জনেরা আসতেন। এমনি এমনিও আসতেন অনেকে। নিয়ম করে কমলকুমার মজুমদার দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে চলে আসতেন। তখন চাকরি করতেন সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। সাদা হাতবন্ধ পাঞ্জাবি, সাধারণভাবে পরা ধুতি। হাতে একটা সাদা থলি। আর মাঝে মাঝে মুখে পুরতেন আফিমের ছোট্ট গুলি। আরেকজনও আসতেন যখন-তখন। কথা কম বলতেন। ফর্সা। একটু বয়েসের ভারে ন্যুব্জ। ধুতিটা একটু উঁচু করে পরা। হাতে সাদা থলি। তিনি রাধারমণ মিত্র। কলকাতার অলিগলি নিয়ে তখনও বইটি প্রকাশ হয়নি। তুমুল ঝগড়া চলছে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তখন, তাঁর। সে ঝগড়া সামনাসামনি নয়। চিঠিপত্রে। কলকাতা নামের ব্যুৎপত্তি— এটাই হচ্ছে বিতণ্ডার সূত্র। কেউ বলছেন কলিচুনের আখড়া থেকে, কেউ বলছেন কালী থেকে। আর জড়ো হতেন অসংখ্য যুবক-লেখক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, শামশের আনোয়ার, বেলাল চৌধুরি, যোগব্রত, কাজলদি, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, নিখিলদা

আরও কতজন। এরই মাঝে গম্ভীর মুখে ঢুকে পড়তেন আজন্ম অধ্যাপক নির্মাল্য আচার্য। পিছনের দিকে ছোট্ট একটা টেবিলে গিয়ে বসে পড়তেন। 'এক্ষণ'-এর প্রকাশক-সম্পাদক-পরিবেশক সবকিছুই তিনি। সম্পাদক হিসেবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নামও একসঙ্গেই মুদ্রিত হত। ওঁদের খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল। হ্যারিসন রোড, টেমার লেন, কলেজ রো, বেনিয়াটোলা লেন, নবীন কুণ্ডু লেন— এই রাস্তাগুলোর বলয়ে এঁদের স্বাভাবিক আনাগোনা ছিল। হ্যারিসন রোড-টেমার লেনের মুখে রবিবারের সকালে গগন দত্ত, নির্মাল্য আচার্য, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়দের আড্ডা দিতে দেখতাম আমরা প্রায়ই। তখন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট পরিচিত অভিনেতা। কী সুন্দর দেখতে! কিন্তু বরাবরই সিনেমার পাশাপাশি কবিতা লেখা, আর সাহিত্য-জগতের সঙ্গে আড্ডা সমানতালে চালাতেন। একটা কালো হিন্দুস্থান গাড়ি নিজেই চালিয়ে আসতেন। পাশেই নির্মাল্যদা। কখনও কখনও পাশে ওঁর স্ত্রী দীপাদি। দীপাদিও আসতেন ইন্দ্রদার কাছে অদ্ভুত আবদারে। দীপাদির খুব সুঠাম চেহারা ছিল। ব্যাডমিন্টন না টেনিস কী যেন একটা খেলতেন। তাতে তাঁর নামডাকও ছিল। ইন্দ্রদার কাছে আসতেন চামচ সংগ্রহ করতে। নানা ধরণের চামচ সংগ্রহের বাতিক ছিল তাঁর আর ইন্দ্রদা সবকিছুর জোগানদার। স্বপ্নচারী, হাফগেরস্ত, বাউন্ডুলেদের ইনি মধুসূদন। আমি সকলেরই পরিচিত। বয়সে এঁদের সকলের থেকে ছোট। ছবি আঁকি বলে স্নেহ পেতাম। কিন্তু সকলেই তো সৃষ্টিশীল জগতের বাসিন্দা। কাজেই আমি আশ্চর্যের কেউ ছিলাম না। কিন্তু আমার কৌতূহল হত এঁদের দেখে, এঁরা সকলেই দিনের জীবনটাকে কোনওরকমে কাটিয়ে দিতেন। আসল জীবন শুরু হত সন্ধ্যার পর। উসখুস করতেন কখন সন্ধ্যা নামবে তার জন্য। দুয়েকজন ব্যতিক্রমী ছিলেন যাঁদের আলো-আঁধারি চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে থাকত। আমার সন্ধ্যার কোনও সঙ্গী ছিল না, শেষ বিকেলে এঁদের সঙ্গ ছেড়ে আমি পাড়ি দিতাম কাজের সন্ধানে, কিংবা আমার ছবি আঁকার ঘরে। ইন্দ্রদারা সদলবলে বেরিয়ে যেতেন ধর্মতলায়। কমলকুমার মজুমদার ছিলেন এঁদের পরিচালক, আর ইন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন প্রযোজক, রঙ্গমঞ্চ ছিল খালাসিটোলা। ওঁরা বলতেন কেটি। আমি কোনওদিন ঢুকিনি। এমনকি ধর্মতলার ওই লীলাভূমি খোঁজার চেষ্টা করেও তার দ্বার খুঁজে পাইনি। পথ হাঁটতে বহুদিন পর একদিন কোনও এক বন্ধু দেখায়, একটা খোলা-প্রায়ান্ধকার গুদামঘর। কালো আলকাতরা মাখা বড় টিনের দরজা। তায় অসংখ্য টেবিল বিক্ষিপ্ত ছড়ানো ভেতরে। সে আমায় জানিয়েছিল, এটি কেটি।

কমল মজুমদার দুজনকে খুব ভয় পেতেন। একজন বাটা কোম্পানির ডি কে গুপ্ত, অন্যজন সতীকান্ত গুহ— সাউথ পয়েন্টের প্রতিষ্ঠাতা। একসময় মনে আছে, 'লম্বকর্ণ' পালা মঞ্চস্থ হবে, সাউথ পয়েন্টের একটা প্রশস্ত ঘরে রিহার্সাল চলত। নির্দেশক কমল মজুমদার। ছাত্র রবি ঘোষ, অপর্ণা সেন এইসব কুশীলব। উনি উচ্চারণ শেখাতেন। তালব্য বর্ণ, কণ্ঠ্য বর্ণ কীভাবে উচ্চারণ করলে মানুষের কাছে একশো হাত দূর থেকে উপযুক্তভাবে ধ্বনিত হয়, সেটা দেখাতেন উচ্চারণ করে। আমি জানি না, কোন নাট্যশাস্ত্র শিখে উনি এসব করতেন। আমাদের দেশে যাঁরাই সফল মানুষ বলে চিহ্নিত, বিশেষ করে সৃষ্টিজগতে, তাঁরা যে কেউ শিখে সফল হয়েছেন তা ঠিক নয়। স্বাভাবিক প্রতিভা আর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা তাঁদের অনন্য করেছিল। পরে নয়াদিল্লির নাট্য আকাদেমির নাট্যচর্চা কেন্দ্রে ভোরের অনুশীলন দেখেছি আলকেজির পরিচালনায়। তখন মনে হত এই কণ্ঠচর্চা, এই দেহচর্চা, এই কঠোর অনুশীলন কি শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁরা কারও অধীনে করেছিলেন? অথচ তাঁরা তো চিরকালীন। এটাই স্বাভাবিক প্রতিভা যা তথাকথিত চর্চায় আসে না। কমল মজুমদারও তাই। তিনি যে কী! সাহিত্যকার, না চিত্রকর, না নাট্যকার, না ধার্মিক, না নাস্তিক, শৃঙ্খলাপরায়ণ, সংসারী, না মদ্যপ-আফিমচারী, নাকি স্বেচ্ছাচারী বারেন্দ্র, জানি না!

এটা যে-সময়ের কথা, তখনও মানুষের মনে রাজনীতি সম্পর্কে এত অনীহা ছিল না। কোথায় যেন সমাজ-সংস্কৃতির একটা চরিত্র ছিল। পাড়া-সংস্কৃতি বলে একটা কিছু ছিল। আমি বাবার রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপে থাকলেও যেহেতু নিয়মবহির্ভূত কাজে নিজেকে জড়িয়েছি সেহেতু অন্তরে রক্ষণশীলতা আর বাইরে বাউন্ডুলে হয়ে দিন কাটাতাম। তাই দেখার সুযোগ হয়েছিল অনেক। পাড়ায় বিভিন্ন বয়সের মানুষজনেদের একেকটা দল ছিল। বাবাদের দল, কাকাদের দল, দাদাদের দল, আমার বয়সিদেরও। ছিল মহিলামহলও। পরকীয়া প্রেম চলত, সবাই সব জানত। আড়ালে-আবডালে গুঞ্জন হত। দেবদাসের চরিত্র দেখা যেত। বিজাতীয় প্রেম নিয়ে দরবার বসত। দরবারের মধ্যমণিও তরুণ বয়সে হিরো ছিলেন এই কাজে, এইরকম। আমি যে মহল্লায় বেড়ে উঠেছি সে মহল্লা মূলত গন্ধবণিকপ্রধান।

শক্তিদাকে নিয়ে যাই ওঁর কাছে, গোপীবাবুর সঙ্গে ওঁর চুক্তি হয় মাসে তিনশো টাকার। শ্রেষ্ঠ কবিতার সিরিজ বার করবেন, আর হোর্ডিং ঝুলবে, ব্যানার ঝুলবে এইসব পরিকল্পনা নিয়ে খুব উৎসাহিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শক্তিদা।

কলেজ স্ট্রিটের ওপারটা বউবাজার, মলঙ্গা লেন, কাপালিটলা, তার অলিগলি দিয়ে আরও উত্তরে গেলে সিংহি বাগান, জোড়াসাঁকো, মার্বেল প্যালেস দিয়ে বিশাল এলাকা জুড়ে সুবর্ণবণিকদের বাস। এখানেই লাহাবাড়ি। মাঝখানে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট চিরে গিয়েছে। সেখানে পুরনো কায়স্থদের বাস। চোখে পড়ার মতো হর্ম্যগুলো কায়স্থ আর দু'ধরণের বেনেদের। আমার শৈশব থেকে এইসব বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। প্রথম হিন্দু স্কুলে পড়ার কারণে। পরে সংগঠন করার জন্য। আরও একটা প্রধান কারণ ছিল প্রখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী ইউ এন ধরের বাড়িতে প্রশ্রয় পাওয়ার ফলে। আমি এইসব সংসারের ক্ষয়িষ্ণু চেহারা দেখেছি। ইতিমধ্যে হয়তো অনেক পরিবারের পতনও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই সময় পারিবারিক-সামাজিক সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। সুবর্ণবণিকদের বিনয়, ভদ্র ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করত। অন্যদিকে, গন্ধবণিক পরিবারের বনেদিয়ানা সুবর্ণবণিক সমাজের তুলনায় কম হলেও, ওঁদের ক্লাব-কালচারে একটা অদ্ভুত আগ্রহ ছিল। শোভাবাজার, বেনিয়াটোলা, পটুয়াটোলা এসব জায়গায় যত ক্লাব প্রতিযোগিতা, বারোয়ারি পুজো হত, ততটা অন্য জায়গায় মিলত না। আর কায়স্থরা? এরা সব সময় নাকউঁচু। জমিদারি মনোভাব, মদ্যপানের রেওয়াজ। আর সবাইকে ছোট-জ্ঞান করা এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে হ্যাঁ, হাইকোর্টে আর সমাজের উচ্চস্তরে এঁদের দাপুটে যোগাযোগ আর অদ্ভুত প্রতাপ। এঁদের মধ্যে যেমন হাটখোলার দত্তরা, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের মিত্তিরদের বাড়ি, অন্যদিকে কেশব বসুর বাড়ি। আরেকটা শাখা ছিল, তাঁরা ইংরিজিতে 'ভোস' বলে নিজেদের চিহ্নিত করতেন। আমার বাবা সফল চিকিৎসক হয়ে বাড়ি করেছিলেন কলকাতায়। 'ভোস'দের ভিটে কিনে। শুনেছি সেই ভোসবাড়ির আদিকর্তা ফিটন গাড়ি চেপে ইংরিজি খবরের কাগজ উল্টোভাবে ধরে কেতা দেখিয়ে মজলিশে বেরোতেন। তাঁরই বংশধর আলু ভোসকে দেখেছি। ফর্সা, রোগা হাঁকেডাকে জমিদারি, খণ্ডাহারের মালিক হিসেবে। সেই বংশে হঠাৎ প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল ক্ষণকালের জন্য। নির্মলদা (নির্মল ভোস) সে বাড়ির বংশধর, উজ্জ্বল মেধাবী ছাত্র। কঠোর একাগ্রতা ছিল তাঁর। পরবর্তীকালে সফল অ্যাটর্নি হয়েছিলেন। কলেজ রো'র সেই সরু গলিতে বিখ্যাত ক্রাইসলার গাড়ি ঠিক দশটায় এসে দাঁড়াত। নির্মলদা হাইকোর্টে যেতেন। রোববার সকালে বিখ্যাত লোকেরা আসতেন অ্যাটর্নির দরবারে। উত্তমকুমার, মঞ্জু দে, প্রদীপকুমার আসতেন ক্লায়েন্ট হিসেবে। শুনেছি, 'ছোটি সে মুলাকাত' চলচ্চিত্রের যা-কিছু সমস্যা অ্যাটর্নি নির্মলচন্দ্র ভোসের দরবারে সমাধান হয়েছিল। আমি তখন আর্ট কলেজের ছাত্র। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই একটা পৈশাচিক চিৎকার শুনতে পেতাম স্তব্ধ পাড়ায়। মদ্যপ অ্যাটর্নি চিৎকার করতেন ভোররাত পর্যন্ত। কয়েক বছর পরে মারা গেলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানে, সবে চল্লিশ অতিক্রান্ত করে।

এইসব অলিগলি সমাজ আর জাতের জিনগত চরিত্র আশৈশব কৌতূহল সঞ্চার করত আমার মধ্যে। যে-কোনও মানুষের সঙ্গে আলাপ হলেই পদবি জানতে কৌতূহলী হতাম। সেই থেকে তার মেধা, হৃদয়, মন, বিবেক আর উদ্যমের খানিকটা আভাস পেতাম। এ-এক আমার অন্য রকমের ছবি বোঝার উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হয়তো আমার ছবিজীবনে এলোমেলোভাবে বহু ভাবনা ঢুকে পড়েছিল, যা ঠিক ছবিজীবনের কথা নয়। কিন্তু, জীবনে ছবি গেঁথে যায় বহু ঘটনা থেকে। তারই এক জারণ প্রক্রিয়া থেকে উঠে আসে, গড়ে ওঠে ছবি— আমরা যা বাদ দিতে পারি না। আমার ছবির উপাদান এভাবে উঠে এসেছে। মানুষকে দেখা, ভালোবাসা পাওয়া, দুঃখ পাওয়া কিংবা রাজনৈতিক হানাহানি— অনুপুঙ্খভাবে যা দেখেছি, হৃদয়ঙ্গম করেছি তারই বিক্ষিপ্ত ঘটনার চিত্র।

একদিকে আমার উঞ্ছবৃত্তি, বইয়ের প্রচ্ছদ, অলংকরণ বইপাড়া ঘোরাঘুরি আর অন্যদিকে বিভিন্ন পত্রিকাগোষ্ঠীতে জড়িত সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের সঙ্গে মেলামেশা। এভাবেই আরেকজন খুব ভালোবাসার মানুষ হয়েছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ওঁর অন্যান্য বন্ধুরা ভালো ভালো কাজে ঢুকে পড়েছেন। সুনীলদা আনন্দবাজারের সাব-এডিটরের চাকরিতে যুক্ত। সুনীল-শক্তি এই নাম দুটো তারুণ্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্বেও ঘোরাঘুরি করে। কিন্তু শক্তিদা পাকাপাকিভাবে কোনও সংস্থার সঙ্গে তখনও যুক্ত হননি। এদিকে আমি 'ভারবি'-তে টুকটাক কাজ করি। তার কর্ণধার গোপীমোহন সিংহরায় আমায় খুব ভরসা করতেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত, বাংলা সাহিত্যে তাঁর অগাধ ভালোবাসা। কবি জগদীশ ভট্টাচার্যের খুব কাছের ছাত্র। ইনি 'নাভানা' থেকে সরে এসে 'ভারবি' করেন। সিগনেটের পর নাভানা প্রকাশনা জগতে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। গোপীবাবু খুব অল্প সময়ের মধ্যে 'ভারবি'-কে একটা বড় প্রতিষ্ঠান করে ফেললেন। কে ছিল না তাঁর প্রকাশনা তালিকায়! কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তিনি বর্ধমানের চাল ব্যবসায়ী। সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি কৃপণতা ছিল তাঁর চরিত্রে। একদিকে নরম-বিনয়ী, অন্যদিকে ক্রুর ও রাগী। বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বিখ্যাত দে বাড়ির অংশেই তিনি জীবন-জীবিকার আস্তানা গড়ে ছিলেন। সে সময় উনি খুঁজছিলেন এমন কাউকে যিনি প্রকাশনা দেখাশোনা করবেন একেবারে নতুন কিছু ভাবনা দিয়ে। আমার মনে আসে শক্তিদার কথা। সে মতো শক্তিদাকে নিয়ে যাই ওঁর কাছে, গোপীবাবুর সঙ্গে ওঁর চুক্তি হয় মাসে তিনশো টাকার। শ্রেষ্ঠ কবিতার সিরিজ বার করবেন, আর হোর্ডিং ঝুলবে, ব্যানার ঝুলবে এইসব পরিকল্পনা নিয়ে খুব উৎসাহিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শক্তিদা। হলও তাই। আমি একে একে প্রচ্ছদ আঁকি আর প্রায় মাসে-মাসেই বেরোয় শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থমালা। প্রথম গ্রন্থটি ছিল অরুণ মিত্রের। প্রচ্ছদ এঁকেছিলাম তার। কালো শীলাখণ্ড চিরে ফুটে থাকা এক শুভ্র দ্যুতির স্বর্গীয় ফুল, নীলিমায় মিলে যেতে চায়। সেই শক্তিদার সঙ্গে পরে যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশ করেছিলাম কবি আর চিত্রকরের যৌথ উপস্থাপনায় 'নীলিমা ও নৈরাজ্য'। ভাবলে অবাক লাগে কতবার যেতে হয়েছিল শক্তিদাকে তাড়া দিতে। কবিতা বাছাইয়ের কাজ। ওঁর ঠিকানা বদল হত প্রায়ই। তারপর অযাচিত মানুষের আনাগোনায় মীনাক্ষী বউদি এতই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে শক্তিদার বাড়িতে কড়া নাড়তে তাই দ্বিধা হত। কত অবস্থায়, কত ঘটনায় ওঁকে দেখেছি! আমাদের বাড়িতে আসতেন বাবার সঙ্গে গল্পগুজব করে গ্যারেজের ওপরে আমার ছোট্ট ঘরে বসতেন। কখনও কখনও একসঙ্গেই বেরিয়ে যেতাম আনন্দবাজারে। তার কিছু পরে পাকাপাকিভাবে আনন্দবাজারের সঙ্গে যুক্ত হলেন। উনি আমায় বলেছিলেন প্রদোষবাবু

সম্পর্কে। ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত যে কবিতা লিখতেন তা আমার জানা ছিল না। সেই বই 'নীলিমা ও নৈরাজ্য'-র ভূমিকা লেখাতে গিয়েছিলাম দিল্লির জংপুরায়। তিনি লিখে দিয়েছিলেন ভূমিকা। বইটি প্রকাশ পেয়েছিল বাংলা ও ইংরিজিতে। ইংরিজিতে নামকরণ হয়েছিল 'Anarchy and the Blue' নামকরণ করেছিলেন আয়ান রশিদ খান। এই শক্তিদাই পরে কবিতা উৎসবের আয়োজন করেন। রাজভবনে তার সূচনা হয়েছিল। শক্তিদার কবিতা ছাড়াও নানান বিষয়ে কৌতূহল ছিল, কিন্তু ঠিক সংসারী ছিলেন না। তাই কেউ পিছনে না থাকলে তাঁর কোনও কাজই বাস্তব হত না। মীনাক্ষি বউদিই শক্তিদাকে সংসারে টেনে রেখেছিলেন শেষপর্যন্ত।

এরকম বহু মানুষের সঙ্গে অদ্ভুত যোগাযোগ হয়েছিল আমার। যেমন বটুকদা, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। একেবারে গোড়ায় যখন দিল্লিতে প্রদর্শনী করতে যেতাম বটুকদা এসে বসতেন দুপুরবেলায় আমার প্রদর্শনীর ঘরে। তখন উনি দিল্লিতে রামলীলা নিয়ে ব্যস্ত। কত গল্প, মজার মজার কথা হত আমার সঙ্গে তাঁর। অনেকদিন পরে একদিন আনন্দবাজারের কাজ সেরে অন্নদা মুন্সিকে সঙ্গে নিয়ে এসপ্ল্যানেডের ট্রাম গুমটির কাছে ঘোরাঘুরি করছি। দুজনে একই রুটের ট্রাম ধরব। অন্নদা মুন্সি যাবেন পাইকপাড়া আর আমি নেমে যাব কলেজ স্ট্রিটে, এমন সময় পিছন দিকে মাথায় একটা চাঁটা পড়ল। ঘুরে দেখি বটুকদা।

অন্নদা মুন্সিকে বটুকদা চিনতেন না। পরিচয়ের আগেই উনি উত্তেজিত হয়ে সদ্য বার্লিন ঘোরার অভিজ্ঞতা দুমদাম বলতে শুরু করলেন। ফাঁকে আমি পরিচয় করিয়ে বললাম ইনি অন্নদা মুন্সি। হঠাৎ বটুকদা নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। পিছিয়ে গেলেন কিছুটা। ক্ষণকালের নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ সজোরে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। পঞ্চাশ-ষাট বছরের স্মৃতিতে ফিরে গিয়ে বলতে লাগলেন উদোম গায়ে রাজবাড়ির চারপাশে খেলাধুলোর কথা। পাবনার গ্রামে। তারপর থেকে কতদিন চলে গিয়েছে। নাম শুনেছেন উভয়ে উভয়ের, কিন্তু দেখা হয়নি! অন্নদা মুন্সি বয়সে বটুকদার থেকে এক বছরের বড়। বটুকদাকে বলতে হয় অন্নদাদা। রফা হল দাদার একটা দা বাদ পড়বে। অন্নদা বটুকদার অন্নদা রয়েই গেলেন। ভিড় ঠেলে দুজনকে নিয়ে এলাম কলেজ স্ট্রিটে, আমার স্টুডিওয়। চটজলদি মুখ এঁকে রোজগার করে কিনেছি গ্রামোফোন। বিঠোফেনের সিম্ফনি ছিল। বাজিয়ে দিলাম। আর পাড়ার বিখ্যাত মিষ্টির দোকান থেকে দই সন্দেশ নিয়ে এলাম। রসে-সুরে সময় কেটে গেল। অন্নদা মুন্সি চলে গেলে, বটুকদা রইলেন আরও কিছুক্ষণ। একটা কবিতা লিখে ফেললেন তখনই। স্টুডিওতে তার আবেশ, অনুভূতি নিয়ে সে কবিতা। আমায় তা উপহার দিয়ে চলে গেলেন।

শ্রীমান শুভাপ্রসন্নকে

এতো রং আর তুলি আছে,
এতো অসংখ্য যোনিপথ,
সৃষ্টির ঔরসে সব লিপ্ত একাকার!
ক্লেদের ক্লান্ত রং একগুচ্ছ পলাশ, পাহাড়,
শ্রমের রক্তিম আভা বস্তির আকাশ,
অবিন্যস্ত সত্যের পথে ট্রামে ফুটপাথ
ভাঙা বাড়ি— বিবর্ণ দেয়ালে ঝোলে
অজস্র ক্যানভাসে মূর্ত শিল্পের মজ্জায়।
অথচ এ পথ, যাত্রামন্দাকিনী পথ,
অভিযানে স্রোতে স্রোতে শুদ্ধ হয়
অন্নময়কোষ থেকে উত্তীর্ণ সে সেতু-সামে,
জীবনবেদের সদা উচ্চারিত গানে,
শুদ্ধ অনুষ্টুপে।
এবং সহজ তবু অত্যন্ত সহজ এই প্রাপঙ্কিক
মরে যাওয়া, বেঁচে ওঠা, দাঙ্গা বা বিক্ষোভে
হিংস্র আততায়ী লোভ-যুদ্ধ বিপ্লব ইত্যাদি—
গোইয়া বা পিকাসোর গ্যের্নিকা— দিকে দিকে
আকীর্ণ ধূসর-রং— তার ওপারেই সূর্য
বর্ণ ঢালে পাহাড়ে পলাশে—
প্রাগৈতিহাসিক সত্তার কত বিচিত্র আভাসে!
এ সবই বিচিত্র রং-স্বরলিপি যেন—
বর্ণে বর্ণে মৃত্তিকার মনের অঙ্গনে
চিরকালের আকাশটা আঁকে— সুরে বর্ণে
অরণ্যের ফুল রং পাখী আর মানুষের গানে—
অগণ্য ও অসীম সিমফনি।।

নিত্য শুভানুধ্যায়ী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

তারপর একদিন রবিবারের সকালে এসেছিলেন, রাস্তা থেকে হাঁক পেড়েছিলেন 'শুভায়ু ভবতু'। আমি নেমে এলাম। বললেন, বাড়িকে ম্যানেজ করে বেরিয়ে আয়। একটা মতলব করেছি, আমরা সারাদিন হেঁটে শ্যামবাজারের কষা মাংস, আর পরোটা খেয়ে অন্নদার বাড়ি যাব। ঢিল ছুড়ে একটা কবিতা পাঠিয়ে দেব। এইসব... এইসব...। তো বেরিয়ে পড়লাম। কলেজ স্ট্রিটের বাজার, কোলাহল কাটিয়ে নানান গল্প, হাসি, লুটোপুটি খেতে খেতে অসম বয়সের দুই বন্ধু পৌঁছে গেলাম শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে। মোড়ের ফুটপাতের গায়ে কষা মাংস, আর পরোটার দোকান। অর্ডার দেওয়া হল, খেয়ে নিলাম তৃপ্তি করে। বেরিয়ে ফুটপাথে আমওয়ালা। আম খাবার ইচ্ছে হল। টিউবওয়েলের জলে ধুয়ে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে রাস্তায় আম খেতে লাগলাম দুজনেই। গালে, গায়ে কীভাবে রস লেগে একাকার, কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার টিউবওয়েল টিপে হাত ধুয়ে এগোতে লাগলাম আর জি করের দিকে পাইকপাড়ার উদ্দেশে। রাস্তা থেকে একটা ছোট্ট পাথর তুলে নিয়ে একটা ছোট চিরকুট লিখে বটুকদা পাথরটিকে মুড়ে ঢিল তৈরি করে পকেটে পুরে নিয়েছেন ততক্ষণ। এমন সময় উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসা নির্মাল্যদার মুখোমুখি হই আমরা। গম্ভীর প্রকৃতির নির্মাল্যদাকে দেখে সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। কিছু গুরুগম্ভীর আলোচনা হয়। বটুকদা যেন ধরা পড়ে গিয়েছেন। আমরা উল্টোমুখের ট্রাম ধরি। আমাদের সুর ভেঙে যায়। বটুকদা তখন অন্য সুরে নির্মাল্যদার সঙ্গে। কলেজ স্ট্রিট আসে, আমি নেমে পড়ি। ওঁরা তার পরের স্টপেজে। কফি হাউস।

এরকম কত বিচিত্র ঘটনা কত বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে যে এসেছি, তা ভাবলে বিস্ময় লাগে। এক চিত্রশিল্পীর ছবি দেখা, এক সাহিত্যকারের বইপড়া, এক গায়কের গান শোনা, আর এই সৃষ্টিশীল মানুষদের সঙ্গ পাওয়া— এ এক অন্য বিচিত্র স্বাদ।

এরকম আরেকজন মানুষের কথা। যিনি আমৃত্যু 'আমার ছবিজীবন'-এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন, আর উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি অহিভূষণ মালিক। আদতে কলকাতার বনেদি বসুমল্লিক পরিবারের হলেও ওঁর গোড়ার জীবন কেটেছে প্রবাসে। গৌরদা, বিমলদা, নীরেনদা এঁরা ছিলেন তাঁর হরিহর আত্মা। একসময় বোহেমিয়ান জীবন কাটিয়েছেন। ঠিক সময়টা জানি না, অহিদা নাকি গ্যালিস-করা প্যান্ট-শার্টে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সেকালের 'সত্যযুগ'-এর কর্ণধার প্রতাপ রায়ের সঙ্গে অদ্ভুত ঝাল-টক-মিষ্টি সম্পর্ক ছিল, অন্যদিকে প্রতাপদার খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন এঁরা, অহিদার সূত্রেই প্রতাপদার সঙ্গে আমার আলাপ। সে এক অন্য কাহিনি।

অলংকরণ: লেখক

(ক্রমশ)

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের ৩৫৬নং স্টলে

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

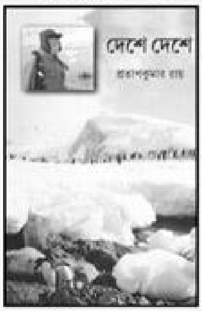

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

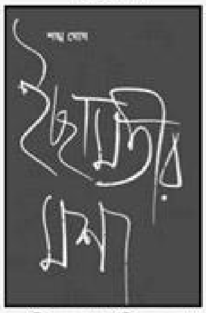

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।
₹১৫০

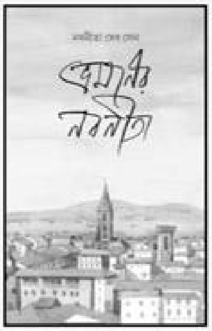

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

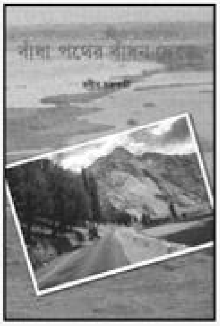

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

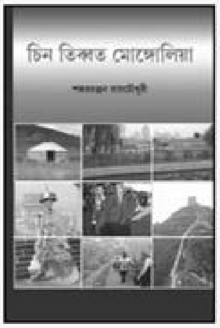

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগঅন করুন

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

দেবেশ রায়ের দাওয়াত

মৈত্রী রায় মৌলিক-এর তিনটি গল্প পড়ালাম।

ক-জনকে পড়ালাম, জানি না। কিন্তু কিছু পাঠক যে পড়েছেন তার আন্দাজ পেয়েছি। বাঙালি পাঠকের জাড্য কাটা সহজ কাজ নয়। তার ওপর আছে রিস্ক-ফ্যাক্টর, যার বাংলা ঝুঁকি-নেওয়ার-সাহসের অভাব। কী বলতে কী বলব, তার চাইতে চেপে যাও।

সিরাজ-কে শেষ দেখা দেখতে গিয়েছিলাম। মৃত্যুও তাঁর স্বর্ণকান্তিকে ময়লা করতে পারেনি। মনে হল, চিরকাল এই অসুখবিলাসীকে যেমন বলেছি, তেমনই যদি বলি, 'এ-ই সিরাজ, উঠুন তো', তাহলেই চোখ খুলে সলাজ হাসি হাসবেন— ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে। কোনও মৃত্যুরই কোনও সান্ত্বনা নেই।

সেখানে আরও অনেকের সঙ্গে দেখা হল। শুনলাম— 'কালের কষ্টিপাথর' খুব একটা পাওয়া যায় না, স্টলে কিংবা হকারের কাছে। সে তো অমরেন্দ্র-র ব্যাপার। উনি সাধারণত মরণশীল কাগজ বের করেন না। আমি অবিশ্যি, কাগজই হোক আর বইই হোক, আমি যাতে পাই সে-দায় প্রকাশক বা ভেন্ডারের ঘাড়ে চাপানোর বদভ্যাসে ভুগি না। আমার যদি কোনও কাগজ বা বই দরকার হয়, সে তো আমাকেই জোগাড় করতে হবে।

মৈত্রী রায় মৌলিক-কে আমি চিনিও না, জানিও না। একদিন বেশ সকালে, বেলা নটা-দশটা হবে, আমরা তখন নাস্তা করছি, আমার চারতলার ফ্ল্যাটে সোজা উঠে এসেছেন। আমিই দরজা খুলে দেখি— হাঁফাচ্ছেন, সারাটা মুখ ঘাম-চকচক করছে, চোখে অনিশ্চয়তা। চারতলায় ওঠার শ্রম অনেকের সয় না। আমি তাড়াতাড়ি পাখা ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'বসুন তো!' উনি বিহ্বল তাকালেন, কিছু একটা বলতে গেলেন। আমি বললাম, 'জিরিয়ে নিন, তারপর...।' একটু নিরিবিলি দিতে আড়ালে গেলাম।

আমার নাস্তা তখন ফেনাভাত— এক বাটি। একটু সোনামুগের ছিট সহ। ঠান্ডা হয়ে গেলে খাওয়া যায় না। আমার স্ত্রী-র সঙ্গে আমার কথাকলির মুদ্রা বিনিময় হল। উনি বুঝলেন, তখন খাব না। কিন্তু উদ্বিগ্ন হলেন— কারণ সকালের অনাহার ডাক্তারের নিষেধ। কিন্তু ডাক্তার আমার অসুখ সারাতে পারে, স্বভাব সারাবে কী করে?

বৌঠান গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে খোশগল্প শুরু করলেন।

এ-সব আমাদের বাড়ির বনেদি কোরিয়োগ্রাফি।

কিছুটা সময় পার হলে কাকলি দুটো আলাদা বাটিতে নাস্তা সাজিয়ে মেয়েটিকে ডাকে, 'এসো, এখানে বসে কথা বলো।'

আর তার সামনে ফেনাভাতের বাটি দেখে মেয়েটি বলল না, 'না, না, আমি খেয়ে এসেছি—।' বরং বলল, 'এটা কি আমার?'

'তাই তো মনে হয়। যারই হোক। ভালো লাগলে খেয়ে নিন-না।'

ততক্ষণে মেয়েটি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

সে গল্প লেখে, আমাকে পড়তে দিতে চায়।

'দিন'।

সে তার ঝোলা থেকে প্রায় পঁচিশ পাতার একটা টাইপ-করা বান্ডিল বের করল নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে।

আমি প্রায় হয়তো সমতুল্য সংকোচহীনতায় নিয়ে বললাম, 'পেছনে নাম-ঠিকানা ফোন নাম্বার লেখা আছে? একটু সময় লাগবে।'

বলল লেখা আছে।

যথাসময়ে পড়ে আমার চক্ষু চড়কগাছ। মোঙ্গলজনজাতিকে নিয়ে লেখা। চেঙ্গিস খাঁদের ব্যাপার-স্যাপার। একই সঙ্গে তথ্যের ভার আর রোম্যান্সের মেদহীন নির্ভার। দারুণ লেখা। বইটি এখনও বেরয়নি, আমার চেষ্টা সত্ত্বেও।

ভালো লেখার সামনে আমার দুর্বলতার কোনও শেষ নেই।

তারপর থেকে মৈত্রী অনবরত লিখছে। এদিক-ওদিক একটা-দুটো ছাপা হয়েছে কী হয়নি। ওর সে-নিয়ে খুবই দুঃখ কিন্তু সে-দুঃখে সে লেখা থামায়নি, বরং আরও বেশি লেখে। ওর লেখার বা গল্পের পৌঁছটা এত আত্মবিশ্বাসী যে আমার মতো ঘোরেলও অবাক হই। এই লোকাল ট্রেন তো সেই পুরুলিয়া তো সে-ই আবাদের গ্রাম তো এই মফস্বলি টাউন। তার গল্পের জায়গা এতই নিখুঁত যেন মনে হয় গল্পটা সেই জায়গাটা ছাড়া ঘটতেই পারে না। অবাক হলেও কোনও গল্পকারকে জিজ্ঞাসা করতে নেই, 'এত জানলেন কী করে?' আমি কখনওই মৈত্রীর চেঙ্গিস খাঁকে ভুলিনি। তাই ওর গল্পে আমার মুগ্ধতা বাড়তেই থাকে। ছোটগল্পে কথাবার্তার ভাষাটা খুব দরকারি। আর বিপদের। প্রবোধকুমার সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, এঁদের ডায়ালগের এত সুখ্যাতি ছিল যে সেই ডায়ালগে গল্প কুপোকাত হত।

গল্পলেখার সেই পরম দক্ষতা মৈত্রী-র আঙুলে স্বাভাবিক। আর, নির্ভুল ওর জায়গাচেনার ক্ষমতা। কোথায় যে গল্পটা সেই জায়গাটা চিনে ফেলার ক্ষমতা। পেশায় ভূতাত্ত্বিক। একটু-আধটু ঘোরা আছে পৃথিবী। স্বামী, কম্পিউটার বিশারদ। উনিই ওঁর গল্পগুলি টাইপ করে দেন।

এগুলোও একজন লেখকের অপ্রাসঙ্গিক পরিচয়।

এই সংখ্যায় আমার অতিথি বাংলাদেশের পারভেজ হোসেন। তাঁর দুটো গল্প নিয়ে। 'ডুবো চর' ও 'কড়ির বাজার'।

পারভেজ হোসেন

ডুবো চর

কদিন ধরে বলছিল আকবর, লালন সাঁইয়ের দরগায় পূর্ণিমার উৎসবে দুই বাংলা ছেঁকে ফকিররা এসে রাতভর গানবাজনায় মেতে থাকে। হাজার হাজার সাঁইজিভক্তের সেই অতুলনীয় আসরে একটা রাত কাটিয়ে আসবে। জ্যোৎস্নাও রাজি হয়ে গেল যেতে।

খুব ভোরের বাস আধঘণ্টা পরপর মাত্র কয়েকখানা। আবার দুপুর দুটোয়। ফেরিতে যদি দেরি না হয় ওরা সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যেতে পারবে ছেঁউরিয়ায়। দুপুরের গাড়িতে গেলে রাত কটা বাজবে কেউ বলতে পারে না। কুষ্টিয়ার ছেঁউরিয়া খুব দূরের পথ নয় কিন্তু ওদিকটায় যাতায়াত এখনও খুব একটা মজবুত হয়নি। লোকালে চড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কী।

আকবর আলি জ্যোৎস্নাকে যতটুকু জানে ছেঁউরিয়া যাওয়ার ওটুকু ঝক্কি সামলে নিতে পারবে বলে এ নিয়ে আর তেমন ভাবে না সে। কিন্তু হোটেলের বুকিং তো হয়েছে ফোনে।

ওখানে পরিচয় দিয়ে রেজিস্টার খাতায় কী লিখবে সে নিয়ে জ্যোৎস্নাকে কিছু বলাও হয়নি। মফসসলের হোটেল, তাছাড়াও শহরে চেনা-জানা তো কেউ নেই যার নাম-ঠিকানা বলবে। আর থাকেই যদিবা একটা মেয়েকে নিয়ে এক হোটেলে...। আকবর আলির মাথায় কিছু আসছে না। বুদ্ধিতে কিছু আঁটাতে না পেরে শেষে ইনিয়েবিনিয়ে একটা লম্বা ভূমিকা দিয়ে তবে জ্যোৎস্নাকে কথাটা বলতেই হয় আকবরের।

ফেরিতে উঠে সব শুনে জ্যোৎস্না একেবারে চুপ। আকবরও ওর কোনও উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বালু আর পলি-কাদার ঘোলা জলরাশির বিস্তীর্ণ শক্তিহীন স্রোতে চেয়ে থাকে। জ্যোৎস্না তখনও নিশ্চুপ। ওর মুখ দেখে কিছু আন্দাজ করা বেশ শক্ত ঠেকল আকবরের।

ফেরি মাঝনদীতে চলে এসেছে প্রায়। ডেকে, দোতলা-তিনতলায় যাত্রী, ড্রাইভার, ফেরিওয়ালার ওঠানামা ঠেলা-ধাক্কা গুঁতোগুঁতির বিরাম নেই। চায়ের দোকানে বেশ ভিড়। হুহু বাতাস উড়িয়ে নিতে চাচ্ছে সব। জাহাজের একেবারে পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বলে হুহু বাতাসে টয়লেটগুলোর বিশ্রী কড়া গন্ধ এড়াবার উপায় নেই ওদের।

প্রপেলারের পাখায় প্যাঁচানো জলের ভয়ঙ্কর উল্লাস আর প্রবল ঘূর্ণীর দিকে তাকিয়ে বুক কেঁপে ওঠে আকবরের। কিন্তু জ্যোৎস্না পটুয়াখালির মেয়ে, অন্তত শৈশব তো তার পটুয়াখালির খালেবিলে কেটেছে। রেলিংয়ে কোমর ঠেকিয়ে নিস্পলক তাকিয়ে আছে সে ওই দীর্ঘ জলরোলে। কোনা ধরে রাখায় মুক্ত বাতাসে পতপত করে উড়তে না পেরে জ্যোৎস্নার শাড়ির আঁচল পালের পেটের মতো ফুলে আছে।

চলো চা নিয়ে সামনের দিকটায় গিয়ে দাঁড়াই- ওর হাত ধরে মৃদু টান দেয় আকবর, কী বিশ্রী গন্ধ এদিকটায়।

আর একটু থাকি না। ওই যে, ওইদিকটায় দেখেন, নদীর একদম মাঝখানটায়, কত বড় চর দেখছেন! ভরা জোয়ারে ওগুলা কিন্তু দেখা যায় না। একটা দীর্ঘ হাহাকার নিয়ে ওই চরের শূন্য বালুর ভূমিতে তাকিয়ে মনটা খলখল করে ওঠে জ্যোৎস্নার।

এখন ভরা ভাটা। জাহাজটা দেখেশুনে বেশ ধীরে চলছে। একটু পরে ওই চরের কোল ঘেঁষে এগোবে তারা। আকবর আবারও তাড়া দেয় কিন্তু জ্যোৎস্না এখন নড়তে চাইছে না। বরং ওর দিকে কিছুটা সরে গিয়ে বলে, এই হইল পদ্মা আকবর ভাই, যার নাকি কূলকিনারা নাই। অকূল দরিয়া দেখলেন তো?

বিষয়টায় আকবরের মন আছে কী নেই বোঝা যায় না, তবে সে উৎসাহ নিয়ে দূরদিগন্তে

> নদী খুঁইড়ে হইবেটা কী বলি? ও তো চোক্ষে বালি দেওয়া ভাই। গাঙ্গে স্রোত বইবিনানি? উজানে তো ইন্ডিয়া বান দিছেই, কারণে অকারণে রোড, কালভার্ট, সেতু দি' পুরা দেশটারে ছাইয়ে ফেলার সময় হুঁশ আছেলেনানি?

দৃষ্টি ফেলে কূলকিনারা খোঁজার চেষ্টা করে। বলে, মেয়েদেরও কিন্তু কোনও কূলকিনারা নাই, জানো তো?

খুঁইজা দেখেছেন? খালি গাঙ বাইলেই তার খোঁজ মেলে না আকবর ভাই। জ্যোৎস্নার চোখের পাতা নড়ে না। ভেজা দৃষ্টি নিয়ে আকবরকে নিরীক্ষণ করে আর মিটিমিটি হাসে ও। বলে, ব্যাটাছেলের এই এক আজব স্বভাব...।

শাড়ির আঁচলটা হাতছাড়া হয়ে নিশানের মতো তুমুল বেগে উড়ে উড়ে শূন্যে ঝাঁপ দিতে চাইছে। আকবর হাওয়া থেকে আঁচলটা ধরে এনে মুঠোয় গুঁজে দেয় জ্যোৎস্নার। দূরে ঘন কাশবন আর বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির ওপারটা ঝাপসা হয়ে নজরে পড়ে। জেগে ওঠা চরের এধারে ওধারে জলস্রোতে বাঁশ পুঁতে ধীবরদের মাছ ধরার ফাঁদ। সেখানে নেংটি-পরা কালো কালো মানুষগুলো দীর্ঘ জাল নিয়ে জলের সঙ্গে জোড়াজুড়ি করছে। একঝাঁক টিয়েপাখি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলে হাতের তালুতে রোদ ঠেকিয়ে আকাশের দিকে তাকায় আকবর।

আপনি টিয়া ভালোবাসেন? জিজ্ঞেস করে জ্যোৎস্নাও ওভাবে তাকায়, টিয়াপাখির রং কিন্তু দারুণ, অদ্ভুত লাল আর কী ধারালো ঠোঁট! তোমার ঠোঁটের মতো জ্যোৎস্না, কথা দিয়ে কুঁচি কুঁচি করে কী সুন্দর কাটতে পারো তুমি, বলেই কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে একটু হালকা হতে চায় আকবর।

হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে জাহাজটা থেমে গেলে কী একটা গোলমাল কানে আসে তার। লোকজন ছোটাছুটি করছে আর একদল রেলিংয়ের চারধারে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে কিছু একটা খুঁজছে যেন।

ইঞ্জিন চালু করে সর্বশক্তি দিয়েও আর নড়তে পারল না জাহাজটা। গোটাদশেক বাস, মালবোঝাই ট্রাক, ছোট-বড় প্রাইভেট, গাদাগাদা মানুষ নিয়ে বিশাল দানবটি জলরাশির নীচের চোরা চরে খামি এঁটে থাকল। জোয়ার না আসা পর্যন্ত এ আর ভাসবে না।

সূর্য একেবারে আকাশের মাঝখানটায় টাটাচ্ছে। এই ডুবো চরের ভয়েই শুকনো মৌসুমে ফেরিগুলো বেঢপ শরীর নিয়ে অনেক দূর ঘুরে তবে পদ্মা পার হয়। ড্রেজারগুলো রাতদিন অনবরত জমাটবাঁধা পলির ঢিপি কেটে চলছে। কিন্তু বিস্তৃত জলের তলায় তারা কী কাটছে সে হিসেব কে রাখে? ইতিমধ্যে এই নিয়ে ঘোর তর্ক জুড়ে দিয়েছে কেউ কেউ। সে তর্ক ভারত বাংলাদেশের পানিবণ্টন, আন্তর্জাতিক পানিচুক্তি, ট্রানজিট, ট্রান্সশিপমেন্ট, করিডোর হয়ে দু-তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একজন তো বেশ জোর গলায় চেঁচাচ্ছে, নদী খুঁইড়ে হইবেটা কী বলি? ও তো চোক্ষে বালি দেওয়া ভাই। গাঙ্গে স্রোত বইবিনানি? উজানে তো ইন্ডিয়া বান দিছেই, কারণে অকারণে রোড, কালভার্ট, সেতু দি' পুরা দেশটারে ছাইয়ে ফেলার সময় হুঁশ আছেলেনানি? খাল-বিলের দ্যাশে পানির পথ বাদ দি' এই উন্নেওন কার স্বার্থে করছে দেহি?

আর একজন তরুণ, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে হয়তো, খুব শান্তভাবে বোঝাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কী বলতে চান আপনি, উন্নতির চাকা কী পিছনের দিকে ঘোরে ভাই? জাতির ভালোমন্দে দেখি কোনও বিশ্বাসই নাই আপনার! দেশে রোড-ঘাট হবে না, নাকি? যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটা আধুনিকায়ন ঘটতে যাচ্ছে দেশে, এই আপনাদের মতো লোকদের জন্যই কিচ্ছু হবে না দেশটার...।

দূরের দিকে চেয়ে জ্যোৎস্না ওদের কথায় কান পেতে থাকে। জোয়ার আসতে ঘণ্টাতিনেক বাকি। সে হিসেবে ওপারে যেতেই আরও সাড়ে ৩ ঘণ্টা। ন-টা, দশ-টার আগে ছেঁউড়িয়ায় পৌঁছনো যাবে বলে মনে হয় না। আকবর খোঁজখবর নিয়ে জ্যোৎস্নাকে আশ্বস্ত করে।

চায়ের দোকানে তর্কটা ঝিমিয়ে এসেছে এখন। দুপুরের খাবার সেরে নিতে এক-এক করে ক্রেতারা ভাতের দোকানে জড়ো হচ্ছে। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে শাড়ির আঁচল দিয়ে নাকের নীচে জমে ওঠা ঘামবিন্দু শুষে নিতে নিতে একটু গম্ভীর হয় জ্যোৎস্না, শুনলেন আকবর ভাই, লোকটা গুছিয়ে কইতে পারল না ঠিক, ওর কথাগুলা কিন্তু ভাববার মতো। প্রকৃতিরে কেমন রাইভাল বানাইছি কন, না হইলে মাঝপদ্মায় জাহাজ আটকায়া যায়! নাহ, মুডটাই নষ্ট, ধ্যাত...।

কিন্তু আকবরের মাথায় এসব তেমন করে

ঢুকছে না। জ্যোৎস্নাকে বুঝতে দিতে না চাইলেও এত রাত করে অপরিচিত শহরের একটা হোটেলে কোনও বিড়ম্বনা খাড়া হয় তা ভেবে কিছুটা আনমনা সে, শেষমেশ তারও মুডটা না মাটি হয়ে যায়।

প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত দূর দিয়ে আরেকটা ফেরি এগিয়ে যাচ্ছে। ওটার যাত্রীরা এটার বেহাল অবস্থা দেখে একটা তামাশা নিয়ে হইহই করতে থাকে। এই বিড়ম্বনা আর বিপদের কালে এটার যাত্রীদেরও অনেককে সেই তামাশায় অংশ নিতে দেখে বিরক্ত হয় আকবর। বলে, দেখছ, বোকাচোদা পাবলিকের কাণ্ডটা দেখছ!

মুখ খারাপ করেন কেন আকবর ভাই? বিশ্রী লাগে শুনতে।

সরি, বলে ওর হাত চেপে ধরে আকবর, চলো আমরাও খেয়ে নেই।

গোগ্রাসে গিলে গাওগেরামের যাত্রীরা মাছের কাঁটা, মুরগির হাড্ডি, ছিটকে পড়া ডাল দিয়ে এমন নোংরা বানাচ্ছে টেবিলগুলো, মাছি ভনভন করছে। ছেলেরা মুছেটুছেও তেমন জুত করতে পারছে না। এক ধরণের ঘিনঘিনানি সহ জ্যোৎস্নাকে নিয়ে ওর মধ্যে বসে পড়ে আকবর।

তাতানো রোদ থাকলেও গরমটা তেমন নয় তবুও ইলিশ ভাজা আর মুরগির ঝাল-ঝোলে নেয়ে উঠেছে ওরা। শুধু দরদর করে ঘামছেই না আকবর, রীতিমতো হাঁসফাঁসাচ্ছে। ফেরির খাওয়া এমনই, এদের রান্নায় কী একটা মাজেজা আছে, একবার খেলে আর ভোলো যায় না, খেতে খেতে ভাবে আকবর আলি। ক্যানটিনের ছেলেটা কাঁচা মরিচের পিরিচ এগিয়ে দিয়ে আরেক পেয়ালা গরম ডাল ঢেলে দিয়ে যায়। জ্যোৎস্না ভাজা পেঁয়াজ আর নিজের ভাগ থেকে ইলিশ টুকরোর আধখানা আকবরকে তুলে দিয়ে বলল, মুরগির ঝোলটা আর নিয়েন না আকবর ভাই, যে হাল হয়েছে আপনার।

আরে দিচ্ছো কেনো, খাও খাও, পদ্মায় বসে পদ্মার ইলিশ, বাড়িতে পাবে?

জ্যোৎস্নার বিশ্বাস হতে চায় না যে এটা এই নদীর মাছ, একটা লম্বা কাঁটা দুই ঠোঁটের মাঝ থেকে টেনে বার করে বলে, এমনও তো হতে পারে এইটা পটুয়াখালির ইলিশ। তাছাড়া পদ্মার হইলেই কী? ইলিশের স্বাদ-গন্ধ পাচ্ছেন কিছু?

রাজধানীর ছেলে আকবরের পটুয়াখালি-পদ্মার জ্ঞান নেই তবে এটা সে বুঝতে পারে ঠিক, মাছের মজা যেন মিইয়ে যাচ্ছে আজকাল। একালের মেয়েগুলোর মতো, শুয়ে বসে ঘুরে আড্ডা দিয়ে কিছুতেই আর জুত লাগে না তেমন। মেয়ে হোক, মাছ কী নদী তার কাছে সবটাই পলুটেড।

গড়ানো বেলার আধখানা রোদে ক্যানটিনটা খাঁ খাঁ করছে। জোয়ারের দেখা মিললেও মাটির থাবা থেকে জাহাজখানা ভেসে ওঠার মতো জল এসে গাঙে জমেনি এখনও। চোখের সামনে দিয়ে কয়েকটা ফেরি এল গেল। পালতোলা বড় বড় নৌকাগুলোও নিশ্চিন্তে চলে যাচ্ছে। কিন্তু দিগচিহ্নহীন মধ্যগাঙে এভাবে আটকে থেকে ভরা বাতাসের মধ্যেও কেমন দমবন্ধ লাগে আকবরের। তার ওপর সেদ্ধ ডিম, ঘটিগরম চানাচুর আর বাদামওয়ালার যন্ত্রণায় দুজনে যে নিরিবিলি কিছুক্ষণ কথা বলবে এখানে এখন আর সে উপায় নেই। সময় যতই গড়াচ্ছে এদের উৎপাত বেড়ে যাচ্ছে ততই। একতলা দোতলা ঘুরে ঘুরে তেতলার একেবারে পিছনে ফেলেরাখা কতগুলো খালি ড্রামের পাশে ওপরে ওঠার বন্ধ একটা সিঁড়ির নির্জনে গিয়ে দাঁড়ায় ওরা।

শাড়ির আঁচল কোমরে পেঁচিয়ে ক্লিপ আটকানো খাটো চুলের খোপাটা ছেড়ে দিয়েছে জ্যোৎস্না। সকালের কচি রোদে একফোঁটা শিশির বিন্দুর মতো নাকফুল, লালটিপ, দুল, কমলার কোয়ার মতো টসটসে ঠোঁট বাতাসের ঝাপটায় উদভ্রান্ত চুলের আড়ালে এই লুকায় তো এই বেরিয়ে পড়ে।

চমৎকার হাওয়া বইছে। সন্ধ্যা নেমে আসতে বাকি নেই। শাড়ির আঁচল কোমরে পেঁচিয়ে ক্লিপ আটকানো খাটো চুলের খোপাটা ছেড়ে দিয়েছে জ্যোৎস্না। সকালের কচি রোদে একফোঁটা শিশির বিন্দুর মতো নাকফুল, লালটিপ, দুল, কমলার কোয়ার মতো টসটসে ঠোঁট বাতাসের ঝাপটায় উদভ্রান্ত চুলের আড়ালে এই লুকায় তো এই বেরিয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ছুঁয়ে দিতে লোভ হয় আকবরের। কিন্তু কাকে ছোঁবে সে? জ্যোৎস্না অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে বালুর ধুধু সীমা ছাড়িয়ে দূরদিগন্তের বিস্তৃত জলরাশির অপার প্রবাহে। মন থইথই করছে, চোখ ছলছল করছে ওর। কামারের গনগনে চুলা থেকে তুলে আনা লোহার বলের মতো সূর্যটা ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে জলে। আকাশজুড়ে কাঁচা হলুদের রং ছড়িয়ে দিনের শেষ আলোটুকু আস্তে আস্তে মলিন হয়ে আসছে। নদীর জলে সে আলোর এক অপূর্ব নির্মলতা ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যাওয়ার অনন্য এ দৃশ্য আকবর এর আগে আর দেখেনি বোধহয়। কিছুটা অধীর হয়ে ওঠে সে। দ্বিধায়, জড়তায় সন্ধ্যালগ্ন হয়ে জ্যোৎস্নার কোমরে হাত রেখে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। বুঝে হোক কী না বুঝে পুরুষের এই স্পর্শ আলগোছে সরিয়ে নেয় জ্যোৎস্না। কিন্তু যা অবুঝ কী দিয়ে তাকে বোঝাবে সে! আকবরের আঙুল আবারও ওর পেটের মসৃণতায়, নাভিমূলের কোটরে পিঁপড়ের মতো হেঁটে হেঁটে কোমরের ভাঁজে চেপে স্থির হয়।

এতটা নৈকট্যের কারণে বাতাসের অস্থিরতায় বিলি কেটে ছড়িয়ে পড়া একটা গন্ধ মগজে ঘাই মারে আকবরের। জ্যোৎস্নার এলোমেলো চুল থেকে, শরীরের সবটুকু সুষমা নিংড়ে আসছে গন্ধটা। ফরফর করে উড়তে থাকা চুল শুঁকে শুঁকে ওর চাঁদিতে নাক ঘষে আকবর।

কোমর জড়িয়ে ধরা বা হাতের আঙুলের তলায় একটা ধাতব স্পর্শ হঠাৎই সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নেয় আকবরের। তেমন কিছু নয়, শাড়ির দুয়েক পাল্লা পরতের নীচে চিকন তাগায় লটকানো ইঞ্চিখানেক একটা মাদুলি মাত্র। স্পর্শের ওপার থেকে ভেসে আসা জ্যোৎস্নার নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বরে কেঁপে ওঠে সে, ওটা রক্ষাকবচ আকবর ভাই। কবচ-টবজে আমার আস্থা নাই, আম্মায় দিছে তাই পড়ি।

জ্যোৎস্না যা-ই বলুক বেখেয়ালে চলতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খাওয়ার মতো বাধায় আকবরের উছলে ওঠা অবাধ্য তাড়না অকস্মাৎ থমকে যায়, আর ঘটনাটা ঘটে তখনই।

ওদের মাথার ওপরেই ছিল ভেঁপুটা, একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে জাহাজের ইঞ্জিন চালু হতে না হতেই নেভানো সব বাতিগুলো জ্বালিয়ে বিকট আর্তনাদে বেজে উঠল সেটা। কান ফাটানো, বুক বিদীর্ণ করা ভেঁপুর আকস্মিক ওই আওয়াজে আতঙ্কিত ভীত হতভম্ব জ্যোৎস্না আচমকা ঘুরে গিয়ে শিশুর মতো প্রায় ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোনও কিছুর জন্যই প্রস্তুত ছিল না আকবর, একই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় বার ভেঁপুটা বেজে উঠবার আগেই বুকের মধ্যে শক্ত করে ওকে আঁকড়ে ধরে সে। ওপারে দৌলদিয়ার ঘাট আর দূরে নয়, মাঝদরিয়া থেকে যা ছিল আবছায়ার মতো, ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার অন্ধকারে ওঠা শত আলোয় এখন তা স্পষ্ট। এদিকে ফেরির ঝকঝকে বাতিগুলোর দীর্ঘ দীর্ঘ ছবি ছুটতে ছুটতে ঢেউয়ের ওপর থরথরিয়ে কাঁপছে। নিজেকে এখনও সামলে নিতে পারেনি জ্যোৎস্না। আকবর ওর হাত ধরে বসে আছে। ভাবছে, আর না যাই ছেঁউরিয়ায়, ফিরতি ফেরিতে বাড়ি ফিরলেই তো হয়।

কড়ির বাজার

পোলাপানগুলারে সাহেব না বানাইয়া ছাড়বানা দেখছি? নবীন হাওয়ায় লাউয়ের ডগার মতো তরতরিয়ে মাচা ডিঙানো বউয়ের ওপর বিরক্ত হয় এমদাদ।

কেন বানামু না? চাষার জাত জনম ভইরা চাষাই থাকব, নাকি? জেদ ধরার মতো করে বলে রেহানা।

কেবল দুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখেছে এমদাদ, এরই মধ্যে রেহানার আবদারের আর শেষ নেই। নতুন বাসা, ফার্নিচার, পুরনো টিভিটা বিক্রি করে এল সি ডি, ছ'মাসের মাথায় আড়াই লাখ নামিয়ে দিয়েছে মহিলা। এখন সরকারি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে বাচ্চাদুটোকে ইংলিশ মিডিয়ামে ঢোকাতে চাইছে। চাইবেই-বা না কেন, যার একটু সামর্থ্য হয়েছে চারপাশটায় চোখ রেখে তার আর উপায় কী? মফস্সল ছেড়ে এসে গাধার খাটুনি খেটে, অনন্ত দৌড়ঝাঁপের জীবন তো এসবের জন্যই। লেখাপড়া শিখে পায়ে কাদামাখা বাপ-দাদাদের চাষবাসের নিস্তরঙ্গ স্রোতে সাঁতার কাটলে কি চলে?

প্রাইভেট চাকরির ফাঁকে ফাঁকে শেয়ার ব্যবসার উপর্যুপরি মুনাফায় অতটা পাগল হওয়ার ছেলে যদিও সে নয়, তবুও কলিগদের মাতামাতি আর বাজারের স্ফীতি দেখে টাকা পয়সা যেখানে যা ছিল ঢেলে দেয় এমদাদ। রেহানাও যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখা তার বিয়ের সোনাদানাটুকু দিয়ে এমদাদের সাহস আরও কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাজারের এমন অবস্থা বুঝেশুনে টাকা ঢাললেই হল। লাভ আর লাভ, লাভের পাহাড়ে চড়বার জন্য মুখিয়ে আছে মানুষ। চারদিকে বিশেষজ্ঞেরও অভাব নেই; সুযোগ পেলেই কম্পিউটারের স্ক্রিনে বাজার দর দেখে, খাবার টেবিলে, চায়ের আড্ডায়, বন্ধুদের সঙ্গে ফোনে, পাশের কলিগদের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে, এমনকি বসের রুমেও আলাপ-আলোচনার একটা নতুন কালচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে অফিসপাড়া। শুধু কি তাই, কেনাবেচার ফর্দ নিয়ে প্রতিদিন শুতে গিয়ে বউয়ের সঙ্গে ফুসুর-ফাসুর, জল্পনাকল্পনা ছাড়া যেন জুত লাগে না আর। ব্যাপারটা এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির ঝিয়েরাও সারাজীবনের সঞ্চয় ভেঙে গৃহকর্তার কাছে দু-পাঁচ হাজার লগ্নি না করে পারছে না এখন।

মনের মধ্যে অচেনা উদ্বেগ থাকলেও জীবনটাকে বদলে ফেলেছে এমদাদ। গ্রামের বাড়ির ভাগের জমিটা বেচে, অফিস থেকে লোন নিয়ে ফ্ল্যাট বুকিং দিয়েছে সে। গাড়ি কেনা ছাড়া রেহানার এখন একটাই দাবি বাচ্চাদের ইংলিশ মিডিয়ামে ঢোকানো।

কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে খাটের পায়ায় বালিশ চেপে আধশোয়া হয় এমদাদ। বলে, পড়ালেখা করানোর ব্যবসা ফাঁদছে স্কুলগুলা। ইংল্যান্ড আমেরিকার সিলেবাস-টিলেবাস ফলো করে পড়ায়, কী কী সব কয়! এর জন্য আবার আলাদা মাস্টার রাখো, দুনিয়ার হ্যাপা। পোলাপান হাতছাড়া হইব যখন বুঝবা।

তপু আর টুসি জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে আছে। আজ ছুটির দিন বলে বেলা করে উঠবে ওরা। রেহানা পর্দা সরিয়ে জানলার একটা পাল্লা খুলে দিতে দিতে বলে, চাষামিটা দেখছি যাইব না তোমার। আর কমুইবা কী, জাতিগুষ্টিতে তো বিদ্যার ব-ও নাই। সন্তানাদি নিয়াই তো মানুষ স্বপ্ন দেখে না কি?

ছুটির ভোরের আয়েশ ভেঙে ঝগড়ায় জড়াতে চায় না এমদাদ। পরিবাগের বারোতলা ফ্ল্যাটের ন'তলার দক্ষিণের জানলা দিয়ে কচি রোদ এসে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় বারি খেয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। রেহানা মশারি গুছিয়ে আলো আড়াল করে ওদিকটায় গিয়ে দাঁড়ায়। শীতের সকালে এখানে দাঁড়াবার একটা সুখ আছে, কুয়াশামোড়া রমনার পুরো সবুজটাই চোখে পড়ে। সাইড টেবিল থেকে খবরের কাগজ তুলে ওল্টাচ্ছিল এমদাদ। কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বলল, ঠিক আছে ফর্ম আনো কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হইব।

কী কথা?

দুই লাখ টাকা লাগবে, অল্পদিনের মধ্যেই দিয়া দিমু, জোগাড় কইরা দেওনা প্লিজ।

কোনও উত্তর না দিয়ে নিশ্চুপ থাকে রেহানা। নিজের চেনাজানা গণ্ডি থেকে বারকয়েক এনে দিয়ে ধার চাওয়াটা এমদাদের কাছে সহজ করে তুলেছে সে। টাকার অঙ্কটা বড় করে চাইতে তাই আর বাঁধছে না ওর। যা-ই হোক দিয়ে তো দেয় ঠিকঠাক, ভেবে রাজি হয় রেহানা। বলে, চাইয়া দেখি পাই কিনা, বেশিদিন রাখতে পারবা না কিন্তু।

পুরনো বন্ধুদের ছেড়ে ক্যান্ত্রিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে নতুনদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না তপু টুসি। তার ওপর পড়ালেখার আকস্মিক চাপ খেলাধূলা কেড়ে নিয়েছে ওদের। রেহানাও দমবার পাত্রী নয়; বাড়িতে মাস্টার রেখে, রুটিন করে, বাড়তি সময় দিয়ে যত্ন নিচ্ছে ছেলেমেয়ের। কিন্তু পাঠ নেওয়ার নামে তোতাপাখির মতো গাদাগাদা বই গেলার ফল আদতে কী দাঁড়াচ্ছে সে হিসেব কষবার শক্তি কি আছে মা-বাবাদের! ওদের সুন্দর হাতের লেখা, চমৎকার উচ্চারণ আর নতুন নতুন বিদ্যা শেখার তালিম দেখে চমকাবে, গদগদ হবে, পারলে জীবন দিয়ে দেবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

আট-ন'মাসের মধ্যেই বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে বইখাতায় লেপটে যাওয়া বাচ্চাদের নতুন জীবনে জড়িয়ে পড়ে খাবি খেতে থাকে এমদাদ। ভোর সাতটায় ওদেরকে স্কুলে দিয়ে সোজা অফিস, লাঞ্চ আওয়ারে একবার স্টক এক্সচেঞ্জে ঘোরাঘুরি, আবার অফিস, বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা সাতটা কী রাত আটটা। তপু টুসি তখনও পড়ছে। রেহানা রান্নাঘরে ব্যস্ত। হাতমুখ ধুয়ে এসে ওদের পড়ালেখা নিয়েও যেটুকু সম্ভব বসতে হচ্ছে তাকে।

সারাদিনে দম ফেলার সুযোগ না মিললেও রাতে রেহানার পাশে শুয়ে নিজেকে জুড়োবার জুতটুকু যখন উপভোগ করে সে, ভাবে, অর্থের কীর্তি হয়তো এই স্ত্রীর সাড়া দেওয়ার ভঙ্গিও বদলে দেয়।

ক্লান্তি নিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমের ঘোরে ডুবতে ডুবতে ভাবনা দীর্ঘ হয় তার। মাত্র তো ক'বছর, চাকরি নিয়ে চলে আসার আগেও বাবার সঙ্গে খেতে মই দিয়েছে, ধান কেটেছে, খালেবিলে মাছ ধরেছে, পায়ে কাদার গন্ধ এখনও উবে যায়নি হয়তো। কিন্তু রেহানার চুলে তৈলাক্ত সুবাস, শরীরের গোপন ভাঁজে ভাঁজে ঘামের কটু ঘ্রাণ এখন আর খুঁজে পায় কই এমদাদ। সব ধুয়ে-মুছে সাফ করবার জন্যই কি তবে কলুর বলদের মতো খেটে মরা তার? যতই খাটুক, এ খাটায় অদ্ভুত এক আমোদও তো আছে। সমূহ সম্ভাবনার আমোদ, আয়েশ-বিলাশ-ভোগের আমোদ।

দুটো বছরও ফুরাল না। এমদাদ কল্পনাও করতে পারেনি এমন হতে পারে, তার বিশেষজ্ঞ বন্ধুরাও না। সবকিছু দুঃস্বপ্নের মতো ঘটে গেল। চায়ের আড্ডায়, খাবার টেবিলে বিচার-বিশ্লেষণ করবে কী, কেউ কারও মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারে না এমন।

প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে শেয়ারের সূচক। সবচেয়ে মারাত্মক, দর নেমেই ক্ষান্ত থাকছে না, তড়াক করে উঠে পড়ছে আবার। এরপর নামছে যখন, একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকছে।

ভূমিকম্পের মতো এই প্রবল ওলট-পালটের মধ্যে তড়পাতে তড়পাতে আরও ক'টা মাস কেটে গেল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

মাসিক খরচটা ঠেকাবার জন্য কাউকে না জানিয়ে পরিবাগের ফ্ল্যাট ছেড়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে দু'কামরার একটা বাসায় গিয়ে উঠল এমদাদ।

এমন নয় যে কাজকর্মে অভ্যাস নেই, গতর খেটে সংসারটা তো টেনেছে অ্যদ্দিন, রেহানাও তার কাজের মেয়েটাকে ছাড়িয়ে দিল। খরচ যতটুকু কমানো যায়। কিন্তু কত আর কমাবে, এমদাদ বেতন যা পায় তার তিনভাগের দু-ভাগই তো লোন বাবদ কেটে নিচ্ছে অফিস। ক্রমান্বয়ে ধারদেনায় দিশেহারা হয়ে উঠতে থাকে তারা।

রেহানা নীরবে সব সইতে থাকল কিন্তু এভাবে আর ক'দিন, পাওনাদারের চাপ ভদ্রতার বেড়া ভেঙে ফেলে। কুলসুম ভাবি দুই-লাখ টাকা চাইতে এসে বলে, অনেক ইজ্জতঅলা ভাবছিলাম আপনেরে। বাসা ছাড়লেন একবার জানাইলেনও না। যতবার টাকা নিছেন, টাইম টু টাইম দিয়া দিছেন আর যখনই বেশি নিলেন গড়িমসি শুরু হইয়া গেল। গুডউইলের তেলেসমাতিটা তো ভালোই দেখাইছিলেন!

রেহানা স্বপ্নেও ভাবেনাই কুলসুম ভাবি এভাবে বলতে পারে। ওর গলা ধরে আসে, ঢোঁক গেলে রেহানা। বলে, আপনের ধারণাডা ভুল ভাবি, টুসির আব্বায়... রেহানাকে কথা বলার সুযোগই দেয় না সে। বলে, টাকা দেওয়ার সময় তো কিছু জিগাই নাই ভাবি, এহন আমি কিছু সুনমুও না, আপনে এমাসের মইধ্যেই আমার টাকা দিয়া দিবেন। সম্পর্কটা ভালো থাকব।

এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন আগে কখনও হয়নি রেহানা, ফলে রাগ অভিমান ক্রোধ জেদ সমস্তটাই গিয়ে পড়ে বেচারা এমদাদের ওপর। কিন্তু কী করবে এমদাদ? ঝড়ে যে ঘরের চাল উড়ে গিয়েছে শুধু বেড়া দিয়ে সে ঘরে আর কতক্ষণ!

অল্পদিনের মধ্যেই ওদের সংসারের সকল শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়ে। বাচ্চাদুটো এখনও স্কুলে যাচ্ছে, দুবেলা খেতে পাচ্ছে কিন্তু ওদের চোখের আড়ালে কখনও-কখনও স্বামী-স্ত্রীতে যে উপোস দিতে হয়। যত কটূক্তিই করুক লাজ-শরমের মাথা খেয়ে বাড়িওয়ালা, দোকানদার, পাওনাদারের সামনে মাথা নোয়াতে হয়।

গজগজানির অভ্যাস রেহানার আছে কিন্তু অন্তরের গভীর থেকে ব্যথামেশা এমন ঝাঁঝ তো আগে কখনও পায়নি এমদাদ। শঙ্কিত হয় সে, কুণ্ঠিতও হয়, বলে ভুক্তভোগীর দলে কোনও দলাদলি নাই বুঝলা। স্লোগান দিয়া রাস্তায় নামলাম, পুলিশে ধাওয়া দিল।

ঘরের মালামালের মধ্যে এমদাদ টিভিটা বেচে দিল। তপু মুখ ভার করে নিঃশব্দে কাঁদছে, টুসি কিছু বলছে না কিন্তু বোঝা যায় সারাক্ষণের বন্ধু হারাবার ব্যথা মুখ বুজে সইছে মেয়েটা। এমদাদ ছেলেকে কোলে নিয়ে বারবার চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে, ক'দিন পর আবার কিনা আনমু আব্বা, কান্দে না লক্ষ্মীসোনা, বলতে বলতে জবজবে জলে নিজেই চোখ ভারী করে তোলে সে।

এরপর দফায় দফায় ওদের সামনে থেকে সোফা, আলমারি, ড্রেসিংটেবিল, ওভেন, ফ্রিজ বিদায় নিতে থাকলেও তপু টুসির তেমন কিছু যায় আসে না আর।

বুক ফেটে যাচ্ছে তবুও মুখে খিল তুলে দিয়েছে রেহানা। না তুলেই-বা কী করে সে? শহরে এসে কত করে বলল লেখাপড়া যেটুকু আছে তা নিয়ে একটা কাজ শুরু করি কিন্তু কে শোনে কার কথা, এমদাদের ওই এক গোঁ, ঘরের বউ ঘরে থাকো। কাজে গেলে বাচ্চারা মানুষ হবে না। বড় বড় মেয়েমানুষ যারা দিনরাত সংসারের ঘানি না টেনে চাকরি-বাকরি করছে তাদের বাচ্চারা বুঝি ঘাড়ে জোয়াল তুলে ঘুরে বেড়ায়?

এমদাদ অতশত বোঝে না। সে চায়নি ব্যস। এখন বুঝুক! রেহানা একে-তাকে ধরে একটা কাজের চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু যার কোনও অভিজ্ঞতা নেই, বললেই তো আর তার কাজ জুটে যায় না।

নিত্যনতুন দরপতনের আতঙ্কে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ক্ষোভ অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছে। কীভাবে কী ঘটছে কারওরই ধারণায় নেই। প্রতিদিন কেবল সর্বস্বান্ত হওয়ার খবর, তবুও সর্বহারার দল অনবরত ধসের মধ্যেও নতুন করে দর ওঠার ক্ষীণ আশায় বুকে পাথর বেঁধে আছে। কিন্তু সব আশার বাঁধ ভেঙে দিয়ে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে স্টক এক্সচেঞ্জ মাথা ঘুরে পড়ে গেল, পুঁজিহারা মানুষের বিক্ষোভে রাজপথ উথলে ওঠে।

মতিঝিলের সোনালি ব্যাঙ্কের মোড়ে পুলিশের দাবড়ানি খেয়ে রক্তেভেজা শার্ট আর ফাটা মাথা নিয়ে ঘরে ফেরে এমদাদ। ধুয়ে-মুছে তুলোয় মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে গজগজ করছে রেহানা, তুমি মরো আর আমি পোলাপান লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করি। আকাইম্মা বজ্জাদ বেডা কোনহানের। যা হওয়ার হইছে, দলাদলির মধ্যে যাওয়া কেন? এত হাউস কেন তোমার? কী কপাল লইয়া জন্মাইছিলাম, একফোঁডা সুখ যদি সয়!

গজগজানির অভ্যাস রেহানার আছে কিন্তু অন্তরের গভীর থেকে ব্যথামেশা এমন ঝাঁঝ তো আগে কখনও পায়নি এমদাদ। শঙ্কিত হয় সে, কুণ্ঠিতও হয়, বলে ভুক্তভোগীর দলে কোনও দলাদলি নাই বুঝলা। স্লোগান দিয়া রাস্তায় নামলাম, পুলিশে ধাওয়া দিল।

স্বামীর সরল কোমল এমন উচ্চারণে কেঁদে ফেলে রেহানা। রক্তাক্ত বাপকে ঘিরে তপু টুসি হতবাক হয়েছিল, মায়ের দেখাদেখি এবার তারাও ফোঁপাতে থাকে।

তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি। বাচ্চাদের স্কুলের বেতনও।

দুবার চিঠি দিয়ে এবার এমদাদকে ডেকে পাঠিয়েছেন প্রিন্সিপাল। সবকিছু বুঝিয়ে বলার পরও তিনি তাঁর অপারগতা প্রকাশ করলেন। বললেন, বুঝতে পারছি না যে তা নয়। আমিও তো চাকরি করি ভাই। নিয়মের মধ্যে চলতে হয়। টিউশন ফিস ক্লিয়ার না করে ওদেরকে আর স্কুলে পাঠাবেন না প্লিজ।

আকাশ ভেঙে পড়ে এমদাদের মাথায়। নিজেকেই যে বুঝ দিতে পারছে না সে কী বলবে এখন ছেলেমেয়েদের? ঘরে ফিরে অভিশপ্তের মতো পাথর হয়ে থাকে এমদাদ। এমন কিছু আর অবশিষ্ট নেই যা বিক্রি করে সামলাবে। তপু টুসিকে ডেকে শুধু বলে, কাল থেকে স্কুলে যাইতে হইব না, তোমাগো স্কুল ছুটি।

শুনে বাচ্চারা আনন্দ পেলেও রেহানার বুকে বজ্রপাতের আওয়াজ হয়। রান্নাঘর থেকে এমদাদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে চোখ সরিয়ে নেয় সে।

বাড়িওয়ালা হুমকি-ধামকি দিলেও এখনও অতটা বেপরোয়া হয়নি। তার ছোট ছেলেটাও

তালা খুলে কপাট ঠেলতেই আত্মা উবে যায় রেহানার!
হাত-পা ছড়িয়ে হিমশীতল মেঝেতে লুটিয়ে আছে বাছারা,
দুটো গ্লাস আর কোকের খালি বোতলটাও লুটোচ্ছে।
ব্যাপারটা বুঝতে একমুহূর্তও লাগে না তার।

শেয়ারে পুঁজি হারিয়ে ঘরে ঘাপটি মেরেছে। এইটুকু মমতা কি সে কারণেই? হবে হয়তো-বা। বাড়ির মালিক হলেও মানুষ তো। কিন্তু ক'দিন বাদে কুলসুম ভাবি জোয়ান দেবরকুল সহ টাকা চাইতে এসে এমন ভাবভঙ্গি করলেন যেন তুলে নিয়ে যাবেন। আর ছেলেগুলোও মাসাল্লা-লম্বা চুলের ঝুঁটি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কানের লতিতে রিং, হাতে রুলি পড়েছে। এসেই যে যেখানে পারল বসে পড়ল, আদর করল তপু টুসিকে, যেন অনেকদিনের চেনা!

এমদাদকে এসবের কিছু না জানিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে একদম সিটিয়ে গেল রেহানা। ভয়ে আধখানা হয়ে থাকল। কুলসুম ভাবির দেবরদের চেহারাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠলেই রক্ত হিম হয়ে বুকের স্পন্দন থেমে যেতে চায় তার। দৈনিক পত্রিকা আর টেলিভিশনের বীভৎস সব খবর, এযাবৎ যা দেখেছে সে, স্মৃতিতে ঘুরপাক খেতে থাকে। অলক্ষুণে ভাবনায় কাতর রেহানা মানসিক চাপ ধৈর্যের সঙ্গে বইতে পারে না আর। একবার ভাবে পালাবে, আবার চিন্তা করে দু-দুটো সন্তান নিয়ে রিক্ত হাতে যাবেই বা কোথায়। পাগল হয়ে ওঠে রেহানা। ওদের নিয়ে তবে ট্রেনের নীচে কাটা পড়বে? বিষ খাবে?— শেষে বিষ খাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় সে।

তপু টুসিদের জানলার নীচে বাড়িওয়ালার বাগান কসমস, গাঁদা, ডালিয়া, সূর্যমুখীতে থৈথৈ করছে। রংবেরঙের অনেক প্রজাপতি ওখানে, উড়ে-উড়ে দোতলার গ্রিলের কাছে চলে আসে। বাইরে হাত বাড়িয়ে বর্ষায় বৃষ্টি ধরার মতো প্রজাপতির পাখা ধরতে চায় তপু। কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে না সে। পিছনে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের প্রজাপতি ধরার চেষ্টা দেখে টুসি।

বাবা চলে গেলে দরজায় তালা লাগিয়ে মা-ও বেড়িয়ে যায় রোজ। তখন ওদের আর কোনওকিছুতেই বেশিক্ষণ মন বসে না। তপুটা এটা খাব ওটা খাব বলে কাঁদে। টুসিরও যখন-তখন বেদম ক্ষিদে পায় কিন্তু টোস্ট বিস্কুট আর পানি ছাড়া ঘরে মুখে তোলার মতো কীই-বা থাকে আর! কোনও আবদার তুলে একবার ফোঁপাতে শুরু করলে কিছুতেই থামতে চায় না ছেলেটা।

আজ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলছে, বাবায় আমার জন্য কিছু আনে না কেন আপু? মায়ও তো খাবার জন্য বকে না। বলতে বলতে হেঁচকি তুলে কাঁদতে থাকে ছেলেটা, বলে আমার খুব ক্ষিদা পায়। আমার মন খারাপ, আমার কিছু ভাল্লাগে না। আমাগো তালা দিয়া মায় কই যায়? হাজারটা প্রশ্ন তার আর কলজে ফুলিয়ে কান্না।

চোখ মুছিয়ে দিয়ে ছোট্ট মাথাটাকে কচি বুকের মধ্যে চেপে ধরে টুসি, কাইন্দো না ভাই, বাবায় না কইছে তোমার জন্য কেক নিয়া আইব।

শীতের রোদ ভেঙে রেহানার ফিরে আসতে দুপুর গড়িয়ে যায়। কখন রাঁধবে আর খাবেই বা কখন? ঘরে চাল আর আলু ছাড়া তো কিছু নেই যা ফুটিয়ে দেবে। মাকে পেয়ে খোকারা জাপটে ধরে, কী আনছ মা? খুব ক্ষিদা পাইছে। যে শিশুদের পৈপৈ করে বলেও কিছু গেলানো যেত না এখন তারা খাওয়ার জন্য কেমন মুখিয়ে থাকে! কিছু আনলেই হল, মন মজিয়ে তৃপ্তি নিয়ে খায় ওরা।

মেঝেতে বসে বুকের সঙ্গে বাচ্চাদের অনেকক্ষণ ঠেসে ধরে ডান-বামের দুটি কপালে বারবার চুমু খায় রেহানা। ওর বুকের ভারী স্পন্দনে গাল চেপে থাকে তপু টুসি। রাস্তায় একটা অ্যাম্বুলেন্স জ্যামে আটকা পড়ে কান ফাটিয়ে ককাচ্ছে।

ব্যাগ খুলে চারটে সমুচা আর একটা কোকাকোলার বোতল বার করে রেহানা। প্রিচে করে সমুচা দিয়ে বোতলটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে সে। কোক, সমুচার আয়োজন তপুর সবচেয়ে প্রিয়। ওরা নিবিষ্ট মনে সমুচার মচমচে খোল ভেঙে খাচ্ছে আর গ্লাস ভরে কোক ঢেলে দেওয়ার অপেক্ষা করছে। কিন্তু কোক ঢেলে না দিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে রান্নাঘরে শিলনোড়ায় আতপ চাল পেষার মতো একমুঠো ট্যাবলেট পিষে বোতলে গুলিয়ে নিচ্ছিল রেহানা।

অসময়ে গেটের কলিংবেলটা বারকয়েক বেজে উঠল তখনই। দরজা খুলে দিয়ে বাপকে ঘিরে কোকের কথা ভুলে গিয়েছে বাচ্চারা। এমদাদের হাতের ঠোঙায় দু-পিস কেক আর একটা জুসের বোতল।

শেয়ার কেলেঙ্কারি প্রতিরোধ কমিটির মিটিং থেকে সে অফিসের দিকে ফেরেনি আর। মনে নতুন আশা নিয়ে হেঁটে হেঁটে সোজা বাসায় চলে এসেছে। বাজার পরিস্থিতি উন্নতির দিকে না গিয়ে পারবে না এখন, অর্থমন্ত্রীকে দিয়ে তো কিছু হল না, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করবেন, দায়িত্ব নেবেন। মিটিংয়ে এসব আলোচনা হয়েছে, প্রয়োজনে বৃহত্তর কর্মসূচির জন্য সবাইকে প্রস্তুত হতে বলেছে।

রেহানা যত বাধাই দিক ওকে না জানিয়ে অল্পদিনে এসবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে এমদাদ। নেতৃত্বের সঙ্গে থাকতে চাইছে সে। ও বিশ্বাস করে বিপদ চিরদিন ঘাড়ের ওপর চেপে থাকে না, আজ হোক কাল আঁধার কাটবেই।

গুঁড়ো মেশানো কোকের বোতলটা তাকে তুলে রেখে মাতালের মতো টলতে টলতেই অভ্যাসবশে চুলায় চাল চাপিয়েছে রেহানা। আলু সেদ্ধ করেছে। টিনের কৌটোয় কুমড়ার বিচি খুঁজে পেয়ে ভেজে ভর্তা করেছে। ভাত পেতে বেলা গড়িয়ে গেলেও এমদাদ যেমন কোনও রা করেনি, রেহানাও ঘন-গভীর দুর্বোধ্য খেয়ালের মধ্যে ফর্সা মুখখানা অন্ধকার করে থমধরে থাকল সারাদিন। ছেলে-মেয়ে-স্বামী কারও দিকে কোনও চেতন আছে কি নেই বোঝা গেল না। সন্ধ্যারাত থেকে ভারী কাঁথার তলায় মরার মতো ঘুমিয়ে রইল।

বেজায় ঠান্ডা পড়েছে আজ। ভরদুপুরেও একফোঁটা রোদ নেই। একটা পলিথিনের পোঁটলায় সামান্য বাজার নিয়ে ফিরেছে রেহানা। গেটেই বাড়িওয়ালা বুড়োর সঙ্গে দেখা। চাদর পেঁচিয়ে উপচে-পড়া ড্রেনের দিকে আনমনে তাকিয়ে আছেন তিনি। রেহানাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে সরে দাঁড়ালেন। দুরুদুরু বুকে দ্রুত সিঁড়ি টপকে উঠে এল ও, যেন ঘরে গিয়ে দরজায় খিল আটতে পারলেই বাঁচে।

তালা খুলে কপাট ঠেলতেই আত্মা উবে যায় রেহানার! হাত-পা ছড়িয়ে হিমশীতল মেঝেতে লুটিয়ে আছে বাছারা, দুটো গ্লাস আর কোকের খালি বোতলটাও লুটোচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে একমুহূর্তও লাগে না তার। হায় আল্লা, হায় হায়, বলে, আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করা চিৎকারে মূর্ছা যায় সে।

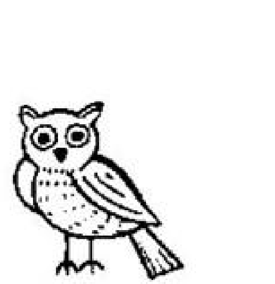

তুরস্কের এফেসুস আর পামাক্কুলে

প্রতাপকুমার রায়

মার্বেল স্ট্রিট, এফেসুস

তুরস্ক আমার প্রিয় দেশ। তুরস্ক বলতে ইস্তাম্বুল। ইস্তাম্বুলের বাইরে কখনও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আমার মতো পর্যটকদের বড় শহরের বাইরে বিশেষ যাওয়া হয় না। আমরা ফ্রান্স বলতে বুঝি প্যারিস। ইটালি বলতে রোম।

এবারে ইস্তাম্বুলের বাইরে গিয়েছিলাম। ইজমিরে, দক্ষিণ-পশ্চিম তুরস্কে। সমুদ্রের ধারে। ইস্তাম্বুল থেকে বিমানে এক ঘন্টার দূরত্ব। সড়কপথে বাসে গেলে দশ ঘন্টা লাগে। কিন্তু দেশটা আরও দেখা যায়। আমাদের সে সময় কোথায়?

সুতরাং বিমানে এক সকালে ইজমির বিমানপত্তনে পৌঁছলাম। আমাদের হোটেল সেখান থেকে এক ঘন্টার পথ। দুপাশে, দূরে ছোট-বড় পাহাড়। শেষ গ্রীষ্মে তখনও অবারিত সবুজ। পথের দুধারে অনেক গাছপালা। কৃষিক্ষেত্র। কী চাষ হয়েছে সেখানে জানবার উপায় নেই। এক তো মসৃণ রাস্তায় দ্রুতগতি গাড়ি চলেছে, শনাক্ত করতে পারি না। আর, দ্বিতীয়ত কাকে জিজ্ঞাসা করব, ড্রাইভারকে? সে বিন্দুমাত্র ইংরিজি বোঝে না। আমাদের নাম-লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিমানপত্তনের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। আমরা কাছে পৌঁছতে সে বুঝে নিয়েছিল আমরা দুজন তার যাত্রী। শুধু বলল, ওটল। অর্থাৎ হোটেলে নিয়ে যাবে। আমরা এসেছি এক আয়োজিত সফরে। ইস্তাম্বুলে টাকা জমা করে দিয়েছি। ট্যুর কোম্পানি আমাদের যাতায়াত, হোটেল, খাওয়াদাওয়া এবং গাইড সহ ঘোরাফেরার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমাদের কোনও বিষয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। ইজমিরে নেমে দেখলাম, কোনও শহরের চিহ্ন নেই। এয়ারপোর্ট যেমন হয় সব দেশে, প্লেন নামে সেই তেপান্তরের মাঠে।

ইজমির তুরস্কের তৃতীয় বড় শহর। খ্রিস্টের সাতশো বছর আগে এই স্থানে হোমারের জন্ম হয়।

কিছুদূর যাবার পর একটা ছোট জনপদে গাড়ি থামল। সেখান থেকে এক ভদ্রলোক উঠলেন। তিনি শার্ট ফুলপ্যান্টের অতিরিক্ত গলায় টাই লাগিয়েছেন। বোঝা যায় বেশ গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষ। আমাদের এক নজর দেখে নিয়ে বললেন স্পষ্ট ইংরিজিতে, আমি আপনাদের গাইড। আমি আপনাদের এফেসুস নিয়ে যাব। আজ সারাদিন আপনাদের সঙ্গে আছি। এখান থেকে আমরা বাকি সবাইকে নিয়ে এখনই রওনা হব।

আমরা বললাম, সে কী? আমরা তো হোটেলে যাব আগে। তারপর মুখহাত ধুয়ে সেখান থেকে এফেসুস যাব।

গাইড গম্ভীর গলায় বলল, তা কী করে হবে। হোটেল তো অন্যপথে। বাকি যাত্রীরা এখনই এসে পড়বেন। তাঁরা আপনাদের জন্য

প্রাচীন লাইব্রেরি, এফেসুস

অপেক্ষা করতে রাজি হবেন না।

কথা বলতে বলতে তখনই একদল যাত্রী একটা ছোট বাস থেকে নামলেন, তাঁদের বুঝি আর কোথাও থেকে তুলে আনা হয়েছে। তাঁরা আমাদের বাসে উঠে পড়লেন।

বাস চলতে শুরু করেছে, আমরা মহা বিরক্ত। এমন কথা ছিল না। আমাদের প্রোগ্রামে স্পষ্ট লেখা আছে, হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা গন্তব্যের দিকে রওনা হব। গাইডের গলা শোনা গেল। প্রথমে জার্মান ভাষায়, তারপর ইংরিজিতে। বলছে, আমাদের দুজন পর্যটকের জন্য হোটেলে যেতে হবে একবার। এঁরা জেদ করছেন। আধঘণ্টা লাগবে, আপনাদের অসুবিধা হবে না তো?

অন্য পর্যটকেরা নীরবে তাঁদের অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না, আধঘণ্টা লাগবে না।

গাইড বলল, পনেরো মিনিট তো লাগাবেন, তাই না?

আমি সহযাত্রীদের উদ্দেশ করে বললাম, পনেরো মিনিটও লাগবে না, আমরা সাড়ে চোদ্দ মিনিটে তৈরি হয়ে নেব। আপনাদের কথা দিচ্ছি।

সবাই হেসে উঠলেন। আবহাওয়া একটু হালকা হল। গাইড বলল, তাহলে হোটেলেই যাচ্ছি।

হোটেলে আমাদের দশ মিনিটও লাগল না। ঘরে ঢুকিনি। রিসেপশনে নাম লিখিয়ে মালপত্র জমা দিয়ে রেস্টরুমের কাজ সেরে দশ মিনিটে ফিরে এসেছিলাম।

হোটেলের মস্ত চত্বর ফুলে-ভরা সাজানো বাগান। সহযাত্রীরা বাস থেকে নেমে ইতস্তত ঘুরছেন। দুয়েকজন সিগারেট ধরিয়েছেন।

উপক্রমণিকাতে এত কথা বললাম, তার কারণ আপনাদের সঙ্গে দুধরনের গাইডের পরিচয় করিয়ে দেব। আপনাদের অভিজ্ঞতায় আপনারাও এমন দেখে থাকবেন। পরদিন আমাদের যে গাইড ছিল, সে একেবারে অন্য প্রকৃতির। বাকপটু, হাসিমুখ, সবসময়ে সাহায্য করবার জন্য তৈরি। সে আমাদের পামাক্কুলে নিয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, আমরা এফেসুসের দিকে রওনা হলাম। আমাদের হোটেল থেকে আধঘণ্টার পথ। সেই পরিচ্ছন্ন মসৃণ রাস্তা, দুপাশে মাঝারি মাপের গাছের জটলা। দেখলেই বোঝা যায়, এরা প্রকৃতির অগোছাল সংসারের নয়, মানুষের রোপিত শৃঙ্খলাবদ্ধ গাছের জমায়েত।

গাইডকে জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল, এগুলি তুঁত গাছ। মানুষই এগুলি লাগিয়েছে, সযত্ন লালন করছে। তুঁত গাছে রেশমকীট তার গুটি বাঁধে, সেই গুটি থেকে রেশমের সুতো তৈরি হয়।

গাইড বলল, তুরস্কের রেশম পৃথিবীবিখ্যাত। এখানে সিল্কের বড় শিল্প আছে। আপনারা চাইলে বিকেলে আপনাদের কেমন করে সিল্ক বোনা হয় দেখাব। সেখানে সিল্কের বহুবিধ জিনিস কিনতে পারবেন। ফ্যাক্টরির দামে।

মনে হল আমাদের সহযাত্রী পর্যটকেরাও ঘর-পোড়া গরু। তাঁরা এইসব কারখানা আর দোকান থেকে দূরে থাকেন। জানেন যে গাইডের দেখানো দোকানে বাজারের থেকে বেশি দামে জিনিস বিক্রি হয়, কারণ গাইড সেখান থেকে কমিশন পাবে।

আমাদের সহযাত্রীদের অধিকাংশ জার্মান। দুজন ইজরায়েলের মানুষ ছিলেন। তাঁরা ঈষৎ স্বতন্ত্র থাকছিলেন, সবার সঙ্গে মিশছিলেন না।

পথে আরও নানাবিধ গাছ দেখলাম। আপেল, বাবুগোঁসা, ডুমুর। এটা বুঝি তুরস্কের অতি উর্বর অঞ্চল। আরেকটু দক্ষিণে গেলে আঙুরের চাষ হয়। সেই অঞ্চলের মদিরাও বিখ্যাত।

গাইড সহজে কথা বলতে চায় না। আরও অনেক জিজ্ঞাস্য ছিল। কিন্তু গাইডের বেজার মুখ দেখে কিছু বলতে ইচ্ছা করে না।

পথ এবার বেশ উঁচু-নিচু, ঢেউখেলানো। একটা পাহাড়ের কোল দিয়ে আরেক পাহাড়ে সামান্য উঠেই আমরা থামলাম। এই হল এফেসুস, দুহাজার বছর আগের সমৃদ্ধ রোমান নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

গাইড বলল, ধ্বংসাবশেষ বটে, তবে পৃথিবীর আর কোথাও পুরো একটা শহরের অধিকাংশ বাড়ির চিহ্ন রয়েছে, এমন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না।

আমরা তখন শহরের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। প্রধান তোরণের সামনে। খুব গরম, মধ্যদিনের সূর্য মাথার ওপর, ঘাম হচ্ছে।

গাইড আমাদের সবাইকে জড়ো করে ছোট একটি বক্তৃতা করল, প্রথমে জার্মান ভাষায়, তারপর ইংরিজিতে। বলল, সামনেই আপনারা নাট্যশালার গ্যালারির নীচের অংশ দেখতে পাচ্ছেন। গ্যালারির চূড়ায় উঠে, ওপরে শহরের প্রধান রাস্তা পাবেন। তার দুধারে, বসতবাড়ি ছিল একদা, একটু এগিয়ে গণিকালয়ও পাবেন। বন্দিশালা, সাধারণের স্নানাগার। শেষপ্রান্তে সেলসুসের লাইব্রেরি, দোতলা বাড়িটা প্রায় অক্ষত আছে, ছাদ নেই অবশ্য, পড়ে গিয়েছে। সেখান থেকে সমুদ্রের জেটিতে যাওয়া যায়। একসময় সমুদ্র আরও নিকটে ছিল। এফেসুস তখন বিখ্যাত বন্দর।

এত কথা কেন, আমি জানি গাইড আমাদের দ্রষ্টব্যস্থানগুলি পরের পর দেখিয়ে দেবে। গাইড বলল, আমি এখান থেকে আপনাদের সঙ্গে থাকব না। আপনারা জেটির দিকে না গিয়ে, লাইব্রেরি থেকে ডানদিকে মোড় নিয়ে, একটা গাছের ছায়ায় ঢাকা সমতল পথ পাবেন। এক কিলোমিটার মতো গেলে বাসস্ট্যান্ড। সেখানে আপনাদের বাস থাকবে। চিনে নিয়ে উঠে পড়বেন। আমি সেখানে থাকব। দেরি করবেন না, দেরি হলে বাস ছেড়ে দেবে। তখন আপনাদের হোটেলে বা বাসস্থানে ফেরা একটা সমস্যা হবে। মনে রাখবেন ঠিক দুটোয় বাস ছাড়বে।

আরও অনেক কথা বলেছিল গাইড। সব

কথা মনে নেই। বিনা পথপ্রদর্শক, এই পাথর, ভাঙাচোরা মূর্তিতে-ভরা, মার্বেলের এবড়োখেবড়ো দূরত্ব ভেঙে ঠিক পৌঁছতে পারব কিনা আমার সংশয় হয়েছিল।

গাইড সাময়িক গুডবাই বলে বিদায় নিল, আমরা ধীরে ধীরে গ্যালারির ওপরের সারির দিকে উঠতে লাগলাম। আশপাশে কোথাও পত্র-পল্লবের চিহ্নমাত্র নেই। ক্লান্ত হয়ে একটু ছায়ায় আশ্রয় নেব, তার আশা নেই। গরমও তেমনই বিভীষণ। তাছাড়া, একটা ছবির বই দেখে সব জায়গা শনাক্ত করা যায় নাকি!

ভেবেছিলাম, আমাদের সঙ্গী দলের কাউকে অনুসরণ করব। কিন্তু মুহূর্তে কে কোথায় হারিয়ে গেল। আমাদের দলের লালটুপি-পরা এক ভদ্রমহিলাকে চিহ্ন করেছিলাম, তাঁকেও আর দেখতে পাই না। তার ওপর ভয়, দুটোর পর বাস চলে যাবে। আমি তখন কোথায় যাব! আমার সঙ্গী অমরেন্দ্র, মানে 'ভ্রমণ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। ছবি তুলতে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে। তার বয়স কম, আমি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারি না। সে আবার মাঝে মাঝে ফিরে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। তার দিকে নজর রাখা বড় কঠিন কাজ।

আরও অনেক পর্যটক এই পথে চলেছে। আমি যথাসম্ভব আমার কেনা বইটিতে দেওয়া ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দ্রষ্টব্য শনাক্ত করছি। দুপাশে পরের পর কারুকার্য-শীর্ষ থাম। পাথর এবং মার্বেলের তৈরি নানা মূর্তির খণ্ড যত্রতত্র পড়ে রয়েছে। একসময়ে যেখানে পৌঁছলাম সেটি মার্বেল স্ট্রিট। দুহাজার বছর আগে এই রাজপথের দুপাশে ধনী নাগরিকদের বাসস্থান ছিল। তাঁদের আমোদের জন্য রঙ্গশালা, স্টেডিয়াম, স্নানাগার।

ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রকে হারিয়ে ফেলেছি, সে আমার আগে রয়েছে না পিছিয়ে পড়েছে জানি না। সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁজে চলেছি। পথ অসমতল ও প্রস্তরাকীর্ণ। পথের দিকে মন না দিলে হোঁচট খাওয়া এড়াতে পারব না। তাই সঙ্গীকে খুঁজে পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। যদি বাসস্ট্যান্ডে দেখা হয়, ভালো। আর না হলে? ভালো করে ভাবতেও পারছি না। বইতে হবে বলে জলের বোতল সঙ্গে আনিনি। এক ডলার বাঁচাতে গিয়ে টুপি কেনা হয়নি। নির্দয় সূর্যতাপ থেকে মাথা বাঁচাব, তার উপায় নেই।

এবারে এক সারি মার্বেলের মূর্তি। কাদের মূর্তি জানি না। বইতে তাদের ছবি খুঁজে পেলাম না।

দুটি মূর্তি চিনতে কোনও অসুবিধা হল না। নাইকে অর্থাৎ ভিক্টরি, বিজয়ের দেবী। পাথরের ওপর খোদাই। একপাশে আরও অনেক মূর্তির সঙ্গে অবহেলায় পড়ে আছে। অন্যটি স্কোলাসটিসিরি। তিনি সাধারণের স্নানাগারের পরিকল্পনা করেছিলেন। মূর্তিটি যেন পাথরের তৈরি কবিতা, অসাধারণ লাবণ্যময়। মূর্তির নিম্নাঙ্গ আছে, মাথাটি নেই।

কিছুদূরে, হয়তো মাইলটাক হবে, সবুজের আভা দেখতে পাচ্ছি। হয়তো ওইখানে পৌঁছতে পারলে একটু আরাম পেতাম। কিন্তু ওটা আমার পথে পড়বে কিনা, কে বলে দেবে? সঙ্গে সঙ্গে, সামনে পিছনে যারা হাঁটছে তাদের জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। তাদের কাউকে ইংরেজ বলে মনে হল না। তবু দয়ালু মুখ দেখে এক প্রৌঢ়কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ইংরিজি প্রশ্ন বুঝেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই হারিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গীরা কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

হঠাৎ সামনে দেখি একটি অতি সুন্দর থাম লাগানো দোতলা বাড়ি। এই তো সেই সেলসুসের লাইব্রেরি! আটটি সুন্দর থাম দিয়ে বানানো প্রাসাদ প্রায় অক্ষত দাঁড়িয়ে। এগুলি, আমার বই বলছে, আয়োনিয়ান শৈলীর। থামগুলির মাথার ওপরটা কারুকার্যকরা। অনুমান দ্বিতীয় শতাব্দীতে তৈরি। দোতলায় আবার অনুরূপ স্তম্ভ আটটি। হঠাৎ দেখলে বাড়িটির কল্পনাতীত সৌষ্ঠব চমকে দেয়। মনে হয় যেন বাড়িটা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, এখানে ওখানে কাজ চলছে। দীর্ঘকালের অব্যর্থ ক্ষয় সহ্য করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

মনে পড়ল, গাইড বলেছিল, মার্বেল স্ট্রিট অঞ্চলের পয়ঃপ্রণালীর আয়োজন চমকপ্রদ। বিগতদিনের বলে মনে হবে না।

সেলসুসের লাইব্রেরি একটু উঁচু জমিতে। তাই দূর থেকে দেখা যায়। লাইব্রেরির সুন্দর ইমারতটি দেখতে দেখতে ক্রমশ একটু নীচে নামলাম। আরও কাছে গিয়ে পাঠাগারটি দেখলে ভালো হত। কিন্তু কত আর অন্ধের হাতি দেখার মতো অসম্পূর্ণ একটা ছবি মনের মধ্যে তৈরি করব? মার্বেলের থামগুলি অসাধারণ সুন্দর, তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী যুবতীর মতো সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে নড়তে মন চায় না।

এমন নয় যে কল্পনার ছবির মতো এমন অপরূপ স্তম্ভ আগে দেখিনি। মূল তোরণ থেকে এখানে পৌঁছেছি। পথে দুপাশে অগণিত এই ধরনের থাম। কিন্তু তারা বেশিরভাগই অর্ধভগ্ন। এখানে ওপরের তলায় এবং নীচে আটটি করে অক্ষত থামগুলি চমৎকৃত করে। সেকালের বৈভবের কথা মনে করিয়ে দেয়। না জানি, এই সারা শহরটাই কত সুন্দর, কত আনন্দময় ছিল।

এফেসুসের পত্তন হয়েছিল এই পাঠাগার নির্মাণের প্রায় বারোশো বছর আগে। এথেন্সের রাজপুত্র আন্দ্রোক্লোস খ্রিস্টের হাজার বছর আগে এই অঞ্চলটা জয় করে প্রথম শহর নির্মাণ করেছিলেন এখানে। দেবদেবীদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হল। শহরটা কর্মচাঞ্চল্যে জাঁকিয়ে উঠেছিল। আলেকজান্ডার এফেসুসে পৌঁছলেন, তাও খ্রিস্টের তিনশো বছর পূর্বে। শহরটার সাজসজ্জা, সুখসুবিধা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

বর্তমান এফেসুসের আদিপুরুষ বলা যায় লাইসিমাকোসকে, সম্ভবত আলেকজান্ডারের উত্তরপুরুষ। তিনি শহরটা অধিকার করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ২৮৩ সালে। পাশের জলাজমির অসুস্থ পরিবেশ থেকে তিনিই এফেসুসকে সরিয়ে নিয়ে এলেন বুলবুল আর কানহির মাঝখানের উপত্যকায়। মনে পড়ল গাইড বলেছিল, শহরটাকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরেছিলেন লাইসিমাকোস। সেই পাঁচিলের ভাঙা খণ্ডাংশ এখনও কিছু দেখা যায়।

লাইসিমাকোসের মৃত্যুর পর এফেসুস অধিকার করে যথাক্রমে মিশরীয় এবং সিরিয়ানরা। রোমানদের দখলে শহরটা এল খ্রিস্টের প্রায় দুশো বছর আগে। তারপর থেকেই শহরটার সমৃদ্ধি শুরু হল। এশিয়ার রোমান প্রদেশগুলির রাজধানী হল এফেসুস। আবার আক্রমণকারীদের কবলে পড়ল এফেসুস। গথেরা আর্টেমিসের পৃথিবীবিখ্যাত মন্দির ভেঙে দিয়েছিল। তখন বলা হত পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আর্টেমিসের মন্দির। মৃগয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আর্টেমিস।

আর্টেমিসের মন্দিরের স্থানটি আমরা পরে দেখেছিলাম। সেকথা পরে বলব।

আপাতত সেলসুসের পাঠাগার দেখবার অপূর্ব সুখ ছাপিয়ে সূর্যদেব বড় যন্ত্রণা দিচ্ছেন। তার ওপর একটা দুশ্চিন্তা বড়ই ভাবিয়ে তুলল। লাইব্রেরির কাছে এসে প্রধান রাস্তা দুভাগ হয়ে গিয়েছে। আমি ডানদিকে যাব না বাঁদিকে? ভুল পথে চলে গিয়ে আবার এই নিদারুণ গরমে ফিরে আসতে হবে ভেবে আতঙ্কিত হয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত ঠিক পথেই কেমন করে রওনা হলাম জানি না। বাসস্ট্যান্ডে না পৌঁছনো পর্যন্ত শান্তি নেই। সুখের মধ্যে পথ এখন সমতল, এবং দুপাশে গাছের ছায়ায় সুশীতল না হোক, অসহনীয় নয়।

দূরে কতগুলি বাস এবং গাড়ি দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। তখন মনে হয়েছিল সেখানে পৌঁছতে যেন অনন্তকাল লাগছে।

দুপাশে ছোট-বড় অস্থায়ী ছাউনির নীচে কয়েকটি দোকান। দু-চারটে চেয়ারও আছে সামনে। তারই একটাতে বসে শীতল পানীয় সেবন করে দেহমন কিঞ্চিৎ শান্ত হবার পর আবার দুশ্চিন্তা ও ভয় চেপে ধরল। অমরেন্দ্র কোথায়, তাকে তো দেখছি না। যদি বাস এবং গাইড খুঁজে না পাই তাহলেই বা কী হবে? কয়েকটি বাস সামনে দাঁড়িয়ে আছে, অনিশ্চিত পায়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই দেখি আমাদের

পামাক্কুলে

গাইড। তাহলে পাশের বাসটাই আমাদের। কিন্তু অমরেন্দ্র, তার কী হবে?

সে কি এই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে বিনিদ্র রজনীতে মেহের আলির হাঁক শুনবে, সব ঝুটা হ্যায়।

বাসে উঠে গাইডকে আমার আশঙ্কার কথা বললাম। সে বিশেষ আমল দিল না। বলল, আমি তো বলেইছিলাম, ঠিক সময়ে ফিরে না এলে বাস চলে যাবে। সবাই সেকথা শুনেছে। নয় কী? তাহলে?

ইতিমধ্যে এক-দুজন করে আমাদের সহযাত্রীরা ফিরে আসছেন। সবাই বাসে উঠে পড়লেন। অমরেন্দ্রর কী হবে? আরেকটু অপেক্ষা করা যায় না এখানে? কাকে বলব সেকথা? গাইডের বেজার মুখ দেখে কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। জার্মানদলের এক মহিলা আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনার ক্যামেরা-কাঁধে বন্ধু কোথায়?

জার্মানি দলটাই চঞ্চল হয়ে উঠল। গাইডকে বলল, আমাদের চলে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে?

গাইড বলল, এছাড়া উপায় কী? এরপর লাঞ্চ পাওয়া যাবে না।

আমি চুপ করে আছি। মনের মধ্যে ঝড় উঠছে। একটা ছোট জনপদের কাছে আমাদের বাসের গতি একটু মন্থর হল। হঠাৎ এক জার্মান মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, ওই তো, ওই তো আপনার বন্ধু। বাস থামাও।

বাস থামল একটু এগিয়ে। কোথায় অমরেন্দ্র? তাকে দেখা যাচ্ছে না। জার্মান মহিলা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আমার মনে হল ওই দোকানের কাছে ভদ্রলোককে দেখেছি। হয়তো আর কেউ হবে।

আমরা আবার চলে যাব ঠিক হয়েছে, এমন সময় অমরেন্দ্রকে দেখা গেল। হেলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। মাথার টুপি নেই। বলল, দুটি মেয়ের দোকানে কী একটা রান্না হচ্ছে, আমাকে একটু দেবে বলে বসিয়ে রেখেছিল।

সে তো এখানে। তার আগে কোথায় ছিলে? কী হত তোমায় আমরা খুঁজে না পেলে?

অমরেন্দ্র বলল, রাস্তা হারিয়ে গিয়ে আবার পুরনো পথে ফিরে এসেছি। এই তো সেই গেট, আমরা এখান থেকেই রওনা হয়েছিলাম। আমি পুলিশকে বলেছি, আমাদের বাস খুঁজে বার করো। খালি মুশকিল হল, পুলিশ বিন্দুমাত্র ইংরিজি বোঝে না। পুলিশ নিশ্চয় আমাকে পৌঁছে দিত, কিন্তু হোটেলের নামটা আমার মনে নেই, কী বোঝাব? হোটেলকে বুড়ি-ছোঁয়া করে দশ মিনিটে বাসে উঠে পড়তে হয়েছিল। হোটেলের নাম দেখব কখন?

এ মানুষকে কিছু বোঝানো মুশকিল। আমি এর জন্য এত দুর্ভাবনা করছিলাম, আমার নিজের ওপরই রাগ হল। আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা লাঞ্চ খাবার জায়গায় পৌঁছে গেলাম। গাইড বলল, এইখানে আপনাদের লাঞ্চের আয়োজন হয়েছে। বুফে খেলে পয়সা দিতে হবে না। বাড়তি কিছু নিলে দাম নেবে।

গাইড তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা দুজন রেস্টরুম থেকে ফিরে এসে বুফের লাইনে যোগ দিলাম। বহু-প্রকারের সালাদ এবং দই-সঞ্জাত কয়েকরকম চাটনি। মাছ-মাংসের চরিত্র বুঝতে না পেরে ওদিকে গেলাম না। জল কিনতে হল। কিছু একটা সুস্বাদ মিষ্টান্ন ছিল। যথেষ্ট পরিমাণ ভোজন হল।

তিনটের আগেই বাস এসে গেল। গাইড বলল, এখন আমরা যাব আর্টেমিসের মন্দিরে। এই মন্দির মানুষের সৃষ্টি সুন্দর জিনিসের সেরা ছিল, পৃথিবীর সাত আশ্চর্যের অন্যতম। দেশ-বিদেশ থেকে মানুষ এই মন্দির দেখতে আসত। স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন কয়েকবার শত্রুর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু তার চিহ্নমাত্র পড়ে আছে।

আমরা বাস থেকে নামলাম। একটু নীচের দিকে নামতে হয়। ছোট এক আগাছা ভরা জলার ধারে একটি দীর্ঘ স্তম্ভ আর্টেমিসের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইতস্তত পড়ে থাকা স্থাপত্যের ভাঙা অংশ ছাড়া আর কিছু নেই।

গাইড বলল, আর্টেমিস গ্রিক দেবী। সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর ভগিনী। মৃগয়ার দেবী আর্টেমিসকে বন্য পশুপক্ষীর বন্ধু বলে মনে করা হত।

কিছুক্ষণ আমরা সেই স্তম্ভটি দেখলাম।

আর্টেমিসের আদি মন্দিরের ছবিও কোথাও দেখিনি। আমাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন হচ্ছিল কেমন ছিল সে মন্দির।

আবার গাইডের গলা শুনলাম, আর্টেমিস মন্দিরের সৌন্দর্যের একটি নিদর্শনই থেকে গিয়েছে। সেটি আর্টেমিসের মূর্তি। হায়, সে মূর্তিও এখানে নেই, স্বভাব-সুলভ দাক্ষিণ্যে ইংরেজরা সে মূর্তি এখান থেকে নিয়ে চলে গেছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।

আমরা ঘরপোড়া গরু, ইংরেজদের অনেক দাক্ষিণ্য পেয়েছি। বুঝতে অসুবিধা হল না, তুর্কিরাও ইংরেজ প্রভাব-মুক্ত হয়ে স্বস্তি পেয়েছে।

এবারে আমরা যাব যিশুমাতা মেরির বাসস্থান দেখতে। ছোট পাহাড়ের যে অংশে মা মেরির বাসস্থান, আমাদের লাঞ্চের জায়গা থেকে দূরে নয়। আধঘণ্টার কম সময়েই পৌঁছে গিয়েছিলাম। এখন খানিকটা পাহাড়ে উঠতে হল। পথের দুধারে পত্রবহুল বড় গাছ। মূল চত্বরের বাইরে যেখানে বাস দাঁড় করাতে হল, সেখান থেকে ছোট বাড়িটি দূরে নয়। পাথরের তৈরি নিরলংকার একটি বড় ঘর। ভেতরে মায়ের মূর্তি আছে। এই মূর্তি দেখবার জন্য, পূত জায়গায় এসে পবিত্র হবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে খ্রিস্টানরা আসেন। তাঁদের পরম তীর্থস্থান। সামনে নোটিস বোর্ডের লেখা পড়ে জানতে পারলাম যে যিশুমাতা শেষ জীবন এই কুটিরে কাটিয়েছেন, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ হবার পর যিশু বুঝতে পারেন তাঁর মার আর জেরুজালেমে বাস করা নিরাপদ হবে না। প্রিয় শিষ্য জনের হাতে মায়ের ভার তুলে দেন। জন যিশুজননীকে সঙ্গে নিয়ে এফেসুস-এ আসেন এবং পাহাড়ের ওপরের দিকে তাঁর জন্য একটি কুটির তৈরি করে দেন। মা মেরি এই কুটিরে শেষ জীবন কাটালেন। পরে এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পর্যটকেরা খ্রিস্ট-জননীর স্মৃতিপূত এই স্থানে এসে আর কলরব করছেন না। আরও কয়েকজন গাইড তাদের পর্যটকের দল নিয়ে এসেছে। সবাই অত্যন্ত নরম গলায় কথা বলছে। ধীরে ধীরে সবাই কুটিরে ঢুকছে, কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসছে।

অমরেন্দ্রকে প্রবেশপথেই আটকে দিয়েছিল। ক্যামেরা নিয়ে ভেতরে যাওয়া বারণ, ছবি তোলা নিষিদ্ধ। অমরেন্দ্র তো টেলিভিশনের জন্য ছবি তুলতেই এসেছে। শেষপর্যন্ত ওখানকার এক সন্ন্যাসিনীকে কী সব বুঝিয়ে অনুমতি পেয়েছিল। অল্পক্ষণের জন্য ভেতরে যেতে পারে। কারও যেন কোনও অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। ভেতরে কোনও মতেই ফ্লাশ জ্বালানো চলবে না।

গুটিকয় মিটমিটে আলো জ্বলছে সেই ঘরে। ছবি তোলার পক্ষে সম্পূর্ণ অকেজো আলো। তারই মধ্যে ছবি তোলা হল। ঘরের ভেতর মায়ের একটি মূর্তি আছে। মূর্তিটি অতি সুন্দর শিল্পকর্ম।

বাইরে বেরিয়ে বড় বড় গাছে ভরা স্থানটির মধ্যে শান্ত মন্দিরটি আবার ভালো করে দেখা গেল। আশপাশে দোকানপাট নেই, ফেরিওয়ালা নেই যে শান্তি বিঘ্নিত হবে।

সন্ধ্যার আগেই আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। তার আগে অন্যান্য যাত্রীদের নামাবার জন্য ট্যুর কোম্পানির অফিসে যেতে হয়েছিল। সেখানের আগামীকালের প্রোগ্রাম বুঝে নিলাম। অফিস থেকে রওনা হবার সময় দেখি আমাদের গাইড দাঁড়িয়ে আছে। সচরাচর গাইডকে কিছু বকশিশ করা রীতিসম্মত। আমরা এতই বিরক্ত এই অনিচ্ছুক গাইডের ওপর যে আমরা বকশিশ তো করলামই না, তাকে গুডবাই বলবার অবকাশ না দিয়ে চলে এসেছিলাম।

হোটেলটি বড়, কিন্তু বেশ খালি। রিসেপশনের মেয়েটি বলল, এবার আমাদের মনস্তাপের মাস চলছে। নইলে জুন মাসেই পর্যটকদের ভিড় হয়, হোটেল পুরো ভরে যায়, গমগম করে। নিউইয়র্কের এগারোই সেপ্টেম্বর, আর এবছর সার্সের ভয়ে যাত্রী আসছেন না।

তার দুঃখের কাহিনী না শুনে আমরা তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে যে যার শুয়ে পড়েছিলাম।

সারাদিন গরমে আর হাঁটাহাঁটিতে ক্লান্ত হয়েছিলাম। অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে বিছানার পাশে টেলিফোন বেজে উঠল। চমকেই গিয়েছিলাম। ওপাশে অমরেন্দ্রর গলা। বলল, একটু হাসপাতাল যাচ্ছি। মনে হচ্ছে বিশেষ কিছু হয়নি। তবু একবার ঘুরে আসাই ভালো। ডাক্তার আমাকে নিয়ে হসপিট্যাল যাচ্ছেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসব।

ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে আমার একটু সময় লাগল। মনে হল আমার অমরেন্দ্রর সঙ্গে যাওয়া উচিত। কিন্তু ততক্ষণে অমরেন্দ্র চলে গেছে। এবারে ক্রমশ ভাবনা বাড়তে লাগল। কী হয়েছে ওর? কত গুরুতর? এখনও ফিরছে না কেন? ঘুম আসতে চায় না। ঘড়ি দেখলাম রাত সাড়ে বারোটা।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল সকাল ছটায়। রিসেপশনে ফোন করলাম। মেয়েটি বলল, মিস্টার চকরবাটি হসপিটাল থেকে রাত দুটোয় ফিরেছেন। এখন নিশ্চয় ঘুমোচ্ছেন। তাঁকে ফোন দিতে বারণ করেছেন।

একটু আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু দুশ্চিন্তা ছাড়তে চায় না। জানি, ঘুম ভাঙলেই অমরেন্দ্র ফোন করবে। বেলা নটা পর্যন্ত ফোন এল না। আজ আমাদের দশটার সময় পামাক্কুলে দেখতে যাবার কথা। যাওয়াটা ক্যানসেল করতে হয়। অবশ্য ক্যানসেল না করলেই বা কী! অগ্রিম টাকা নিয়ে নিয়েছে। ফেরত তো দেবে না। এখন অমরেন্দ্র ভালো থাকলে হয়।

আমি দুনিয়ার সব দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে রিসেপশনের কাছে বসে আছি। যদি অমরেন্দ্রর ফোন আসে। হঠাৎ অমরেন্দ্র স্বয়ং এসে হাজির। আলুথালু চেহারায় শ্রান্তির ছাপ। তবু উঠে হেঁটে বেড়াতে পারছে দেখেই আমার অপার স্বস্তি হল।

অমরেন্দ্র যা বলল তার মর্মার্থ, ইসিজি করা হয়েছিল, কোনও দোষ পাওয়া যায়নি। কাল সারাদিন রোদে রোদে ঘোরার জন্যই অসুস্থ হয়েছিল। ডাক্তারের নির্দেশ আজকের দিনটা সম্পূর্ণ বিশ্রাম। এবং সারাদিন রোদে এরকম ঘুরে একটানা শুটিং করা একেবারে বারণ।

আমার আর একা একা পামাক্কুলে যাবার ইচ্ছা নেই। কিন্তু অমরেন্দ্র জেদ করতে থাকল। সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, আমার পামাক্কুলে দেখে আসা উচিত। শুধু শুধু বাড়িতে বসে থেকে কী হবে?

অগত্যা দশটায় বাস আসতেই আমি অনিচ্ছুক মনে উঠে পড়লাম। আজ সহযাত্রীরা অন্য দল। জাপানি এক স্বামী-স্ত্রীর যুগল, একজন কোরিয়ার বৌদ্ধভিক্ষু। আরেকজন তুর্কি মহিলা। এদের কেউই ইংরিজি বলতে পারেন না। মোটামুটি বুঝতে পারেন। আরও জনচারেক, তাঁরা একসঙ্গে এসেছেন, নিজেদের মধ্যেই সারাক্ষণ আবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হল না। হাসিমুখ যুবক গাইড বলল, আমরা যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এখন যাব সেটা আনাতোলিয়ার সম্ভবত সবথেকে সমৃদ্ধ অঞ্চল। এদিকটায় যেমন ফলের গাছ বেশি, ওদিকে তেমনই তামাক ও কাপাস তুলোর খেত বেশি দেখতে পাবেন।

কে না জানে তুরস্কের তুলো পৃথিবীখ্যাত। আর এখানের তামাকের তো তুলনা নেই। ভালো সিগারেট মানে টার্কিস টোবাকো।

গাইড ছেলেটি ভালো। আরও অনেক অজানা তথ্য জানিয়েছিল আমাদের। সব কথা মনে নেই, থাকেও না। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য গাইড ব্যাকুল। প্রশ্ন করবার যাত্রী নেই। চারজন তো নিজেদের মধ্যে মশগুল হয়ে আছে। বাকি কজন ইংরিজি বলতে পারে না। তুর্কি মহিলা নিজের ভাষায় প্রশ্ন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যেন এই মিশ্রদলে খুব স্বচ্ছন্দ নয়। তাঁর হয়তো প্রশ্ন করবার কিছু নেই।

মাঝে একবার থামা হল। যদি কারও কোথাও যাবার দরকার হয়। আমার ধূমপানের এই সুযোগ। সামনের দোকানে তাজা কমলালেবু থেকে রস বার করে দিচ্ছে গ্লাস ভরে। দাম এক ডলারের মতো। এক গ্লাস

কমলালেবুর রস পান করে স্নিগ্ধ হয়েছিলাম।

দুপাশে প্রচুর চাষ হয়েছে। প্রধানত তামাকপাতা এবং কাপাস তুলোর। বড় কিছু ফলের গাছও আছে পিছনে। দূরে ধূসর ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তারা সারের পর সার চলেছে। বাইরে চড়া রোদ, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাসে আমরা আরামে চলেছি। রাস্তায় যান চলাচল সামান্য। এত চাষবাস হচ্ছে, কিন্তু কোথাও কোনও কাজের লোক, চাষি বা মজুর দেখতে পাচ্ছি না। গাইডকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, এখন আমাদের বৃষ্টির কাল আসন্ন। দুয়েকবার বৃষ্টি হয়েও গিয়েছে। খেতে কোনও কাজ নেই এখন। ফসল তোলবার সময় কাজের লোকেরা আসবে।

গাইড বলল, এখন প্রায় একটা বাজে। আমরা আগে তাই লাঞ্চ খেয়ে নেব। লাঞ্চের পরে আপনারা পামাক্কুলের অপার্থিব দৃশ্য দেখবেন। সেখানে সাঁতার কাটতে পারেন, স্নান করবেন।

বড় রাস্তার ধারে আমরা একটা মাঝারি দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। নাম দেখলাম বুটিক হোটেল। বুটিক মানে বড় হোটেলের মতো বিশাল বিরাট কিছু নয়। সুন্দর করে সাজানো ছোট একটি হোটেল। ভারি মনোমতো স্থান। গাইড আমাদের নিয়ে গিয়ে বুফে টেবিলের বিবিধ খাবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

এখানে বোটি-কাবাব ধরনের একটা কাবাব ছিল। এরা বলে Kebap, Shish kebap। দই এবং তাহিনির চাটনি খুব ভালো লাগল। খাবার টেবিলে সবাই চুপচাপ খাচ্ছি, বিশেষ কথাবার্তা হচ্ছে না। কী করে হবে, অন্যপক্ষ তো ইংরিজি বলতে পারে না। আমি তুর্কি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি তুরস্কের কোন অঞ্চলের মানুষ? এদিকে আগে আসেননি? ভদ্রমহিলা উত্তর দিতে হিমসিম খেয়ে গেলেন। গাইড নিকটেই দাঁড়িয়েছিল। বলল, ইনি বলছেন, বছর দুই আগে ওঁর হাঁটুতে ব্যথা হয়েছিল। নিশ্চল হয়ে যাচ্ছিল। পামাক্কুলের প্রস্রবণে সাতদিন স্নান করে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছেন। তাই ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছেন।

কোরিয়ার ভিক্ষু বৌদ্ধগয়া সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি সম্প্রতি বুদ্ধগয়ায় তীর্থ করে এসেছেন। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন আমরা ধরতেই পারলাম না। তাঁর ইংরিজি উচ্চারণ আমাদের কাছে অবোধ্য। জাপানি দম্পতি নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিলেন, তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ হল না।

ভোজনান্তে সামান্য বিশ্রাম করে আমরা পামাক্কুলের দিকে রওনা হলাম। আর মাত্র আধঘণ্টার যাত্রা। ডানদিকে নাতিউচ্চ পাহাড়ের সারি দেখা গেল। খানিকটা কাছে আসতে মনে হল পাহাড়টা বুঝি শ্বেতপাথরের তৈরি। গাছপালা নেই। এবারে ডানদিকে মোড় নিয়ে পাহাড়ের আরও কাছে আসতে দেখা গেল শ্বেতপাথরের বড় বড় চৌবাচ্চার জল টলটল করছে। কয়েকটার মধ্যে মনে হল কিছু মানুষও নেমেছেন। মনে হল শ্বেতপাথরের তৈরি চৌবাচ্চাগুলি স্নানের জন্যই তৈরি হয়েছে। দূর থেকে তাই পাহাড়টাকে মনে হয়েছিল শ্বেতপাথরে মোড়া।

গাইড বলল ওগুলো শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চা নয়। বলা যায়, চুনাপাথরের। কয়েক হাজার বছর ধরে উষ্ণপ্রস্রবণের জল শীতল হয়েছে, তার খনিজ পদার্থগুলি জমে এই মর্মরের রূপ নিয়েছে। পাহাড়ের গভীরে কোথাও থেকে ক্যালসিয়ামপূর্ণ উষ্ণ জল প্রাকৃতিক নিয়মে ক্যালসিয়ামের আস্তরণ তৈরি করেছে। মাঝে মাঝে জল আটকে গিয়ে চৌবাচ্চার রূপ নিয়েছে। এই জলে অন্য খনিজ পদার্থও আছে। সেইজন্য অজ্ঞাত কোনও ভেষজ-গুণ আছে জলে। দেশ-দেশান্তর থেকে মানুষ এখানে চিকিৎসার জন্য আসেন।

ইতিমধ্যে আমরা পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করেছি। বাঁদিকে কিছু ভাঙাচোরা প্রাচীন নির্মাণ দেখা যাচ্ছে। রোমান শহর হিয়েরাপলিসের ভগ্নস্তূপ।

গাইড বলল, আপনারা পামাক্কুলেতে স্নানাদি সেরে এইখানে ফিরে আসতে পারেন। রোমান শহরের বৈভবের কিছু চিহ্ন দেখে চমৎকৃত হবেন।

আমরা যেখানে পৌঁছেছি, সেখানে গাড়ি রেখে হাঁটতে হবে। একটু এগিয়েই দূর থেকে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে উঁচু-নিচু বিভিন্ন স্তরে চৌবাচ্চাগুলি। ছোট-বড় নানা মাপের চৌবাচ্চা, কোনওটাতে মাত্র একজনের স্থান হয়, অনেকগুলিতে একাধিক মানুষ জলে শরীর ডুবিয়ে বসে আছে। একটু ওপরে উঠে একটি বড় মাপের জলাধার। সেখানে হয়তো শতাধিক মানুষ একযোগে স্নান করতে পারে। করছেও। নানা পোশাকে প্রায়-নগ্ন মানুষের ভিড়। বহু পর্যটক এসেছেন। কেউ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য, কেউ রূপচর্চা করছেন, কেউ চিকিৎসা। গাইড বলল, এই চৌবাচ্চাগুলি সব প্রকৃতির সৃষ্টি। মানুষের কোনও হাত নেই।

আরেকটু ওপরে উঠে আরও বড় একটি জলাধার। একপাশে বড় বড় গাছের ছায়া পড়েছে। অন্য পাশে পাঁচিল তোলা, বাইরে দেখা যায় না। পাঁচিলের এপারে ছোট ছোট খাবারের দোকান, বসে-খাবার ভোজনশালা। স্ত্রী-পুরুষের বস্ত্র-পরিবর্তনের জায়গাও এটা। একসার দরজাওলা স্নানঘর আছে। সেখানে পোশাক পরিবর্তন করা যায়। কজনই বা যাচ্ছেন সেখানে! কাউকে লজ্জা করবার স্থান নয়, সকলেই তো অর্ধ-নগ্ন, বরং তারও বেশি। টিকিট কেটে জলে নামতে হয়। তার আগে সবাই এখানে হ্রস্ব সুইমিং কস্টিউম পরে নিচ্ছেন।

গাইড বলল, আপনি জলে নামবেন না? আমি বললাম, আমি তো সাঁতারের পোশাক আনিনি। তাছাড়া আমার পায়ে ব্যথা।

গাইড উৎসাহ দিল, সেইজন্যই তো আপনার এই জলে স্নান করা উচিত। এই জলাধারটিই মূল উৎস। এখান থেকেই জল নীচের চৌবাচ্চাগুলিতে যাচ্ছে। আর জলে নামবার পোশাক? সে আমি এখনই এনে দিচ্ছি। সামান্য ভাড়া। এই জলে স্নান করলে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায়। তাছাড়া এই জল শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি করে। জানেন, স্বয়ং রানি ক্লিওপেট্রা এখানে স্নান করতে এসেছিলেন।

অনেক কষ্টে গাইডকে নিরস্ত করলাম। একা চেয়ার নিয়ে যেখানে বসেছি, সেখানেই সবাই পোশাক বদলাচ্ছে। দৃশ্যটা আদৌ সুখকর নয়। সবার শরীর তো দেখাবার মতো নয়, না দেখালেই ভালো হয়। পুরনো রক্তস্রোত চঞ্চল করে দিয়ে পোশাকহীন পোশাকে মাঝে মাঝে সুন্দরীদেরও দেখা যাচ্ছে। এখানে না এলে এমন পরীর হাট দেখা যেত না।

এটা বিশ্রামেরও স্থান। বোতলে ঠান্ডা পানীয় নিয়ে অনেকে ওই পোশাকেই বসে আছেন। আমি নিরুপায় শার্টপ্যান্ট পরে এই দেবশিশুদের হাটে মূর্তিমান রসভঙ্গ। জাপানিরা কোথাও চলে গিয়েছে। কোরিয়ান ভিক্ষুকে দেখেছিলাম ছোট চৌবাচ্চাগুলির দিকে যাচ্ছে। বাকিরা কে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

আমাদের গাইড আরেক গাইডের সঙ্গে ডোমিনো খেলছিল। বলল, আপনাকে কি কিছু পানীয় এনে দেব? অথবা, আহার্য কিছু? তাছাড়া হিয়েরোপলিস দেখতে যাবেন না?

আমার আর কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই। বেশ ক্লান্ত বোধ করছি। হঠাৎ অমরেন্দ্রর কথা মনে হল। ভালো আছে তো? হয়তো এখানে না এলেই ভালো হত। নাই বা হত পামাক্কুলে দেখা। দুশ্চিন্তা চেপে ধরল। সবে তিনটে বেজেছে। চারটের আগে এখান থেকে ওঠা হবে না, বলেছে গাইড। তারপর অন্তত আড়াই ঘণ্টার যাত্রা। দুশ্চিন্তা আমাকে অস্থির করে তুলেছিল।

হোটেলে ফিরতে প্রায় সাতটা বেজে গিয়েছিল। আড়াই-তিন ঘণ্টার পথ শেষ হবার ব্যাকুল অপেক্ষা করছিলাম।

হোটেলে নেমে সামনেই দেখি অমরেন্দ্র হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ভালো আছে, বলে দিতে হবে না। তখন মনে হল পামাক্কুলে না গেলে একটা বড় লোকসান হয়ে যেত।

প্রথম প্রকাশ 'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৩

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের স্টলে

স্টল নং ৩৫৬

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণবই
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা
কবির দেখা কবির লেখা
একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে
প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। **দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে**। ₹১২০

প্রতাপকুমার রায় ও হরপ্রসাদ মিত্রের
বহু দেশ ঘুরে
বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে দশ দিকের দশটি লেখা। ₹৬০

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

রবীন চক্রবর্তীর
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য। ₹৬০

ভ্রমণ ট্রেকিং
যাঁরা ট্রেকিং করবেন, এ বই তাঁদের পথ দেখাবে আর ট্রেকিং যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, বইটি তাঁদেরও পৌঁছে দেবে প্রকৃতির অমৃতলোকে। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
দ্বিতীয় মুদ্রণ। ₹১০০

নেকড়ের চোখ
বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়। মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন: মৈত্রেয়ী নাগ
দাম ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। ₹৩৫০
দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

কাজের বই
কোন মেশিনে কী ব্যবসা
শুধু মেশিন চিনে, মেশিন কিনে ব্যবসা করুন। কোন মেশিনে কী ব্যবসা, কীভাবে কী করবেন, কোন মেশিন কোথায় পাবেন, কত দাম ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৪০

বাংলা সমাস
শিশিরকুমার আচার্য
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অপরিহার্য। ₹৬০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই
তুতুল ₹২৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
বকবকম
পাতায় পাতায় মজার ছবি। ₹১৫

কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹২০
চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫

পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায়-ছবিতে
আমার ছেলেবেলা ₹১৮

পবিত্র সরকারের
কথামালা : ছড়ায় ঢালা ₹১৫

মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫
শাদা ঘোড়া
দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹৩০
আমাজনের জঙ্গলে
ষষ্ঠ মুদ্রণ। ₹৫০
হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
নবম মুদ্রণ। ₹৪৫
গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹৪০
টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত। ₹১৫
ঋষিকুমার ₹২০
পাখির খাতা ₹৪০
আমার বনবাস ₹১২
তালগাছের ডোঙা ₹২০
হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা
বোর্ড বাঁধাই। ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে
বোর্ড বাঁধাই। ₹৩০
নিমফুলের মধু
গল্পসংকলন। ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
২১ জন কবির ৪০টি বিখ্যাত কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা। ₹১৫০

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

মৃত্যু : জীবনের প্রথম পাঠ

পবিত্র সরকার

পর্ব : ১

এটি একজন স্বঘোষিত নাস্তিকের মৃত্যু সম্বন্ধে লেখা দীর্ঘরচনা, প্রায় রম্যরচনা ধরণের। 'মৃত্যু' কথাটার সঙ্গে 'রম্যরচনা' কথাটা যায় কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতেই পারে, কিন্তু যেহেতু মৃত্যু জীবনের একমাত্র ধ্রুব বাস্তব ঘটনা, আর সব ঘটনা, আমার জন্ম পর্যন্ত, সম্ভাবনামাত্র, অর্থাৎ তা নাও ঘটতে পারত, নেহাত কার্যকারণের যোগাযোগে ঘটে গিয়েছে, সেহেতু মৃত্যুকে নিয়ে সারা পৃথিবী হাজার হাজার বছর ধরে ভেবে এসেছে। আমি এক তুচ্ছ মানুষ, যাকে আর কদিন পরে ওই অমোঘ বাস্তবে লীন হতে হবে, আমারও কিছু মূল্যহীন আবোলতাবোল চিন্তা করার অধিকারই বা থাকবে না কেন? মৃত্যু তো আমারও উপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলা যায়, আর সকলেরই মতো।

'নাস্তিক' কথাটাতে যাঁদের আপত্তি আছে আর নাস্তিকতা বিষয়টাতে অনুমোদন নেই, তাঁরা এ লেখা পড়বেন কিনা তা নিয়ে নিশ্চয় নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবেন। সেটা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তবে নাস্তিক লেখকের দুর্বল অবস্থানে দাঁড়িয়ে আমি অনুরোধ করব পড়ে দেখতে, বা অন্তত দু-এক পৃষ্ঠায় চোখ বোলাতে। যদি এগোতে ইচ্ছে না হয় এগোবেন না। না হয় এটাকে উপন্যাসের মতো ভেবেই পড়লেন বিশ্বাসীরা। যদিও আমি এমন দাবি করছি না যে এ লেখা উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য হয়েছে।

প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার এই রচনাটি বাংলাভাষায় মৃত্যু সম্বন্ধে প্রথম লেখা হতে যাচ্ছে। কিন্তু সব অহংকারেরই তো ওষুধ আছে। সম্প্রতি বন্ধুবর মনসুর মুসার মুখ থেকে জেনেছি, তিনি বাংলা অকাদেমির (ঢাকার) মহাপরিচালক থাকার সময়ে হল্যান্ডের Vrije University থেকে প্রকাশিত একটি মৃত্যু-বিষয়ক বইয়ের বাংলা অনুবাদ করিয়েছিলেন, ২০০৪ সালে এবং আরও সুখের কথা, তা মৃত্যু সম্বন্ধে দ্বিতীয় বইও নয়। শ্রীবিজয়কুমার দত্তও লিখেছেন মৃত্যু সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগর্ভ ও দরদভরা বই, 'মৃত্যু ও মৃত্যুচেতনা', ২০০৯ সালে। পুনশ্চ তা প্রকাশ করেছে। শুনে ভালো লাগল যে, মৃত্যু বিষয়েও বাঙালিরা লেখা ও প্রকাশনার কথা আগেই ভেবেছেন। আমার প্রাথমিকতার দাবি এইভাবে অলীক হয়ে গেল, শুধু ক্ষীণ আশা জেগে রইল যে, আমার লেখাটি একটু অন্যরকম হবে। পাঠকরাই সেটা বলবেন, যদি এ লেখার পাঠক জোটে।

আমার জন্মদাতার মৃত্যু হয়েছিল আটচল্লিশ বছর বয়সে, আমি শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে চুয়াত্তরে পৌঁছে গিয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি মরার ইচ্ছে বা পরিকল্পনা নেই। আমার আত্মজীবনী 'অল্প পুঁজির জীবন'-এ আমি লিখেছি (জানুয়ারি ২০১২ থেকে 'নন্দন' পত্রিকায় প্রকাশমান) যে, এখনও আমি প্রত্যেকটি সকালের দিকে আশা নিয়ে তাকাই, এখনও আমার জীবনের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার, এবং বিনিময়ে জীবনকে কিছু দেওয়ার, আছে বলে বিশ্বাস করি। তাই মৃত্যু নিয়ে লেখা মৃত্যুভয় তাড়ানোর মহড়া নয়, বরং ঘটনাটার দিকে সাদা চোখে তাকিয়ে দেখা। আমার মতো করে।

যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা আমার এ বইয়ে আমার নানা কথার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে পদে পদে ভিন্নমত হবেন তা আমি জানি। তাঁদের বিশ্বাসকে আমি সম্মান করি, কিন্তু তা আমার বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে নয়। আমি মনে করি, আমার বিশ্বাস

স্তূপে স্তূপে জমে আছে অসংখ্য হাতির কঙ্কাল— নির্মম সাদা কঙ্কালের রাশি। যেন প্রাগৈতিহাসিক সব জীবনের সব ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে, উজ্জ্বল রৌদ্রে ঝলসে যাওয়া সব হাড়গোড়। ঘোষক জানালেন, ওইটি আফ্রিকার এই অরণ্যে হাতিদের স্বেচ্ছাশ্মশানভূমি।

যুক্তির হাত ধরে চলে। এই সঙ্গে বলি, নাস্তিক হলেও আমি গভীরভাবে জীবন এবং মানুষকে ভালোবাসি, মানুষের পৃথিবীতে আকস্মিক যোগাযোগে জন্ম নিতে পেরেছি বলে আমি প্রাকৃতিক কার্যকারণের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, যদিও জানি যে, প্রকৃতির কাছে এ কৃতজ্ঞতার কোনও অর্থ নেই।

এই জীবনে যে এতদূর টেনে-হিঁচড়ে পৌঁছে গেলাম, তার পিছনে নানা আকস্মিকতার অবদান আছে, আছে আমার নিজের এবং আত্মজনদের চেষ্টা ও কৃতিত্ব। তাছাড়াও আছে অনেক ডাক্তারের নানারকমের হাতযশ। আমার শরীরটাকে নিয়ে তাঁরা নানারকম কারিগরি করবার সুযোগ পেয়েছেন, তার ফলেই নিশ্চয় আমি এখনও বসে হাঁটতে, চলতে, কথা বলতে, চ্যাঁচাতে, প্রিয়জনদের দুঃখ দিতে এবং কম্পিউটারের চাবি টিপতে পারছি। সেইসব চিকিৎসকদের প্রতি ঋণস্বীকার করে আমার এ লেখা তাঁদের উৎসর্গ করছি।

মৃত্যু সম্বন্ধে সাধারণ বিবেচনা

অক্সফোর্ডের কনসাইজ মেডিক্যাল ডিকশনারিতে (ষষ্ঠ সংস্করণ) মৃত্যুর অর্থ দেওয়া আছে দুটি: Absence of vital functions এবং Death is diagnosed by permanent cessation of the heartbeat। এরপরেই 'ব্রেন ডেথ'-এর কথাটাও বলা হয়েছে, যেক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড তার কাজ করে চলে, মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয় না, কিন্তু মস্তিষ্কের ওই যান্ত্রিক কাজগুলি চলে মাত্র, তার আর বিশেষ কোনও সক্রিয়তা থাকে না। মানুষের দৃষ্টি, বাক, গন্ধগ্রহণ, চেতনা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা— এসবের কোনও বোধই থাকে না। চেতনাহীন হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে শায়িত বৃক্ষের মতো শুধু বেঁচে থাকে মানুষ। আমাদের চেনা জগতের অনেকে এভাবে বেঁচে ছিলেন বা আছেন। মর্মান্তিক এই বেঁচে থাকা। আসল মৃত্যুর সঙ্গে এর তফাত হল, আসল মৃত্যুর পরে শরীরে পর পর এই প্রক্রিয়াগুলি ঘটে: দেহের জীবন্ত রং মুছে গিয়ে একটা ফ্যাকাশে রং এসে যায়, রক্ত গিয়ে শরীরের তলার দিকে জমে, যার নাম 'লিভর মর্টিস', শরীরের তাপ নেমে যায় (অ্যালগর মর্টিস), তারপরে শরীরের হাড়ের গ্রন্থিগুলি শক্ত হয়ে আটকে যায় (রাইগার মর্টিস) এবং শেষে পচন ও ক্ষয়ের স্বাভাবিক রাসায়নিক বিকৃতি আরম্ভ হয়, প্রাণী ও উদ্ভিদ দুয়ের ক্ষেত্রেই যা অবশ্যম্ভাবী। ফলে মৃত্যুকে শেষ পর্যন্ত "irreversible cessation of electrical activity in the whole brain" অর্থাৎ সমগ্র মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক সক্রিয়তার চূড়ান্ত সমাপ্তি বলে গণ্য করা হয়। ইন্টারনেটে উইকিপিডিয়া থেকে এই সংজ্ঞা পেয়েছি।

মৃত্যু যখন তাঁর এল, ডাক্তার জবাব দিয়ে গেলেন, তখন তাঁকে বারান্দায় এনে শোয়ানো হল, আকাশের কাছাকাছি, মাথার কাছে একটি তুলসীগাছের টব রাখা হল। আর আমি তাঁর কিশোর নাতি মায়ের আদেশমতো গীতা পড়তে শুরু করে দিলাম।

মানুষের শারীরিক মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের কোনও মৌলিক কথা বলার ক্ষমতা নেই। তাই ওপরে ওই পড়ে-পাওয়া সংবাদগুলিই সাজিয়ে দেওয়া হল।

মানুষের বেলায় মৃত্যু একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কিংবা অর্ধ-অভিজ্ঞতা, মৃত্যু নামক ঘটনাটা তার দেহে ঠিক কখন, একেবারে নির্ভুল কোন মুহূর্তে ঘটছে তা সম্ভবত ব্যক্তি বুঝতে পারে না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত'- তে সর্বজয়ার মৃত্যুর একটা বর্ণনা এখন মনে পড়ছে, তাতে সর্বজয়া নিজের একাকিত্বের মধ্যে মৃত্যুর আসন্নতা কীভাবে অনুভব করেছিল তা আপনারা পড়ে নিতে পারেন। কিন্তু তা সাহিত্য মাত্র, একটিমাত্র অভিজ্ঞতার কল্পনা। মৃত্যুর বৈচিত্র্য এত বহুমুখী ও ভিন্ন ভিন্ন যে তার তালিকা করে শেষ করা যাবে না, তা আপনারাও জানেন। চলচ্চিত্রে, নাটকে, কথাসাহিত্যে এরকম হাজারও মৃত্যুর দৃশ্য আপনারা দেখেছেন, প্রসঙ্গ আপনারা পড়েছেন। মৃতের কথা তাই ছেড়েই দিই। অন্যরা অনেক সময়, মৃত্যুর মুহূর্তেই তা দেখে, পরে তো দেখেই এবং সেই হেতু তা একটি পারিবারিক-সামাজিক অভিজ্ঞতাও বটে। আমি যেমন কিশোরবয়সে আমার ঠাকুমার মৃত্যু দেখেছিলাম। তাঁর একশোর কাছাকাছি বয়স হয়েছিল, তিন পুত্র, এক নাতি এবং জামাইয়ের মৃত্যু তিনি দেখেছিলেন। তবু অদম্য ছিল তাঁর জীবনীশক্তি। শেষে বিধবা মেয়েদের আশ্রয়ে মৃত্যু যখন তাঁর এল, ডাক্তার জবাব দিয়ে গেলেন, তখন তাঁকে বারান্দায় এনে শোয়ানো হল, আকাশের কাছাকাছি, মাথার কাছে একটি তুলসীগাছের টব রাখা হল। আর আমি তাঁর কিশোর নাতি মায়ের আদেশমতো গীতা পড়তে শুরু করে দিলাম। কতটা পড়েছিলাম মনে নেই, খুব অনেকটা নয়, দেখলাম তাঁর চোখদুটি একসময় আস্তে আস্তে বুজে এল, আর দু-চোখের দুই কোণ দিয়ে দু-ফোঁটা জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

আমি অবশ্য হলফ করে বলতে পারব না সেই তাঁর মৃত্যুর মুহূর্ত কিনা। কিন্তু পারিবারিক ও চারপাশের জমা হওয়া লোকজন গোষ্ঠীগত ভাবে আমরা তা লক্ষ করলাম। এবার তাঁর দেহ সৎকারে নিয়ে যাওয়া হবে। এ সবই সামাজিক অভিজ্ঞতা। আর সামাজিক অভিজ্ঞতা হলেই তা হয়ে উঠবে এক সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, যার কথা আমাদের পরে আরও বলতে হবে। আর সেই সঙ্গে মৃত্যু হল এক বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা, কারণ পৃথিবীতে যে প্রাণ নিয়ে এসেছে কখনও না কখনও তার মৃত্যু হবেই হবে। জীবনে এই একটি কথা অন্তত সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে বলতে পারা যায়। আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলি, আর সমস্ত ঘটনা, এমনকি জন্মও সম্ভাবনা মাত্র, কিন্তু মৃত্যু একমাত্র অবশ্যম্ভাবী বাস্তব।

প্রাণের সক্রিয়তার অভাব, কিংবা হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাওয়া— এসব অর্থ অবশ্য সমস্ত প্রাণীর মৃত্যু সম্বন্ধে একটা সাধারণ সত্য। অবশ্যই মশামাছি, কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে 'হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি' কথাটা একই অর্থে খাটবে না, মানুষ ও বৃহৎ প্রাণীদের সম্বন্ধে যতটা খাটবে। অন্য প্রাণীদের মৃত্যু ব্যাপক অর্থে মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতাও নয়, যদি না তারা মানুষের সমাজের অংশ হয়ে থাকে।

সব প্রাণীরই মৃত্যু হয়। দেখলাম একটিমাত্র প্রাণী এর ব্যতিক্রম, সেটি একধরণের জেলিফিশ, নাম Turritopsis Nutricula। তারা নাকি মরেই না। তাদের অভিনন্দন জানাই। কিন্তু ওই বিশেষ জেলিফিশের সঙ্গে আমাদের অস্তিত্ব ও জীবনের বিনিময় হওয়ার যখন কোনও সম্ভাবনা নেই, তাদের কথা বাদ দিয়েই দেখি, মৃত্যু এড়াতে পারে এমন প্রাণী আর নেই। তবে মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীরা মৃত্যু সম্বন্ধে কী বোঝে তা আমি জানি না। তারা শারীরিক যন্ত্রণা নিশ্চয়ই বোঝে। চোখের সামনে পাঁঠা বা মুরগি কাটতে দেখি (ছেলেবেলায় নিজেও বহু মুরগি কেটেছি), তখন তাদের মর্মান্তিক শারীরবিক্ষেপ আমরা অনেকেই লক্ষ করেছি। অবশ্যই তখন ব্যাপারটা তেমন গ্রাহ্য করিনি, এখনও করি না। আঘাত পেলে চেনাশোনা সমস্ত প্রাণীই আর্তনাদ করে। কীটপতঙ্গ প্রচুর মারা পড়ে আমাদের হাতে, কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে তাদের কোনও স্পষ্ট বোধ সম্ভবত নেই।

হয়তো ব্যতিক্রম আছে। যেমন হাতিদের সমাজে। প্রায় বছর চল্লিশেক আগে মার্কিনদেশে হাতিদের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি অসামান্য তথ্যচিত্র

শ্মশানভূমিতে মৃত্যুপথযাত্রী। গৌতম ঘোষ পরিচালিত 'অন্তর্জলী যাত্রা' ছবির একটি দৃশ্য

ভারতীয় ঐতিহ্যে তো মৃত্যুপথযাত্রীর গঙ্গাযাত্রার সূত্র আছে, আছে মুমূর্ষুকে তুলসীতলায় নিয়ে শুইয়ে রাখার স্মৃতি। কিন্তু সেখানে কতজন স্বেচ্ছায় যেতে চাইত সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নেই।

দেখেছিলাম সেখানকার এক টেলিভিশন চ্যানেলে। দলের সবচেয়ে প্রবীণ হাতি, সম্ভবত সে একসময় সর্দার ছিল সেই দলের, বুঝতে পেরেছে যে, তার মৃত্যুর মুহূর্ত খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। হাতিরা, হয়তো আরও কোনও কোনও প্রাণী কী করে যে মৃত্যুর আগমন টের পায় সে কথা প্রাণীবিশারদরা বলতে পারবেন। আমি আর আমার স্ত্রী সে সন্ধ্যায় ছিলাম নিছক দর্শক, প্রাণীজগতের এক মর্মন্তুদ নাটকের।

আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হল এক অভাবিত দৃশ্য। বৃদ্ধ সর্দার হাতি ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে, তাকে সামনে নিয়ে এগিয়ে চলেছে হাতিদের পুরো দল, বৃহৎ ক্ষুদ্র সকলেই। বড়দের মাঝখানে মাঝখানে চলেছে ছোটরা। ছোটদের স্বাভাবিক চাপল্যও যেন স্তব্ধ সেই পঁচিশ-তিরিশটি হাতির দীর্ঘ শোভাযাত্রায়। একপাশে পাহাড়ের ঢাল নেমে এসেছে, তারপরেই উপত্যকা। এ দুয়ের মাঝখান দিয়ে পথ। পথ গিয়ে শেষ হয়েছে এক নদীর ধারে। তারও ওপারে অরণ্য আর নীল পাহাড়ের সারি।

ক্যামেরা মুহূর্তে হাতির শোভাযাত্রা থেকে দুলে উঠে সরে গেল, এদিককার পাহাড়ের সীমানা পার হয়ে নদীর পাশে একটা মাঠে নজর ফেলল। এ মাঠটা এতক্ষণ পাহাড়ের আড়ালে ছিল। আমরা বিমূঢ় হয়ে দেখলাম সে মাঠটা জুড়ে স্তূপে স্তূপে জমে আছে অসংখ্য হাতির কঙ্কাল— নির্মম সাদা কঙ্কালের রাশি। যেন প্রাগৈতিহাসিক সব জীবনের সব ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে, উজ্জ্বল রৌদ্রে ঝলসে যাওয়া সব হাড়গোড়। ঘোষক জানালেন, ওইটি আফ্রিকার এই অরণ্যে হাতিদের স্বেচ্ছাশ্মশানভূমি।

জীবনের শেষ মুহূর্ত এগিয়ে আসছে বুঝতে পারলে, ওরা বুঝতে পারে, বৃদ্ধ হাতিরা ওইখানে গিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। তারপর সেই সাদা হাড়গোড়ের স্তূপের মধ্যে একসময় মরে যায়। কখন তার মৃত্যু আসে তা লক্ষ করার জন্য কেউ উপস্থিত থাকে না। একসময় তার দেহও সাদা হাড়গোড় হয়ে রৌদ্রে ঝকঝক করতে থাকে।

মৃত্যুর আগে সে আর কিছু খায় না, জল মুখে নেয় না, যেন সে ক্ষুধাতৃষ্ণাকামনার সীমা পার হয়ে যায়, মৃত্যুর উদাসীন জগতে নিজেকে নিক্ষেপ করে। আমরা সাধারণ মানুষ জানি না, বুঝি না, কী করে এটা সম্ভব হয়, কী করে হাতি এত স্থৈর্য ও অনাসক্তি নিয়ে, জীবনের সমস্ত প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে। না, তাই বা বলি কেমন করে? ভারতীয় ঐতিহ্যে তো মৃত্যুপথযাত্রীর গঙ্গাযাত্রার সূত্র আছে, আছে মুমূর্ষুকে তুলসীতলায় নিয়ে শুইয়ে রাখার স্মৃতি। কিন্তু সেখানে কতজন স্বেচ্ছায় যেতে চাইত সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নেই। প্রায়োপবেশন ইত্যাদিতে স্বেচ্ছামৃত্যুর কথাও আছে অবশ্য, দধীচির গল্প তো আমরা সবাই জানি।

ওই বৃদ্ধ হাতিদের মৌলিক অর্থে 'মুমূর্ষু'ই বলা যায়, কারণ এ মৃত্যু তাদের স্বেচ্ছাবরণ। আমরা শুনলাম, যাঁরা প্রাণ হাতে করে, কখনও হেলিকপ্টারে, কখনও পাহাড়ের চুড়োয়, কখনও মস্ত উঁচু গাছের মগডালে নিজেদের বেঁধে লুকিয়ে এই ছবি তুলেছিলেন তাঁদের মুখে, ঘটনা একেবারে হুবহু তাই। তাঁরা গল্প বানাননি, রোমান্টিকতায় মুড়ে দেননি এই ছবিটিকে। কিন্তু তাঁদের সুনিপুণ চিত্রণে এই মহৎ বেদনাময় আখ্যানটি যেন নিজেই নিজেকে রচনা করতে করতে আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হচ্ছিল।

পাহাড়ের সারির শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে যেতে দলটি হঠাৎ একজায়গায় থমকে দাঁড়াল। বৃদ্ধ হাতিটি যেন শুঁড় তুলে তাদের বারণ করল, 'থামো, তোমরা আর এগিয়ো না'। তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

এবার বৃদ্ধ হাতিটি একা এগিয়ে যাবে বাকি পথটুকু। সে আর একবার শুঁড় তুলে সামনের দুয়েকটি হাতিকে আলতোভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল, যেন আদর করে দিচ্ছে তাদের, তারপর একবার তীব্রস্বরে বৃংহিত করল। সেটা কি আমাদের কানে কান্নার মতো শোনাল? তার চোখে কি জল ছিল?

দল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধ হাতিটি মন্থর গতিতে এগিয়ে গেল, পাহাড়সীমার প্রান্তে গিয়ে আরেকবার শুঁড় তুলে বৃংহণে ফুকরে উঠল।

তারপর ধীরে ধীরে তার পূর্বপুরুষদের কঙ্কালস্তূপের একপ্রান্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

জানি না তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা কতদিনের হবে। যত দিনেরই হোক, যত সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘই

হোক তা, মৃত্যু যে মৃত্যুই, প্রাণময় অস্তিত্বের চূড়ান্ত খণ্ডন, মানুষ ছাড়া এ প্রাণীজগতে অন্তত আরও একটি-দুটি প্রাণী তা নিশ্চয়ই বোঝে। সেই বিষয়টা দেখেই আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম। চল্লিশ বছর পরেও আমাদের বিস্ময় কাটেনি।

তবু মানুষের কাছে মৃত্যুর যে অর্থ তা সম্ভবত আর কোনও প্রাণীর কাছেই তেমনভাবে ধরা পড়েনি। অর্থ নির্ভর করে ভাষার ওপর, আর মানুষ ছাড়া আর কোনও প্রাণীর ভাষা নেই, ফলে তাদের চিন্তায় বিস্তারও নেই, সূক্ষ্মতাও নেই। মৃত্যুর এ অর্থ ভয়, রহস্য, স্বপ্ন, কল্পনা (কারও কাছে কি আশা?) সব মিশিয়ে এক বহুজটিল বোধ। ভয় হয়তো প্রাণীদেরও আছে, আছে বেদনা ও শোক। কিন্তু তাদের কল্পনা আর স্বপ্নের সুযোগ যৎসামান্য, কারণ তাদের ভাষা নেই। ভাষাই স্বপ্নের ভিত্তি, ভাষাই কল্পনার বাহন, ভাষাই তাদের স্মৃতিকে সঞ্চিত রাখে, ভাষাই তাদের কাছে সম্ভাবনার নানা ছবি নির্মাণ করে, আবার ভাষাই স্মৃতিকে এনে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করে। মৃত্যুর পরে মানুষ যেমন ভাষায় চিৎকার করে কাঁদে, গোঙরানো, মাথা বা বুক চাপড়ানোর সঙ্গে ভাঙাচোরা ভাষায় আর্তি জানায়, তেমনই ভাষাতেই আবার দূরবর্তী কিন্তু নিসর্গ ও জীবনের নানা অমোঘ মৃত্যুর কথা এমন সমাহিত বেদনায় প্রকাশ করতে পারে জীবনানন্দের মতো—

কখন মরণ আসে কে বা জানে— কালীদহে কখন যে ঝড়

কমলের নাল ভাঙে— ছিঁড়ে ফেলে গাঙচিল শালিকের প্রাণ

জানিনেকো;— তবু যেন মরি আমি এই মাঠঘাটের ভিতর,

কৃষ্ণা-যমুনায় নয়— যেন এই গাঙুরের ঢেউয়ের আঘ্রাণ

লেগে থাকে চোখে মুখে— রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর

জেগে থাকে; তারই নীচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।

ফলে মানুষের মৃত্যুকে দেখা অনেক জটিল দেখা, তার মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবনারও অগাধ বৈচিত্র্য। আমরা সেই ভাবনা, কল্পনা, অলীক নানা নির্মাণের এবং সেসবের সাহায্যে তৈরি এক ব্যাপক আত্মসান্ত্বনা-প্রকল্পের একটু পরিচয় নিতে চাই। এ লেখা কোনও গবেষণাপত্র নয়, নয় কোনও দার্শনিক তত্ত্বস্থাপনের প্রয়াস। মৃত্যুকে নিয়ে দুয়ের কোনওটিতে ঝাঁপ দেওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমরা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন (মধ্যমেধাসম্পন্নও বলা যেতে পারে)। এক বাঙালির চোখে মৃত্যু কীভাবে প্রতিভাত হতে পারে তারই এক চিত্রনাট্য রচনা করবার চেষ্টা করেছি। এতে কোনও বৈপ্লবিক

শিশুমৃত্যুর দেশে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে দিতে, সামাজিক ছক মেনে 'বড় হওয়া'-না-হওয়ার সরু গলিতে পা ফেলতে ফেলতে, সুযোগ নষ্ট করে, সুযোগ আঁকড়ে ধরে, ভালোবাসা পেয়ে, বিদ্বেষ ও শত্রুতার আঁচ নিতে নিতে, যেখানেই আজ দাঁড়াই না কেন— শেষে যে মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে সে আমি জানি।

আবিষ্কার নেই, নেই কোনও যুগান্তকারী সত্যপ্রতিষ্ঠা। আছে শুধু সন্ধান, কোনও প্রাপ্তির দাবি নেই।

এও ঠিক যে, সব মৃত্যু জীবনের পূর্ণতা হিসেবে, প্রাকৃতিক বৃত্ত সমাপ্ত করে, সুবিচার হিসেবে আসে না। আমার তরুণ বয়সের ছাত্রছাত্রীরা কত চলে গিয়েছে, কেউ ক্যান্সারে, কেউ মস্তিষ্কের অজানা গ্রন্থিল ব্যাধিতে, সেদিন ছাত্র জয়দেব বসু চলে গেল অপরিকল্পিতভাবে মৃত্যুর সঙ্গে টক্কর দিতে দিতে; তার বয়স পঞ্চাশ হওয়ার জন্যও অপেক্ষা করল না। আত্মীয়দের মধ্যে কেউ পঁয়তাল্লিশ না পেরতেই দুটি শিশুসন্তান আর তরুণী স্ত্রীকে ছেড়ে শ্মশানে গিয়েছে, মৃত্যুর আগে তার প্রিয় খাবার খাওয়ার ইচ্ছেটাও পূরণ করে যেতে পারেনি ডাক্তারের নিষেধে। কখনও কখনও এইসব অকাল ও অনুচিত মৃত্যুর সামনে অসহায় বোধ করি, তুলনায় দীর্ঘজীবন পেয়েছি বলে অপরাধবোধও হয়। সেদিন পাড়ার এক ভদ্রমহিলা, সকালে নিয়মিত হাঁটেন, সন্ধেয় কালীমন্দিরে গিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে আড্ডা দেন, বললেন, 'আমি চমৎকার আছি, কোনও সমস্যা নেই শরীরে বা মনে'। কী একটা দেখাতে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন, ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন। রক্ত পরীক্ষার পর দেখে বললেন, লিউকোমিয়ার শেষ অবস্থা, আর একমাসও নয়। সত্যি একমাসও কাটল না ভদ্রমহিলার।

এরকম নানা মৃত্যু নানা সময়ে আমাদের প্রত্যেককেই কমবেশি কাঁপিয়ে দিয়েছে।

এ নিয়ে অভিযোগ করে লাভ নেই। মানুষের তৈরি অন্যায়-অবিচার নিয়ে অভিযোগ করতে পারি, তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি, কিন্তু মৃত্যুবাহী দুর্ঘটনা, ক্যান্সারের মতো রাজব্যাধি, আরও নানা আপৎপাত, তার বিরুদ্ধে এখনও আমাদের হাতে কোনও শক্তিশালী অস্ত্র আসেনি।

এ লেখক যেহেতু নাস্তিক, সে পূর্বজন্ম, পরজন্ম, ভগবান, ভূত, জ্যোতিষ বা গুরুদেবদের অলৌকিক ক্ষমতা কিছুতেই বিশ্বাস করে না, সে মৃত্যুকে জীবনের একমাত্র সুনিশ্চিত ভবিতব্য বলে মনে করে। আগেও বলেছি, আমাদের জন্ম এবং জীবনের আরও অনেক ঘটনা আকস্মিক ঘটনামাত্র। আমার জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীর শরীরের যে রাসায়নিক যোগাযোগের ফলে আমি শেষের মানুষটির গর্ভে এলাম এবং আমার জন্ম হল, সে যোগাযোগ না হতে পারত, হলেও আমি শরীর না পেতে পারতাম, আবার শরীর পেলেও নষ্ট ভ্রূণ হিসেবে নির্গত হতে পারতাম। কতই না অন্যরকম সম্ভাবনার শিকার হতে পারতাম ওই তথাকথিত দশমাস দশদিনের মধ্যে। কিন্তু একটি আকস্মিক পরিসংখ্যানগত সম্ভাবনা হঠাৎ বাস্তব হল, আমি নামক প্রাণসত্তা পৃথিবীতে এল। তবে আমার জীবন কীভাবে ধাপে ধাপে এগোবে, তার কোন রাস্তায় কী পরিণতি আসবে— সবই নানা আকস্মিকতার সূত্রে গাঁথা। হতে-পারে আর না-হতে-পারের সূক্ষ্ম ক্ষুরের ফলার ওপর দিয়ে হেঁটে আমার এক-পা দু-পা করে এগিয়ে যাওয়া, এতদূর আসা। শিশুমৃত্যুর দেশে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে দিতে, সামাজিক ছক মেনে 'বড় হওয়া'-না-হওয়ার সরু গলিতে পা ফেলতে ফেলতে, সুযোগ নষ্ট করে, সুযোগ আঁকড়ে ধরে, ভালোবাসা পেয়ে, বিদ্বেষ ও শত্রুতার আঁচ নিতে নিতে, যেখানেই আজ দাঁড়াই না কেন— শেষে যে মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে সে আমি জানি। 'একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ, পড়িবে নয়ন 'পরে অন্তিম নিমেষ।' এও জানি যে, যেভাবে বলছি, ব্যাপারটা এত শান্ত-শোভন নাও হতে পারে, কোনও দুর্ঘটনাতে থেঁতলে যেতে পারে শরীর, দীর্ঘ ভয়াবহ রোগযন্ত্রণা ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেতে পারে শরীর, কিংবা হঠাৎ কোনও বিস্ফোরণে চূর্ণ হয়ে যাওয়াই বা অসম্ভব কী? পাঠকের কাছে নিজের সম্ভাব্য পরিসমাপ্তি নিয়ে এই অতিনাটকীয়তার জন্য ক্ষমা চেয়ে বলি, যেভাবেই হোক সে মৃত্যু, একথা থেকে যাবে যে, জীবনে বহু বহু ঘটনা নিছক সম্ভাবনামাত্র, সেসব আমাদের বহু ভালো-মন্দ পছন্দ-অপছন্দের একটিমাত্র বিকল্প। মৃত্যুর সময়, ধরণ, উপলক্ষ, কিছুই আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট নয়। আমি কখনওই

আত্মহত্যা করার কথা ভাবি না, কাজেই আমার পছন্দসই বা নিরুপায় পছন্দের মৃত্যু আমি নিজের জন্য বেছে নেব না।

কিন্তু আবার বা বারবার বলি, আরও হয়তো বারবার বলব, যা ধ্রুব ও অমোঘ, যা অকাট্য, সুনির্দিষ্ট, তা হল জীবের মৃত্যু। তার আর একটিও বিকল্প নেই, তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনও গলি নেই, তাকে ফাঁকি দেওয়ার কোনও পিছনের দরজা নেই। সে যখন আসবে তখন তাকে আর অপেক্ষা করতে বলা যাবে না। ইংগমার বেয়ারিম্যানের ছবির মতো দাবার চাল দিয়ে তাকে যতই থমকে আটকে রাখার চেষ্টা করি না কেন, শেষ জয়টা সে-ই ছিনিয়ে নেবে। সেইজন্য তাকে একটু বুঝে নিতে চাই।

২

আগে একটু বাঁচার কথা বলি

মৃত্যুর কথা বলার আগে জীবনের কথা একটু বলে নিই।

এ জীবন যে পেয়েছি, এবং বাঁচতে বাঁচতে যে চুয়াত্তর বছর পর্যন্ত এসেছি, তার জন্য একেবারে গোড়ায় শিশু আমার কোনও পরিকল্পনা করার ক্ষমতা ছিল না। তারপরেও কীভাবে বাঁচব, এ নিয়ে মনের মধ্যে দীর্ঘদিন কোনও প্রশ্নই জাগেনি। সবাই যেভাবে বাঁচে, সেইভাবে বাঁচব, আবার কী? অত ভাবাভাবির কী আছে? ভাবাবার জন্য কেউ এগিয়েও আসেনি। যেসব বই পড়েছি, তাতে এসব প্রশ্ন থাকে না, থাকলেও হয়তো আমার তা খোঁজবার ইচ্ছে জাগেনি। হঠাৎ যে এই জীবনে আগে ছেদ পড়ে যায়নি অন্যান্য অনেকের ক্ষেত্রে যেমন হয়, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কার্যকারণের কাছে, কোনও দৈবী কর্তার কাছে নয়।

সত্যি আমাদের সংস্কৃতিতে, হয়তো পৃথিবীর সর্বত্রই, জীবনযাপনের মূল প্রশ্নগুলি করতে আমাদের পরিবার উৎসাহ দেয় না, বন্ধুরাও সাধারণভাবে দৈনন্দিনতার বাইরে যেতে চায় না। শৈশব ও যৌবনের একটা অংশ জুড়ে পড়াশুনো, পড়াশুনোর বহুজনমান্য লক্ষ্য চাকরি, চাকরির পর সংসার ও সন্তানপালন, বার্ধক্যে সন্তানের প্রশ্রয় ভোগ (আজকাল তাতে প্রচুর ব্যতিক্রম হচ্ছে দেখতে পাই), সমস্ত জীবনপর্যায়গুলি জুড়ে কিছুটা অভ্যস্ত বিনোদন-সন্ধান এবং শেষে মৃত্যু, এই চক্রের মধ্যে আমি যেমন আবর্তিত হই, তেমনি আমার সন্তানকে স্থাপন করে আমি বিদায় নিই। সন্তানটি আবার এই চক্রে নিজেকে সমর্পণ করে তার পালা সাঙ্গ করে এবং তার সন্তানকে একই আবর্তন উত্তরাধিকার হিসেবে দিয়ে যায়।

অবশ্যই এই আবর্তন সবসময় চক্রের আকারে হয় না, সামাজিক উত্তরণে কখনও কখনও শঙ্খাবর্তের অর্থাৎ spiraling upward mobility -এর আকার নেয়। ফলে চাষির ছেলে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়— যা হওয়াই উচিত। কিন্তু যে যত সাফল্যের চুড়োয় উঠুক না কেন, খুব কম মানুষই স্বাধীন কাজের জীবন শুরু করার সময় ভাবেন, কীভাবে বাঁচব? চারপাশের নিরিমিষ গতানুগতিকতায়, না নিজের জন্য বাঁচার কোনও-একটা 'আদর্শ' বেছে নিয়ে? বাদল সরকারের এবং *ইন্দ্রজিৎ* নাটকে যেমন ইন্দ্রজিৎ বা লেখক জিজ্ঞেস করে, 'সব্বাই করে বলে, সব্বাই করে তাই?' এই গতানুগতিকতার গড্ডলপ্রবাহে গা ঢেলে দিতে হবে?

> 'কেমন আছেন?' কথাটা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'আপনি প্রশ্নটায় একটা অক্ষর বেশি খরচ করেছেন।' আমি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করতাম, সে কী? তাঁরা বলতেন, 'হ্যাঁ, 'ম'-টা বেশি বলেছেন। জিজ্ঞেস করতে হত, 'কেন আছেন?'

'আদর্শ' কথাটা এমনিতে একটু গালভারী। কিন্তু এর সোজা অর্থ হল একটা বড় কোনও ভাবের কাছে নিজের স্বার্থপর অস্তিত্বকে সমর্পণ করা, নিছক নিজের বাইরে যাওয়া।

এই লেখার পাঠকরা অনেকেই অন্তত বয়সে হয়তো সে ভাবনার সময় পার হয়ে এসেছেন অনেক দিন। এখন আর সময় নেই, নিজের জীবন হয়তো অন্যনির্ভর, নিজের স্বাধীন সিদ্ধান্তের পরিসর কমে গিয়েছে। তাঁরা জানেন আদর্শ কী, আমার চেয়ে অনেক ভালো করে জানেন, এখন সেই জানার মূল্য হয়তো আর বেশি বাকি নেই।

আদর্শ নিয়ে কেউ জন্মায় না। বাবা-মা উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও আদর্শ নিয়ে গিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তও বেশি নয়। বেশিরভাগ বাবা-মা-ই (বাবা বিশেষ করে) সন্তানকে, আগে যেমন বলেছি, একটা মামুলি জীবনচক্রের মধ্যে স্থাপন করে বিদায় নেয়।

আর 'বেশির ভাগ' কথাটা নিয়ে বিতর্ক তুললে বলব অনেকক্ষেত্রে একটা কোনও 'আদর্শ' সরবরাহ করা হয় পরিবারের বাইরে থেকে।

আদর্শ যে মোদ্দা কথাটা বলে তা হল, ওহে মানুষ, তুমি নিজে সবটা নও, তুমি নিজে সম্পূর্ণ নও, অন্যরা আছে। অন্যরা যেমন তোমার জন্য আছে, তেমনই তুমিও কিছুটা আছ অন্যদের জন্য। একা তো বাঁচাই সম্ভব নয়। ফলে অন্যদের প্রতিও তোমার কিছু দায় আছে, কর্তব্য আছে। কখনও ধর্ম আমাদের এইরকম একটা আদর্শ প্লেটে তুলে দেয়, কখনও তাকে সামনে ধরে কোনও মানবিক মতবাদ, কখনও কোনও মহাপুরুষ বা মহৎ কবি।

এ লেখা পাছে মামুলি গুরুগিরির হাস্যকর ও অক্ষম চেষ্টা হয়ে ওঠে, সেজন্য এধরণের কথা এখানেই থামাই।

আচ্ছা, অন্যদের জন্য কিছু করুন আর না করুন, সে আপনার অভিরুচি। কিন্তু নিজের জন্যই আরও কিছু করুন।

গান শুনুন, বুড়োবয়সে চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখে গান ধরুন। ছবি দেখুন, নাটক, সিনেমা, নৃত্যনাট্য দেখুন। এসবের পাশাপাশি, বা এসব না করতে ইচ্ছে হলে, চুটিয়ে বই পড়ুন।

মনে রাখবেন, সারা পৃথিবীর মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে নানা শিল্প তৈরি করেছে শুধু মানুষের জন্য, অর্থাৎ শুধু আপনার জন্য। পশুপাখির জন্য নয়, গাছপালার জন্য নয়। তাদের কাছে এসবের কোনও মূল্য নেই। আলতামিরা গুহায় আদিম মানব যেমন ছবি এঁকেছে আপনার জন্য, তেমনই পিকাসোও তাঁর গের্নিকা এঁকেছেন আপনারই জন্য। বেটোফেন বা রবীন্দ্রনাথ সুর রচনা করেছেন আপনারই জন্য, চ্যাপলিন তাঁর অমর সৃষ্টিগুলি প্রস্তুত করেছেন আপনারই জন্য। মানবজাতির একজন সদস্য হিসেবে এগুলি আপনারও সম্পত্তি আর উত্তরাধিকার।

বাঁচতে বাঁচতে, সুখ পেতে পেতে, দুঃখ পেতে পেতে যদি আপনি এসবের একটু পরিচয় না নেন, তবে আপনার মানবজীবন বড় গরিব থেকে যাবে। আস্বাদ নিলে আপনি মানুষের মধ্যে অন্যরকম মানুষ হয়ে উঠবেন, নিজেই নিজের মধ্যে পুরস্কার খুঁজে পাবেন।

এখন তো বই ছাড়াও (আমার মতো 'মধ্যবিত্ত'দের কাছে) কত বিকল্প তৈরি হয়েছে ঘরে বসে নিজেকে পৃথিবীর দশ-দিগন্ত আর অতীত-ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করে সমৃদ্ধ করবার। টেলিভিশন আছে, সিডি, ভিসিডি, কম্পিউটারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পেতে পারেন অনেকে। যারা পারেন তারা তার সুযোগ নেবেন না কেন? কম্পিউটারের মধ্যে ঢোকানো আছে হাজার হাজার বই, ছবি, গান ও সুর, চলচ্চিত্র, নাটক— কী নেই? বিনোদন হোক, জ্ঞান হোক, তার জন্য

দৌড়োদৌড়ি করবার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে।

তবে এগুলি সবই আপনাকে 'দেবে', আর আপনি প্রায় নিষ্ক্রিয় থেকে এগুলির হাত থেকে 'গ্রহণ করবেন'। এটা খানিকটা একমুখী প্রক্রিয়া। আপনি এদের কিছু ফিরিয়ে দিচ্ছেন না। এরা সেজন্য তৈরিও হয়নি।

ফিরিয়ে দিতে হলে তা মানুষকেই দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে, 'দেওয়া-নেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া— তোমায় আমায় জনম জনম এই চলেছে'। মানুষকে যদি আমরা একথা বলতে পারি তাহলে আরও ভালো হয়। ভালো হয় যদি আপনি নিজে কিছু সৃষ্টি করতে পারেন— ছবি হোক, মূর্তি হোক, সুন্দর প্রাসাদ হোক, একটি গভীর গান হোক, কবিতা-গল্প-নাটক-উপন্যাস হোক। সৃষ্টি না করতে পারেন, অভিকরণ বা পরিবেশন তো করতে পারেন। আবৃত্তি, গান, অভিনয়, নিদেনপক্ষে হাসিঠাট্টা করে সবাইকে খুশি রাখা।

তাই বা কম কী। শুধু জীবনধারণ নয়, এই হল 'বাঁচা'র একটা সূত্র। বাঁচা মানে নিজেকে প্রকাশ করা। শুধু উপার্জনে, খাদ্যসংগ্রহে, আহার, নিদ্রা, মৈথুনে নয়— অবশ্যই সেগুলোও একধরণের প্রকাশ— প্রকাশ করুন সৃষ্টিতে, অভিকরণে, উপভোগে, সুন্দর চিন্তায়। এসবের পক্ষে কোনও বয়সই খুব বেশি বয়স নয়।

আমি যখন সকালবেলায় একটি দলের সঙ্গে হাঁটতাম, আমার চেয়ে তখন সকলেরই বয়স বেশি, তখন তাঁদের জীবনকে আস্বাদন করার আগ্রহ দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। হাঁটছেনই তো বাঁচবার জন্য। যদিও প্রথম প্রথম 'কেমন আছেন?' কথাটা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'আপনি প্রশ্নটায় একটা অক্ষর বেশি খরচ করেছেন।' আমি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করতাম, সে কী? তাঁরা বলতেন, 'হ্যাঁ, 'ম'-টা বেশি বলেছেন। জিজ্ঞেস করতে হত, 'কেন আছেন?' কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলতেন, 'কেন আছি জানেন? UDA অর্থাৎ 'ইউজফুল ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিম্যাল' হওয়ার জন্য বেঁচে আছি!' যদি জিজ্ঞেস করতাম 'ইউ ডি এ' কী দাদা?' তাঁরা অনুকম্পার স্বরে বলতেন, 'আহা, এইটা বুঝতে পারলেন না? এই ছেলেমেয়ের সংসারে বাজার করা, নাতি-নাতনিকে স্কুল-বাসে চড়িয়ে দেওয়া আর সেখান থেকে নামানো, সকালে দুধ আনা— এইসব হল ইউ ডি এ-র কাজ!' বলে তাঁরা হাসতেন, মনে হত না ব্যাপারটা তাঁদের কাছে খুব যন্ত্রণার।

মৃত্যু নিয়ে মানুষ নানা সময়েই ভাবতে পারে, ইংরিজি ও অন্যান্য ভাষায় মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক বইও আছে। সেসব বইয়ের একটি বাংলা সংস্করণ তৈরি করার কথা আমরা আপাতত ভাবছি না। আমাদের বিষয় মৃত্যু

> আমরা দেখলাম আমাদের আগেই সেই সাধুবাবা কৌপিন পরে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে ধড়মড় করে নেমে গেলেন, নেমেই ইঞ্জিনের উল্টোদিকে ছুটতে লাগলেন। কদ্দুর গিয়েছিলেন জানি না, কিন্তু এর মধ্যে জানা গেল, ইঞ্জিনের আগুনকে শাসন করা গিয়েছে,

বটে, কিন্তু এ মৃত্যু নিছক এক শারীরিক ঘটনা নয়। আমাদের কাছে আপাতত মৃত্যু, জীবনের অনেক কিছুর মতোই এক সাংস্কৃতিক ঘটনা। এই সাংস্কৃতিক ঘটনা হিসেবেই মৃত্যুকে আমরা বুঝতে চাই। সেইসঙ্গে এ বই বাঁচারও বই।

অনেকের কাছে মৃত্যু নিয়ে ভাবনা একটা বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের অবাস্তব পরিকল্পনা বলে মনে হতে পারে। যাঁরা মৃত্যুকে এড়াতে চান তাঁরা অনেক সময় মৃত্যুর ভাবনাকেও এড়াতে চান। এটা কোনওভাবেই অস্বাভাবিক নয়। খাবার লুকোতে গিয়ে কাক নিজের চোখ বুজে ভাবে তার এই খাবারটা আর কেউ দেখতে পাবে না। তেমনি আমরা মানুষরাও অনেকে ভাবি মৃত্যুর কথা না ভাবলেই বুঝি মৃত্যু আমাদের রেহাই দেবে। ঘড়ির টিক টিক শব্দের প্রতিটি উচ্চারণের মুহূর্তে মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি, সেটা সবসময় খেয়াল করি না, হয়তো ভেতরে ভেতরে জানি। তবু এই মরণশীল লেখকের মতো মৃত্যু নিয়ে এমন নাছোড়বান্দা হয়ে যে ভাবে, তাকে এক ধরণের বাতুল ছাড়া আর কী বলা যায়?

ভাবনার কারণ অবশ্য নানা সময়েই চলে আসে। এমন নয় যে, ছোট বয়সেও অভিজ্ঞতা আমাদের হয় না। বাড়িতে ঠাকুরদা, ঠাকুমা বা বয়স্ক আত্মজন মারা যায়, একটা বয়স পর্যন্ত তার অর্থ আমরা বুঝি না। বড়রা বলেন ওমুকে স্বর্গে চলে গিয়েছেন, কিংবা আকাশে তারা হয়ে গিয়েছেন। এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা তা আমাদের বলা হয় না, আমাদের সে মিথ্যা ধরবার বুদ্ধিও থাকে না। বাড়ির কুকুর-বেড়ালের মৃত্যু সম্বন্ধে হয়তো বড়রা এ ধরণের স্তোক দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেন না। আর আমাদের নিজেদের মৃত্যুর ছোটখাটো দূত নানা সময়েই চলে আসে— নানা ধরণের অসুখবিসুখ। খুব মারাত্মক না হলে যৌবন বয়স পর্যন্ত আমরা এগুলো নিয়ে তেমন ভাবি না। অল্পবিস্তর সর্দিকাশি, জ্বরজারি, একটু-আধটু হাড়গোড় ভাঙা ইত্যাদির সঙ্গে আমরা মৃত্যুর কোনও যোগসূত্র দেখি না। ভাবি ওসব বাঁচারই অঙ্গ, বেঁচে থাকার অপরিহার্য ঝক্কিঝামেলা। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপনে ষাট-সত্তর বছর হয়ে গেলে এর কিছু উপসর্গকেই মৃত্যুর আগাম নোটিস বলে মনে করি। সতর্ক হই, ডাক্তারের চেম্বারে নিসান গাড়ি, সুগার, প্রেশার ইত্যাদির ফাইল তৈরি হয়, শরীর স্বাস্থ্য হয়ে ওঠে বুড়োদের কথাবার্তার প্রিয় প্রসঙ্গ। এখন দূষণের নানা বৈগুণ্যে আমাদের অনেকের যৌবনেই চুল পাকে বা টাক পড়ে যায়, যার ফলে কলপ ইত্যাদির বিজ্ঞাপন দেখে দেখে আমরা অস্থির হয়ে যাই, পরচুলারও পসার বাড়ে। ভারতের গড় মানুষের আয়ু স্বাধীনতার সময় ছিল ২৭ বছর, এখন তা ৬২ বছরেরও বেশি। নানা সচেতনতা আর অনুষঙ্গের ফলে আমাদের (অর্থাৎ মধ্যবিত্তের) যৌবনও এখন একটু বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব হয়। তা সত্ত্বেও মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়ামাত্র আমাদের একাংশ নানা ক্রিম, লোশন, ময়েশ্চারাইজার ইত্যাদির দিকে হাত বাড়াতে থাকি, আর পুরুষেরা যৌবনবর্ধক নানা ট্যাবলেট সেবন শুরু করি। আজকাল কোরিয়ান জিন সেং দেওয়া ট্যাবলেট নানা ব্র্যান্ডে পাওয়া যায়। ব্যায়াম, প্রাতর্ভ্রমণ, লাফিং ক্লাব— কিছুই আমাদের আঁকড়ে ধরার বাইরে থাকে না। অর্থাৎ 'যৌবন তুমি আরও কিছুদিন সঙ্গ দাও', 'মৃত্যু তুমি আরও সুদূর-পরাহত হও'— এই হল সাধারণ মানুষের ব্যাকুল প্রার্থনা। ২০০৫ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমেন্সমেন্ট' অর্থাৎ একটি সমাবর্তন ভাষণে কম্পিউটার আর মোবাইলের বিশাল আবিষ্কারক প্রতিভা স্টিভ জবস যেমন বলেছিলেন, 'কেউ মরতে চায় না, এমনকি যারা ভাবে মরে গেলে স্বর্গে যাবে, আর স্বর্গ একটা দারুণ সুখের জায়গা, তারাও চায় না।'

এব্যাপারে আমার একটা মজাদার অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস সেটা, আমরা নান্দীকার নাটকের দলের হয়ে বম্বেতে (তখন তাই ছিল) গিয়েছিলাম নাটক করতে, সেখান থেকে এলাহাবাদ ফিরছি বম্বে-এলাহাবাদ-হাওড়া মেলে। এলাহাবাদে নাটক করে তবে কলকাতায় ফিরব। রাত্রে খাওয়াদাওয়া করে ট্রেনে উঠেছি, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, একটু ঘুমিয়েও পড়েছে সবাই। এমন সময় হঠাৎ তুমুল তারস্বর চিৎকার, 'আগ লাগ গিয়া, আগ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি

তাঁর মনে হল সকলে ক্লান্ত হয়ে এমন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে, কী দরকার তাদের এই ঘুমটুকু বঞ্চনা করার? তার চেয়ে ভাবি না কেন যে, বিছেটা যে শরীরটাকে কামড়েছে সেটা আমার শরীর নয়, অন্য কারও শরীর! এই ভেবে অপরিসীম এক শক্তিতে তিনি যেন নিজের যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহ থেকে নিজের চেতনাকে আলাদা করে ফেললেন।

লাগ গিয়া!'

আমরা তো সবাই হুড়মুড় করে জিনিসপত্রের মায়া না রেখে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামলাম। ট্রেন থেমে আছে একটা পাহাড়ের ধারে, আর একদিকে খাদ। সবাই নেমে পড়েছে, কেউ কেউ ইঞ্জিনের দিকে ছুটেছে, কারণ শোনা গেল ইঞ্জিনেই আগুন লেগেছে, আর কোথাও নয়। তখনকার দিনের বিশাল ক্যানাডিয়ান ডিজেল ইঞ্জিন, তাতেই আগুন, সর্বনাশ!

এখন হয়েছে কী, আমার পাশের সিটেই ছিলেন এক পরিচ্ছন্ন সিল্কের গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, যাঁর ভাবসাব দেখে আমার খুবই সাত্ত্বিক বলে মনে হয়েছিল। তিনি যাত্রার পর থেকে চমৎকার ধর্মকথা বলছিলেন, কিছু যাত্রী, বিশেষত দুয়েকটি মহিলা, খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। সাধুটির বলা ও বোঝানোর ভঙ্গি ভালো, মাঝে মাঝেই এ জীবন যে অনিত্য এবং পুণ্য যে কত দরকার, এ কথাগুলি ঘুরে ফিরে আসছিল।

আমরা দেখলাম আমাদের আগেই সেই সাধুবাবা কৌপিন পরে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে ধড়মড় করে নেমে গেলেন, নেমেই ইঞ্জিনের উল্টোদিকে ছুটতে লাগলেন।

কদ্দুর গিয়েছিলেন জানি না, কিন্তু এর মধ্যে জানা গেল, ইঞ্জিনের আগুনকে শাসন করা গিয়েছে, একটু দেরি হলেও ট্রেন আবার চলবে। ওই ইঞ্জিনটি কাছের কোনও স্টেশনে চলে গেল, সেখান থেকে আরেকটি একই ধরণের ইঞ্জিন এল, আমরাও ট্রেনে উঠে পড়লাম, সেই সাধুবাবাকেও দুয়েকজন লোক ধরে আমাদের কামরায় পৌঁছে দিয়ে গেল।

কামরার ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে দুয়েকজন সাধুবাবাকে ঠাট্টা করবার চেষ্টা করল, 'কী সাধুবাবা, আপনিও আমাদের মতো প্রাণের ভয়ে ছুট দিলেন!'

সাধুবাবা তখনও শীতে ঠকঠক করে কাঁপছেন। লজ্জিত গলায় বললেন, 'অচানক আওয়াজ উঠা, জরা ঘবড়া গয়া থা!'

এরকম ঘাবড়ে আমরা সবাই যাই, সাধুবাবারাও যান। কয়েক বছর আগে দাক্ষিণাত্যের এক অতি বিখ্যাত আর বড়লোক সাধু, যাঁর শিষ্যশিষ্যা সারা পৃথিবীব্যাপী, মঠমন্দিরে হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি, তিনি আততায়ীর তাড়া খেয়ে কীরকম লুঙ্গি গুটিয়ে দৌড়েছিলেন তার খবর কাগজেই বেরিয়েছিল। কাজেই সাধু হোক, আর আমাদের মতো অসাধুই হোক, মৃত্যু সম্বন্ধে সচরাচর এই পলায়নবাদী মনস্তত্ত্বই আমরা বহন করে চলি। বস্তুবাদী দার্শনিক চার্বাকও এরকম একটা কথা বলেছিলেন বলে শোনা যায় যে, পশুবলি দিলে পশুরা যদি স্বর্গে যায় তো বামুনরা তাদের বাপ-মাকে ধরে ধরে বলি দেয় না কেন, স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা যখন এতই সিধে!

মৃত্যুকে ভয় করে না, অর্থাৎ সাধারণ ভাবনার ব্যতিক্রমও যে আছে তাও আমাদের অজানা নয়। ব্যতিক্রমের কথা আমরা একটু পরেই বলব, এবং তা থেকেই বোঝা যায় এ সম্বন্ধে মানুষের ভাবনা কখনওই খুব সরল রাস্তায় চলেনি। তার মধ্যে নানা জটিলতা ও দ্ব্যর্থকতা মিশে গিয়েছে। এই জটিল ও বিমিশ্র ভাবনাচিন্তাগুলিকে তাদের নানা বিস্তারের মধ্যে দেখাই এ বইয়ে আমাদের মূল লক্ষ্য। মনস্তত্ত্বের গভীর জ্ঞানের সম্বল আমাদের নেই, শারীরতত্ত্বও আমাদের রীতিমতো অজানা বিষয়। সমাজতত্ত্বে প্রগাঢ় অজ্ঞতার অহংকার আমরা নির্বিবাদে করতে পারি। কিন্তু মৃত্যু নামক ঘটনাটা যেহেতু আমার অস্তিত্বকেও একসময় অনিবার্যভাবেই গ্রাস করবে— এমন হতেই পারে যে সে ঘটনা খুব দূরবর্তীও নয়, চাইলে হয়তো এ গ্রন্থসমাপ্তির আগেই এসে সে কম্পিউটারের মাউস টিপে সব অন্ধকার করে দিতে পারে— তবু তার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার কিছু অধিকার আমি নিজের জন্য দাবি করছি।

সমস্ত শারীরিক যন্ত্রণার শেষ অবশ্যই মৃত্যুতে। কিন্তু অনেক সময় শারীরিক যন্ত্রণাকে আমরা মৃত্যুর মতোই একটা নেতিবাচক এবং পরিহারযোগ্য অভিজ্ঞতা হিসেবে ধরি। যেন সে মৃত্যুর আত্মীয়, গরিব আত্মীয়। ফলে আমরা অনেকেই শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না। ব্যথা পেলে বীভৎস চিৎকার করি, ইঞ্জেকশন নিতে গিয়ে মুচ্ছো যাই, অপারেশন কাটাছেঁড়ার

নাম শুনলে ভিরমি খাই। এমনকি যন্ত্রণার দৃশ্য দেখেও অনেকে কাতর হয়ে পড়ি। আমার মনে আছে— ১৯৫৭ সালের কথা সেটা— অপারেশনের পর নাকে গজ গোঁজা অবস্থায় স্ফীতমুখ আমাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে শিল্পী বন্ধু পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, অন্যেরা তাকে ধরেটরে মাথায় জল দিয়ে সুস্থ করেছিল।

আরেকটি ঘটনা মনে আসছে। তারও আগে, ১৯৫৪ সালে, আরেকবার আমার নাক অপারেশনের (কৌতূহলী পাঠকদের জানাই, মোট আটবার নাক অপারেশন হয়েছিল আমার, সে কথা অন্যত্র লিখেছি) সময় মেডিক্যাল কলেজের মতি শীল ওয়ার্ডে শুয়ে আছি, তখন রাত আটটামতন হবে। হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদে চমকে উঠলাম, দৌড়ে গেলাম তার উৎস দেখতে। দেখি এক অসহায় রোগী বেচারার একটি পা ঝোলানো রয়েছে খাটের ছত্রীর সঙ্গে, আর এক অ্যাপ্রন-পরা ডাক্তারবাবু মহানন্দে তার হাঁটুতে একটা স্টিলের পেরেক হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঢোকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। বেচারাকে অজ্ঞান-টজ্ঞান কিছুই করা হয়নি, বা কোনও লোকাল অ্যানিস্থিশিয়া গোছের কিছু দেওয়া হয়নি, তাই মর্মভেদী চিৎকার করা ছাড়া তার পরিত্রাণ নেই। শুনলাম সে বি কে পাল অ্যাভিনিউতে একটা বাড়ি তৈরিতে জোগান দিচ্ছিল ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, এমন সময় একটা লোহার বিম চারতলা থেকে তার পায়ের ওপর পড়ে যায়। চুরমার হাড় নিয়ে সে হাসপাতালে এসে পৌঁছয়। এই হল ওই আসুরিক চিকিৎসার পটভূমিকা। আমি গিয়ে দেখলাম, তার গগনবিদারী আর্তি অগ্রাহ্য করে ডাক্তাররা নির্বিকার মুখে হাতুড়ি ঠুকে চলেছেন এবং দু-তিনজন নার্স আর ওয়ার্ড-বয় প্রবল শক্তিতে তাকে চেপে ধরে রয়েছে। কলেজ স্ট্রিটের সন্ধ্যা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার আর্তনাদে।

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার এই দুর্বিষহ শারীরিক যন্ত্রণার পরিমাপ নেওয়ার চেষ্টা করলাম। বলাবাহুল্য, সে পরিমাপ সহজ কাজ নয়। শুধু এইটুকু ভাববার চেষ্টা করছিলাম যে, আমি নিজে কি এই দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারতাম? কী জানি!

রবীন্দ্রনাথ তো পারতেন বলে শুনেছি। মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইয়েই আছে ঘটনাটা, রবীন্দ্রনাথেরই মুখে।

শান্তিনিকেতন থেকে সন্ধ্যায় কলকাতায় এসেছেন, সকলের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া, গল্পসল্প করে ঘুমোতে একটু রাতই হয়েছে। ঘুমের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বিছে কামড়েছে। পুরনো বাড়ি, তাতে বিছেদের অবস্থান অপ্রত্যাশিত নয়। যাঁদের এ অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন কী অসম্ভব যন্ত্রণা ওই বৃশ্চিকদংশনের।

এই অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, সারা বাড়ি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ক্লান্তি ও উত্তেজনার পর যা স্বাভাবিক। তিনি একবার ভাবলেন জাগাই কাউকে, বলি এই ঘটনার কথা। পরক্ষণেই তাঁর মনে হল সকলে ক্লান্ত হয়ে এমন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে, কী দরকার তাদের এই ঘুমটুকু বঞ্চনা করার? তার চেয়ে ভাবি না কেন যে, বিছেটা যে শরীরটাকে কামড়েছে সেটা আমার শরীর নয়, অন্য কারও শরীর!

এই ভেবে অপরিসীম এক শক্তিতে তিনি যেন নিজের যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহ থেকে নিজের চেতনাকে আলাদা করে ফেললেন, ছিঁড়ে আনলেনই বলা যায়।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যন্ত্রণাও যেন ফুরিয়ে গেল।

মহাভারতে কর্ণের হাঁটুতে বজ্রকীট দংশনের সেই আখ্যানের মতো রবীন্দ্রনাথের এই অমানুষিক সহ্যশক্তিও আমাদের নেই। আমরা সংসারের নানা দুঃখকষ্টদুর্গতিতে কাতর-হওয়া মানুষ, আমাদের পক্ষে এরকম ভাবাই সম্ভব নয়। তবু তো আছে এরকম একটা বাঁচার আদল, কারও কারও আয়ত্তে।

অস্বাভাবিক অবস্থায়, যৌথ উত্তেজনায় বা গণ-হিস্টিরিয়ার ক্ষেত্রে আত্মপীড়নের সুযোগ তৈরি হয়, তাতে একটা আবেগ নিষ্কাশনের এবং উপশমও ঘটে। মহরম উপলক্ষে সাধারণত শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের তরুণেরা বুক চাপড়ে চাপড়ে রক্তাক্ত করে ফেলে, বাঙালি হিন্দুদের কোনও গোষ্ঠী গাজনে নানা জিনিস শরীরে গেঁথে খেলা দেখায়, অনেক ধর্মের লোকে গায়ে বেত বা গাছের ডালপালার আঘাত করে শারীরিক কষ্ট নিয়ে পাপমুক্তি বা প্রায়শ্চিত্তের নানা অভিচার করে। তাছাড়া তীর্থস্থানে দণ্ডি কাটা (ছট পুজোতেও সেটা ঘটে)— এরকম বহুতর আচার-আচরণ মানবসমাজে লক্ষ করা যায়, যেগুলি শারীরিক কষ্টকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করার একটি আপাত উপলক্ষ সৃষ্টি করে। মনে আছে, বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে ওঠার পথে অথর্ব বৃদ্ধও 'জয় মাতা দী' বলতে বলতে হাসিমুখে পুরো পথটা পার হয়ে যাচ্ছে, এমন দেখেছি। এগুলির স্মৃতিও মানুষের কাছে কষ্ট বা অনুশোচনা বহন করে না, বরং একধরণের নেশা বা অহংকারের উৎস হয়ে ওঠে। পাপক্ষালন এবং পুণ্যলাভের জন্য এইসব আত্মপীড়ন বহু ধর্মের এক স্বাভাবিক অঙ্গ। উপোসও এইজাতীয় এক আত্মপীড়ন, যদিও বিধবা হিন্দু মেয়েদের ওপর পুরুষশাসিত সমাজের চাপিয়ে দেওয়া উপোসের নিয়মের (সেইসঙ্গে থান কাপড় পরা এবং আমিষ বারণের) পিছনে অর্থনৈতিক শোষণের একটা প্রচ্ছন্ন কারণও বর্তমান।

পণ্ডিতেরা যুক্তি (রিজন) আর বিশ্বাস (ফেইথ)-এর মধ্যে একটা স্পষ্ট দ্বিধাবিভাজন করেন বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখি যুক্তির মধ্যে প্রচুর বিশ্বাস ঢুকে যায়, আবার বিশ্বাসের মধ্যে যুক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে। ধর্মমাত্রই বিশ্বাসের শিকড় থেকে জন্মায় এটা যেমন আমাদের কাছে সত্য, তেমনই এর মধ্যেও কিছুটা আপেক্ষিকতার জায়গা তৈরি হয়। প্রবল আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক ধর্মে যুক্তিহীনতা যেন তুলনায় বেশি, অন্যদিকে ধ্যান ও প্রার্থনানির্ভর ধর্মে যুক্তি যেন একটু বেশি মর্যাদা পায়। তবু বৃক্ষদেবতা, পশুদেবতা, অন্তহীন আচার ও মন্ত্রতন্ত্র রিচুয়ালভিত্তিক ধর্ম থেকে ধ্যান ও প্রার্থনাভিত্তিক একেশ্বরবাদী ধর্মে যেন যুক্তির খানিকটা সুপ্রসর অগ্রগতি ঘটে। শেষ ক্ষেত্রে বীভৎস শারীরিক আত্মপীড়নের অবকাশ কম।

ধর্মের এই প্ররোচনা ছাড়াও আত্মপীড়নের আরও নানা প্ররোচনা নিশ্চয়ই ঘটে। প্রেমের জন্য, দেশকে ভালোবাসার জন্য, জনতার সামনে বাহাদুরি দেখানোর জন্য, আরও নানা কারণে, মানুষ নানা রকমের আত্মপীড়নে উদ্যত হয়। কোনও প্রেমিক প্রেমিকার মন পাওয়ার জন্য মোমবাতির শিখায় নিজের আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছিল, ভিনসেন্ট ভ্যান গখ প্রেমিকাকে নিজের কান কেটে উপহার পাঠিয়েছিলেন, এসব কথা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। ফরাসি নাট্যকার রস্তাঁর 'সিরানো দ বেরজেরাক' নাটকে নায়ক নিজের অহেতুক লম্বা নাকটাই কেটে ফেলেছিল প্রেমিকার মন পাওয়ার জন্য। আরও কঠিন এবং বীভৎস আত্মপীড়নের আখ্যানা প্রচুর আছে, সেগুলির উল্লেখ করা বাহুল্য হবে। এগুলি অনেকসময় বীরত্ব কিংবা 'শিভালরি' আখ্যা পায়। এসব ত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের কথা গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে, ইতিহাসে খুবই ফলাও করে লেখা হয়। এগুলিকে আত্মপীড়ন হিসেবে দেখা হয় না। সমাজে আধিপত্যকামী (এবং আধিপত্যভোগী) পুরুষরা এসব নিয়ে বেশ একটা হাস্যকর আত্মপ্রসাদ পায়। যেন এইসব ঘটনা তাদের মেয়েদের তুলনায় শ্রেয় বলে প্রমাণ করে।

অর্থাৎ যে কথাটা বলতে চাইছি তা হল, নেতিবাচক শারীরিক বা মানসিক অভিজ্ঞতা আমরা এড়াতে চাই একথাটা সাধারণ সত্য হলেও সমগ্র মানব-সংস্কৃতির পক্ষে পুরোপুরি সত্য নয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা ও মনস্তত্ত্বের নানা অভিঘাতে এমন অনেক সংকট তৈরি হয় যাতে আমরা স্বেচ্ছায় শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণা স্বীকার করি, এমনকি তা অনেকসময় আমাদের কাছে প্রার্থিত হয়ে ওঠে।

(ক্রমশ)

বহু ছেলেমেয়ে 'কর্মক্ষেত্র' পড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্তত চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ের
কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।
যারা 'কর্মক্ষেত্র'-র সহায়তায়
কাজ পেয়েছিল। ওদেরকে আমিই
'কর্মক্ষেত্র'-র গ্রাহক করে দিয়েছিলাম।
'কর্মক্ষেত্র' প্রথম থেকেই ছোটখাটো
ব্যবসার এক আশ্চর্য নির্দেশিকা দিয়ে
আসছেন, যা অনুসরণ করলে যুবাপ্রজন্ম
বাঁচবার ও বাঁচাবার পথের সন্ধান পাবে।
টুথপেস্ট বানাবেন, না হাওয়াই চপ্পলের
ফিতে? মেশিনে পোট্যাটো চিপস বানিয়ে
বেচবেন, না ভিনিগার তৈরি করবেন?
'কর্মক্ষেত্র' এত বছরে, এরকম অন্তত
এক হাজার অল্প পুঁজির ব্যবসার হদিশ
দিয়েছে। ওই সব ব্যবসায় নেমে
কয়েক হাজার মানুষই স্বাবলম্বী হয়েছেন।
মৃত্যু যখন দরজায় ঘা দিচ্ছে, তেমন
সময়ে যে ঔষধ বাঁচাতে পারে, তাকে
আমাদের মুনিঋষিরা নাম দিয়েছেন
বিশল্যকরণী। আমি তো 'কর্মক্ষেত্র'কে
বলব বিশল্যকরণী।
'কর্মক্ষেত্র' যেভাবে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা
করার পরিকল্পনা জোগায়, তাতে তো
সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন
নতুন জীবনের রসদ পায়।
'কর্মক্ষেত্র' বলছে, পরিশ্রম করো
সততার সঙ্গে, শ্রমকে ভয় পেও না,
স্বীয় কর্মগুণে ভাগ্যকে জয় করো।
আজ দেশের তরুণ প্রজন্মকে এই কথা
বলার মহান দায়িত্ব 'কর্মক্ষেত্র' গ্রহণ করেছেন,
আমি অন্তর থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি।

মহাশ্বেতা দেবী

৩ জুলাই, ২০০৫

মহাশ্বেতা দেবী: *জ্ঞানপীঠ, ম্যাগসেসে, আকাদেমি প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিতা লেখিকা।*

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

পাপিয়া ঘোষালের কবিতা

দু টি ন তু ন

দা হ

কয়েক টুকরো কয়লা
দাহ করে ফিরে এলাম।
দাহ করলাম এক শব,
ফুল, চন্দনকাঠ ও আতঙ্ক
আরো দাহ করে এলাম
ধামসা, মাদল, শব্দবাজি ও মৃদঙ্গ

পড়ে রইলাম আমি—
সতেজ আমি—
সহজ আমি—
শব্দ আমি—
আগুন আমি—
আতঙ্কহীন—
মায়াহীন—

চাঁ দ মে খে ছে মে ঘ

চাঁদ মেখেছে মেঘ
মেঘ মেখেছে রঙ
রঙ মেখেছে আঁচল
আঁচলে লেগেছে আঙুল
আঙুল ছুঁড়ছে চাঁদের দিকে আড়ি

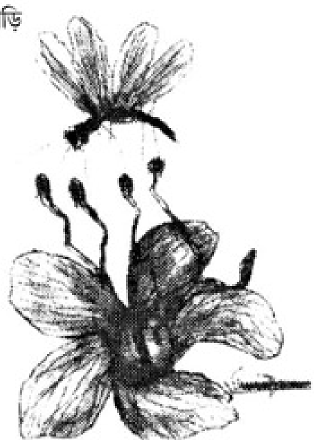

'ঋ তু র দি ন গু লো' থে কে

যু দ্ধ

মরচে ধরা মানুষ
হাতে মরচে ধরা তরোয়াল
কার সঙ্গে যুদ্ধ তোমার?

আয়নার সামনে সারাদিন দাঁড়িয়ে আছো
নকল যুদ্ধের পোশাকে
কে তোমার প্রতিপক্ষ?

চার দেওয়ালের মধ্যে
তোমাকে তাড়া করছে এক অন্ধকার
তবুও তুমি অপেক্ষা করছো
অন্য এক প্রতিপক্ষের...

জ ন্মা ন্ধ জ্যা মি তি

ক্লান্ত নীল রঙ গড়িয়ে নামছে ক্যানভাসে,
ঘুমিয়ে পড়ছে তুলি

রাস্তা ঠিক করে দিচ্ছে এক অন্ধকার অর্থনীতি

শাসন করছে জন্মান্ধ জ্যামিতি

শুধু জেগে আছে ব্যাকরণের পরের গ্রহটি,
যার কথা লেখা নেই পাঠ্য বইয়ে...

ভা ঙা আ য় না

ভাঙা আয়না বলছে শুধুই বাণিজ্যের কথা—

তোমার মুখে বাণিজ্য
তোমার স্তনে বাণিজ্য
তোমার জঠরে বাণিজ্য
তোমার লিঙ্গে বাণিজ্য
তোমার যোনিতে বাণিজ্য
তোমার চোখে বাণিজ্য
তোমার চোখের জলে বাণিজ্য
তোমার মনে বাণিজ্য

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঋতুর দিনগুলো বেড়ে যায়।

আ মা কে বাঁ চ তে দা ও

খনন মানে জানি না
জীবন মানে জানি না
জীবনযাপন মানেও জানি না
মৃত্যুর মানে জানি না
মৃত্যুশোক কাকে বলে জানি না
জানি না প্রেম, বিশ্বাস, জ্ঞান, বোধ
হে মানুষ, আমাকে বাঁচতে দাও।

ক বি তা

আমি কবিতা...

আমি তোমাদের যৌনতা
আমি তোমাদের খিদে ভোলাবার গান
আমি শীত। আমিই বসন্ত।
আমি ছলকে ওঠা কাদামাখা জল
আমি কলকাতার মানুষের পায়ের তলায় কার্পেট
আমি উড়িয়ে দেওয়া তুলোর বীজ
আমি জলে ভেসে থাকা শালুক পাতা
আমি গ্রীষ্মের আকাশের স্তব্ধতা
আমি বৃষ্টি ফোঁটার চোখের জল
আমি কালো মেঘের দুঃখ
আমি যুবতী মেয়ের বুকে লুকিয়ে রাখা প্রশ্ন
আমিই তাদের যোনি থেকে গড়িয়ে নেমে আসা লাঞ্ছনা

আমিই কবিতা

স ন্ত্রা স

ছেলেবেলার রঙীন চশমার আড়ালে
হারিয়ে গেছে তোমার চোখ
এক শীতল পৃথিবীর দিকে...

রেটিনায় ভেসে উঠেছে এক সন্ত্রাস

তারপর শুধুই ভয়
তারপর শুধুই ক্লান্তি

দর্শকরা দিয়ে যাচ্ছে বোবা হাততালি

অ তী ত

একদিন ফিরে আসবে সে
যেভাবে ফিরে আসে অতীত
তার মেয়েমানুষের কাছে

সে জানেনা তার মেয়েমানুষ কবে
হারিয়ে গেছে অন্য পুরুষে

অ বি শ্বা স

ছাই উড়ছে অস্তিত্বের দুপাশে
শ্মশানের রঙীন দেওয়ালে,
আগুনের স্রোতে
মিশে যাচ্ছে নরম বিপ্লবের হাত

আমাদের চূড়ান্ত প্রেমে গড়া চারপাশের ভস্ম
আঁকড়ে ধরতে আজ আমরাই দ্বিধাবোধ করি

অবিশ্বাস মেশানো বৃষ্টির ফোঁটা
আজ ছিটকে ফেলছে প্রণয় ও প্রণয়ীকে

মন খারাপ করা বেলুন
উড়িয়ে আনছে রঙ বেরঙের কান্নার হাওয়া
একটু একটু করে আমরা সত্যিকারের কান্নায় ভেঙে পড়ছি

প্রে ম

যেন অন্ধকারকে তছনছ করে এগিয়ে চলেছি আমরা
জ্যোৎস্না যেন আজ গ্রাস করেছে আমাদের এতদিন পর
অনেকদিন ধরে বয়ে চলেছি নিজের শব
যেন আজ আবার শুনতে পাব
দাদরা ও ঠুংরীর অর্থনৈতিক লড়াই
যেন অনেকদিন পর কেউ এসে বলবে
আঁচলের গিঁট খুলে পালিয়ে এসো

কবিতা-পরিচয়

মুখ: প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

একটা মুখ কাঁদায় হ'য়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু,
মেলায় বাজিকরের খেলায় একটা মুখ মুখোস প'রে হাসায়।
খেয়ার নায়ে ওপারে যেতে কবে যে কোন ভিড়ে
একটা মুখ এক নিমেষে অকূল স্রোতে ভাসায়!
কার সে মুখ, কার?
জানে কি তারা-ছিটোন অন্ধকার?

সে মুখ যারা দেখেনি তারা জানে না জ্বালা নিদান যার নেই।
শীতের দিনে পোহায় রোদ উঠোনে ব'সে আরামে কাঁথা গায়,
ঝুমকোলতা দেয়ালে তোলে, মরাই রাখে ভ'রে,
ফল কি ফুল পাড়তে শুধু নাগাল ডাল নামায়।
হোক সে মুখ যার,
অনিদ রাতে কাঁপে না অন্ধকার।

সে মুখ যার পড়েছে চোখে ঘরে-ই থাকে যায় না সেও বনে,
বসত করে পাঁচিল ঘিরে হিসেব ক'রে পুঁজি যা আছে ভাঁড়ায়।
তবুও কোন হতাশ হাওয়া একটা ছেঁড়া ছায়া
তারার ছুঁচে সেলাই ক'রে রাত্রি জুড়ে টাঙায়।
কার সে ছায়া, কার?
প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার।।

প্রধানত ছন্দের দোলার জন্যই 'মুখ' কবিতাটি খুব সুখপাঠ্য, কিন্তু সুখ-পাঠ্যতাই কবিতাটির একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অধিকাংশ কবিতাই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নয় (এখানে, ভালো বা মন্দের প্রশ্ন একেবারেই তুলছি না), কিন্তু প্রকরণের সারল্য সত্ত্বেও 'মুখ' কবিতাটি অংশত আমার কাছে দুরূহ মনে হয়েছে। লেখা বাহুল্য, কবিতাটির প্রতি আমার অনুরাগ না জন্মালে এই দুরূহতা নিয়ে আমি আদৌ ভাবিত হতাম না।

একটি মুখ নানাভাবে কবিতাটিতে— এবং জীবনে— বিকীর্ণ হ'য়ে আছে। এই 'মুখ'টি কার, এই প্রশ্ন-ভাবনায় সমস্ত কবিতাটি আন্দোলিত। প্রথম পংক্তির 'হ'য়ে' শব্দটি আমার কাছে খুব জরুরি মনে হয়েছে— অর্থাৎ যে 'একটা মুখে'র প্রস্তাবনায় কবিতাটি শুরু হ'ল, সেটি কোনও নির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়, বরং তা রূপান্তরক্ষম, এবং এক-একটি রূপভেদে তার অভিঘাতও স্বতন্ত্র। যে-মুখটি 'শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু', সে-ই দ্বিতীয় পংক্তিতে, 'মেলায় বাজিকরদের খেলায়... মুখোস প'রে হাসায়', এবং পর-মুহূর্তে তাকেই দেখি 'অকূল স্রোতে ভাসানো'র প্রেরণা হিসেবে। লক্ষণীয় যে, এখানে তিনটি মুখের কথা লেখা হচ্ছে না, একটি মুখেরই রূপান্তরত্রয় কবিতাটির এই অংশের প্রতিপাদ্য। যে-প্রশ্নটি কখনও প্রত্যক্ষ কখনও বা প্রচ্ছন্নভাবে সমস্ত কবিতাটিতে ছড়িয়ে গিয়েছে, পঞ্চম পংক্তিতে তার শুরু: 'কার সে মুখ, কার?' অর্থাৎ, সেই 'একটি মুখ' এবং 'মুখে'র পরিবর্তিত, বা রূপান্তরিত পরিস্থিতি, আক্ষরিক অর্থে, এক নয়, কেননা তাহ'লে 'কার সে মুখ'— এই প্রশ্নই উঠত না। 'হ'য়ে' শব্দটির গুরুত্ব আবার নতুন ক'রে অনুভব করি এখানে। যদিও 'মুখ' একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, শরীরবাচক শব্দ— কিন্তু তার অসংখ্য রূপান্তরে তাকে শুধু অনুভব করা যায়, কখনওই স্পষ্টত দেখা চলে না ব'লে শারীরিক এই শব্দটি এখানে শুধু একটি প্লেটোনিক 'ধারণা'র সমার্থক। 'অনাথ শিশু' বা 'মুখোস-পরা' বাজিকরদের এই 'প্রধান' ধারণার আভাসমাত্র। তৃতীয় চিত্রকল্পে 'মুখ'-এর রূপান্তর অবশ্য খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু 'অকূল স্রোতে ভাসানো'র উৎসকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পারি না। অর্থাৎ 'মুখ' এখানেও কোনও ভাবনা বা অনুভবের নামান্তর। প্রথম স্তবকের শেষ পংক্তিটি খুবই বিভ্রান্তিকর। 'তারা-ছিটোন অন্ধকার' এই 'মুখ'-কে জানে কিনা প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু কেন? 'তারা-ছিটোন অন্ধকার' সুন্দর ছবি, তাকে প্রতীক হিসেবেও না হয় গ্রহণ করা গেল, কিন্তু তাহ'লেও আমাদের সমস্যার সমাধান হয় না এখানে। এইভাবে আমরা শুধু অনুমান করতে পারি যে, 'খেয়ার নায়ে' 'অকূল স্রোতে'

> যা ঘটে, তাকে একটি সুন্দর চিত্রকল্পে গেঁথে দেওয়া হয়েছে: হতাশ হাওয়ার হাত তারার ছুঁচে একটি ছায়া সেলাই ক'রে টাঙায়।

ভাসতে ভাসতে 'মুখ'-তাড়িত যাত্রীটি হঠাৎ ওপরের নক্ষত্রচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করছে 'কার সে মুখ, কার?' এবং এই যাত্রীরই দ্বিতীয় স্বগতোক্তি হ'ল, 'জানে কি তারা-ছিটোন অন্ধকার!' আমি অবশ্য ধ'রেই নিচ্ছি, এই খেয়া-পারাপারের সময় হ'ল সন্ধ্যাকাল— অর্থাৎ বাড়ি ফেরবার মুহূর্ত— যখন সবে তারা উঠতে শুরু করেছে, এবং মাথার ওপরে নিয়তির মতো বিস্তৃত আকাশের দিকে তাকিয়ে, যাত্রীটির মনে এই প্রশ্ন করবার লোভ জেগেছে, 'জানে কি...' ইত্যাদি! কিন্তু এই পংক্তিটিকে তৃতীয় চিত্রকল্পের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন না ভাবলে খেয়া-পারাপারের সময় সম্পর্কে একটা খটকা থেকেই যায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে সমস্ত লোক দুভাবে আলাদা হ'য়ে গিয়েছে: এক, যারা মুখটিকে দেখেনি; দুই, 'সে মুখ যার পড়েছে চোখে'। 'নিদান যার নেই এমন জ্বালা' অর্থাৎ যে-জ্বালার প্রতিষেধক কিছু নেই (এবং যে জ্বালাকে সহজে চেনা যায় না), প্রথম দলের অভিজ্ঞতার বাইরে। তারা শাদামাঠা, গতানুগতভাবে জীবনযাপন করে, এবং 'ফল কি ফুল পাড়তে শুধু নাগাল ডাল নামায়'। 'নাগাল ডাল' শব্দদুটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে— এবং যদিও কবিতাংশটির প্রতীকতা অনস্বীকার্য, কিন্তু সমস্ত চিন্তা এখানে একটি মূর্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্পে বিধৃত হ'য়ে আছে ব'লে, আমরা প্রতীকটিকেও সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতে পারি। প্রতীকের অর্থ হ'ল: যারা অনুচ্চাকাঙ্ক্ষী, যাদের হাত 'নাগাল ডালে'র বাইরে যায় না, তারা কী ক'রে সেই 'মুখ'-কে দেখবে? এই স্তবকটির শেষ পংক্তি কিন্তু কথঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর। 'অনিদ রাতে'র মানে কী এখানে? যারা সেই 'মুখটি'কে দেখেনি, তাদেরই কোনও বিনিদ্র রজনী, যাদের কাছে দৃশ্যমান অন্ধকার প্রশ্নদীর্ণ হ'য়ে আন্দোলিত হয় না? কিন্তু পরিতৃপ্ত, সুখী, অনুচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সঙ্গে 'বিনিদ্র রাত্রি'-কে আমরা মিলিয়ে নেব কীভাবে? নাকি, 'অন্ধকার কেঁপে উঠতে পারে এমন অনিদ রাত'-ই তাদের জীবনে আসে না? দ্বিতীয় অনুমানটি অপেক্ষাকৃত তৃপ্তিকর, কিন্তু এই অনুমান করা আদৌ সংগত কিনা এ-বিষয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। এই প্রথম দলের লোকেরা 'সে মুখ' দেখেনি, এবং দেখেনি ব'লে তাদের কোনও দুঃখও নেই, অর্থাৎ, প্রকারান্তরে, তাদের প্রতি আগ্রহী হতে বারণ করা হচ্ছে আমাদের, কিন্তু আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত যা-ই হোক এই মুহূর্তে যারা 'ঝুমকোলতা দেয়ালে তোলে, মরাই রাখে ভ'রে', তাদের মোটামুটি ভালোই লাগে আমাদের। কারণ— আশ্চর্যের বিষয়— 'ঝুমকোলতা' শব্দটি এবং 'ল'-এর লাবণ্যময় অনুপ্রাস। লেখক 'ঝুমকোলতা' ব্যবহার ক'রে কবিতাটির থীম-কে, যেন প্রায় নিজের অজান্তেই, অবহেলা করেছেন, এবং বর্ণনাগুণে কবিতাটির স্নিগ্ধতা যেমন একদিকে বেড়ে গিয়েছে অন্যদিকে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য অংশত ব্যাহত হয়েছে।

তৃতীয় স্তবকে বলা হ'ল যে, 'সে মুখ' যার 'পড়েছে চোখে' সে কোনও অদ্ভুত বাউণ্ডুলে বা যোগব্রত সন্ন্যাসী নয়, সেও 'বসত করে পাঁচিল ঘিরে', ইত্যাদি। কিন্তু প্রথম দলের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য আছে, এবং এই পার্থক্য আছে ব'লেই সেই 'মুখ' তার চোখে পড়েছে। সুতরাং তৃতীয় পংক্তির শুরুতেই 'তবুও' শব্দটি নানাদিক থেকে তাৎপর্যময়। তবুও তার চোখের সামনে, তার জীবনে, এমন একটা কিছু ঘটে যা প্রথম দলে অকল্পনীয়। যা ঘটে, তাকে একটি সুন্দর চিত্রকল্পে গেঁথে দেওয়া হয়েছে: হতাশ হাওয়ার হাত তারার ছুঁচে একটি ছায়া সেলাই ক'রে টাঙায়। এক পলকে প্রথম স্তবকের 'তারা ছিটোন অন্ধকার'-এর কথা মনে পড়ে আমাদের, কিন্তু এখানে তারার ছুঁচে একটি স্পষ্ট উত্তর গাঁথা হ'য়ে চলেছে দেখে আমরা নতুন একটি অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হই। এই নতুন অভিজ্ঞতা হল সমস্ত কবিতাটিতে যে প্রশ্ন বা প্রশ্নমালা সাজানো হয়েছে তাকে উত্তীর্ণ হওয়ার অভিজ্ঞতা। সর্বশেষ পংক্তিতে

> যন্ত্রণার আগে 'প্রাণেশ্বরী' বিশেষণটি সুন্দর, এবং এই যন্ত্রণার উদ্‌যাপনের যত হতাশ হাওয়া-ই থাকুক; তার প্রধান অভিঘাত আমাদের চেতনার কাছে।

হাতুড়ির মতো একটি অমোঘ উত্তর নেমে আসে: 'প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণা'রই ছায়া গাঁথা হ'য়ে চলেছে, আকাশে, আকাশে তারই মুখ বিকীর্ণ হ'য়ে আছে আমাদের জীবনায়নে।

লক্ষণীয় যে, দ্বিতীয় স্তবকে 'যারা'— এই বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তৃতীয় স্তবকের নায়ক শুধু একটি ব্যক্তি। অর্থাৎ, প্রাণেশ্বরী যন্ত্রণার উপলব্ধি শুধু ব্যক্তিগত স্তরেই সম্ভব, এবং সেখানে জন-সংঘর প্রসঙ্গ অবান্তর। 'যারা' থেকে 'যার'-এ এই নিঃশব্দ উত্তরণ খুব শোভনভাবে ঘটেছে বলে মনে হয়। যন্ত্রণার আগে 'প্রাণেশ্বরী' বিশেষণটি সুন্দর, এবং এই যন্ত্রণার উদ্‌যাপনের যত হতাশ হাওয়া-ই ('হতাশ' শব্দটি কিছুটা নিরাশ করে আমাদের; মনে হয়, 'হতাশ' এখানে যথেষ্ট জরুরি নয়) থাকুক; তার প্রধান অভিঘাত আমাদের চেতনার কাছে। অর্থাৎ, যন্ত্রণাটি মূলত নঞর্থক নয়। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতার'র প্রসঙ্গ এই আলোচনায় সম্ভবত আসতে পারত, কিন্তু কবিতাটি আমার কাছে সব দিক থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয়েছে। তাছাড়া, 'প্রাণেশ্বরী' শব্দটিও 'জীবনদেবতা'র চেয়ে কম সুন্দর নয়।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়, চতুর্থ সংকলন, শ্রাবণ ১৩৭৩
থেকে পুনর্মুদ্রিত

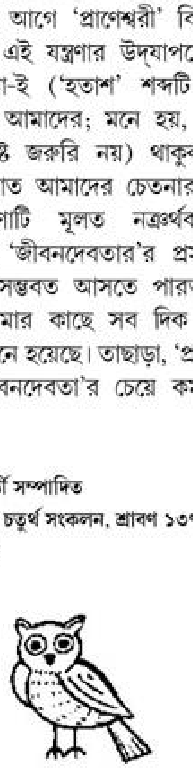

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা

নীচের প্রশ্ন-ক'টি পাঠিয়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন কবিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁরা যেন পৃথক-পৃথকভাবে অথবা একসঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন।
—সম্পাদক

১। আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করছে বলে আপনার মনে হয়? যদি করে, কীভাবে?

২। অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এসেছে বলে আপনার মনে হয়? অথবা কবিতাই ক্রমে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলার সমাজমানসে বাংলা কবিতার প্রভাব কী রকম বলে আপনি মনে করেন?

৩। কবিতায় আপনি যে-ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে মুখের ভাষার কোনও বিরোধ আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন? কবিতার ভাষাকে আপনি কি মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী? অথবা কবিতার এক নিজস্ব ভাষা-নির্মাণই আপনার লক্ষ্য? কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় বলে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ তাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

৪। জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হলে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা কি আরও বেশি লোককে আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে বলে আপনি মনে করেন?

৫। এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার?

কবির উত্তর

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

১। রাজনীতি আমার আসে না; এ-বিষয়ে আমার পড়াশুনোও খুবই সীমাবদ্ধ। তবে এখনকার 'রাজনৈতিক সচেতনতা' যে খুবই 'তীক্ষ্ণ' এ-বিষয়ে আমি অবহিত। আরও স্পষ্ট ক'রে বলা যায় যে, 'কবিতা লেখার সময়' তার কোনও পরোক্ষ প্রভাব আমার মনের মধ্যে কাজ করতেই পারে— তবে শেষপর্যন্ত কবিতায় যা প্রকাশিত হয়, তা সর্বদা হয়তো এই 'পরোক্ষ প্রভাবে'রও সমানুপাতিক নয়। 'তীব্র সামাজিক অস্থিরতা' বিষয়েও আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞান নই— চারপাশের বিবিধ ডামাডোল ও টানাপোড়েন তো স্পষ্টতই চোখে পড়ে। কোনও চিত্রকল্পে বা শব্দগুচ্ছে এই অস্থিরতা হয়তো চকিত ছুঁয়ে যায়; তবে আমার কবিতা— আমার যতদূর ধারণা— অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিস্তরঙ্গ, সুতরাং বাইরের সমস্ত অস্থিরতাই ঈষৎ রূপান্তরিত আমার কবিতায় সাড়া তোলে।

২। বাংলাদেশে যাঁরা কবিতা লেখেন বা লিখতে চান, মূলত তাঁরাই কবিতা প'ড়ে থাকেন। কোনও অবস্থাতেই, তাঁরা কবিতা সম্পর্কে উদাসীন নন। অন্তত আমার তো ধারণা।

কবিতা কখনওই সর্বতোভাবে সমাজ-বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। 'সামাজিক সমস্যা'-কে কোনও কবিতালেখক থীম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, সেখানে সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেক বেশি স্পষ্ট এবং explicit। কিন্তু 'সূর্যাস্ত' অথবা 'ময়ূর' বিষয়ে সার্থক কবিতা রচনা করেছেন— শব্দধারণায় এবং চিত্রকল্পপ্রয়োগের রীতিতে তিনিও হয়তো তাঁর সমকালীন সমাজ-মানসতার অনুবর্তী।— সংশ্লিষ্ট তৃতীয় প্রশ্নটির কোনও সঠিক উত্তর আমার জানা নেই।

৩। এই তর্কটি অবশ্য পুরনো। অনেক কবিতা-লেখক ও সমালোচক এবিষয়ে বিবিধ ভাষ্য রচনা করেছেন। দীর্ঘকাল আগে, আমি যখন প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম— তখন ঈষৎ কৃত্রিম, তথাকথিত 'কবিত্বময়' ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল। আমার প্রথম কবিতার বই 'এক ঋতু'-র বেশ কিছু কবিতা এই অনুরাগের ফসল। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সদর স্ট্রিটের বারান্দা'-র অধিকাংশ কবিতাই মূলত কথ্য ভাষায় রচিত। এখন কবিতার ভাষাকে আমি 'নিশ্চয় মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী'— কবিতার ভাষা যত সহজ স্বচ্ছন্দ হবে, আমার ধারণা, তত বেশি তার অর্থপরম্পরা নানাস্তরে আস্তীর্ণ হ'য়ে উঠবে। মাঝেমাঝে, বৈচিত্র্যের প্রয়োজন বা শৈলীর দাবিতে দু-একটি তৎসম বা ভারী শব্দ ব্যবহার করা যেতেই পারে— কিন্তু তাতে আগের বক্তব্য খারিজ হ'য়ে যায় না। মুখের ভাষায় বা কথ্য ভাষায় লিখলেও প্রত্যেক কবিই তাঁর বিশিষ্ট রীতিতে ভাষা ব্যবহার করেন— তাতে ব্যাকরণগতভাবে 'নতুন ভাষা' নির্মাণ হয় না বটে, কিন্তু ভাষা সম্পর্কে নতুন অনুভূতির অভিনিবেশ ঘটে। কবিতা বিষয়ে জনসাধারণের যে অভিযোগ, তা শুধু ভাষাভিত্তিক নয়— অর্থাৎ আধুনিক কবিতা সম্পর্কে সার্বিকভাবেই অনেকের মন-গড়া ভয়-ভাবনা আছে। তবে ভাষানির্ভর যে অভিযোগ তাকে দুভাবে দেখা যেতে পারে: এক, কোনও-কোনও সার্থক আধুনিক কবিতায় যখন দুরূহ শব্দ ব্যবহৃত হয়— যেমন 'অপাপবিদ্ধমস্নাবির', বা— এমনকি— 'পাতী অরণ্য', তখন অনেক পাঠকই বিভ্রান্ত বোধ করেন: দুই 'সাধারণ পাঠক' কখনও কখনও আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটি শব্দের অর্থ অনুধাবন করতে পারেন, অথচ সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ ব'লে 'আধুনিক কবিতা' বিষয়টির প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়েন। 'O rose, thou art sick' বা 'উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা এসে'— এই ধরণের পংক্তির উল্লেখ করা যায় এই প্রসঙ্গে। অর্থাৎ সেখানে প্রতিটি শব্দের অভিধার্থ তিনি বুঝতে পারছেন, অথচ ব্যঙ্গার্থের অনুরণনে আবিষ্ট হ'তে পারছেন না, ঠিক সেখানেই এই সমস্যা দেখা দেয়। আমার মনে হয়, এইটেই প্রধান সমস্যা।

৪। পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে কীভাবে লেখা হবে, তার ওপর। অর্থাৎ কবিতাকে প্রথমত কবিতা হ'তে হবে— কিন্তু তার সঙ্গে সমকালীন প্রসঙ্গের কোনও মৌলিক বিরোধিতা নেই। আধুনিক কবিতা বুঝতে হ'লে, পাঠককে আকৃষ্ট করা কোনও কাজের কথা নয়; তবে কবিতার শিকড় যদি জীবনের আরও নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাহ'লে তো ভালোই।

৫। আমি সত্যিই জানি না। ব্যক্তিগতভাবে, আমি কখনও কবিতা লিখতে পারি, কখনও পারি না— যখন লিখতে পারি না, তখন 'এখনকার এই সময়ে'র জন্য পারি না, না অন্য কারণে, সে-বিষয় স্পষ্ট কোনও উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক অ-মসৃণ সময়েও সুকবিতা রচিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, কবি মাত্রই কখনও কখনও কবিতার দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে পড়েন— তখন না লিখে তাঁর উপায় থাকে না। অযথা বিরক্ত ক'রে তাঁর রচনা কিছুদিনের জন্য থামিয়ে দেওয়া যায় মাত্র। তবে, চারপাশে যদি তীব্রস্বর আলোড়ন চলতে থাকে, তখন অনেক সময়েই কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে না।

কবিতা-পরিচয়, দ্বাদশ সংকলন, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭ থেকে পুনর্মুদ্রিত

কালিদাস রায়, কবিশেখর

শরৎ প্রসঙ্গ

শরৎচন্দ্র যখন বালিগঞ্জে থাকিতেন, তখন প্রায়ই তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা হইত। শরৎচন্দ্র একদিন বলিলেন— ওহে তুমি ত খুব ভাষা নিয়ে আলোচনা কর। আমার ভাষাটা তোমার কেমন লাগে? আমি ত ভাই ব্যাকরণ ট্যাকরণ অত জানি না।

আমি বলিলাম— ভাষা আপনার স্বচ্ছ সরস। কৌতুকরসে সমৃদ্ধ। কথা সাহিত্যের আদর্শ ভাষাই বলতে পারা যায়। আর প্রায় নির্দোষই বলা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্র বলিলেন— প্রায় বললে। তবে দোষ কিছু কিছু নিশ্চয় আছে। কি কি দোষ বল দেখি।

আমি বলিলাম— ব্যাকরণ দোষ দু এক স্থানে আছে— সেটা ধর্তব্যই নয়। ব্যাকরণ দোষ আপনার চেয়ে বঙ্কিমবাবুর রচনায় ঢের বেশী আছে। আমি সে দোষ ধরছি না। আপনার লেখায় অসমাপিকার 'ইয়া'র ব্যবহার অত্যন্ত বেশী।

শরৎচন্দ্র বলিলেন— সত্যই তো বটে। কিন্তু উপায় কি? মার্জিত ভাষায় লিখতে গেলে এড়ানোর উপায় কি?

আমি বলিলাম— আগেকার লেখকরা বারবার 'ইয়া'র ব্যবহার এড়াবার জন্য পূর্বক, করণান্তর, করতঃ ইত্যাদি লাগাত। বর্তমান সময়ে বাক্যগুলিকে ভেঙে ভেঙে বলাই বোধহয় ভালো!

শরৎচন্দ্র বলিলেন— আমিও ত তাই করি। তবে অনেক স্থলে বাক্যগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে বললে সংহতির অভাব হয়— কেমন যেন এলিয়ে পড়ে। সেজন্য মাঝে মাঝে দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করতে হয়। তখন 'ইয়া'র সংখ্যা বেড়ে যায়। ওটা আমারও কানে যে লাগে না তা নয়।

আমি বলিলাম— মার্জিত ভাষায় লিখতে হলে যে ক্রিয়াপদগুলি চলতি ভাষার নিজস্ব, সেগুলো বর্জন না করলে ইয়ার জন্য ভাষা অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

শরৎচন্দ্র বলিলেন— দৃষ্টান্ত দিয়ে বল।

আমি বলিলাম— যেমন ধরুন— চেয়েচিন্তে উঠতে-বসতে, বিনিয়েবিনিয়ে, কেঁদেকেটে ইত্যাদি ক্রিয়াপদ মার্জিত ভাষায় ব্যবহার করতে গেলেই চাহিয়া চিন্তিয়া, উঠিতে বসিতে, বিনাইয়া বিনাইয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া ইত্যাদি লিখতে হয়। আপনার লেখাতে এইসব 'ইয়া'ও আছে। এগুলোকে মার্জিত ভাষার উপযোগী করবার জন্য ইয়া যোগ করতে হয়। এগুলো এড়ানোই উচিত।

শরৎচন্দ্র বলিলেন— রবীন্দ্রনাথও এগুলো বর্জন করেননি। তিনিই ত লিখেছেন: উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত শুনেও শোনে না কানে।

আমি বলিলাম— রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান করেছিলেন। পরে তা বলছি।

মার্জিত ভাষার যেমন কতকগুলো নিজস্ব ধাতু আছে— চলতি ভাষারও তেমনি কতকগুলো নিজস্ব ধাতু আছে— সেগুলোকে মার্জিত ভাষায় ঠাঁই না দেওয়াই ভালো।

শরৎচন্দ্র— যেমন—

আমি— যেমন, মুচড়া, দুমড়া, ফুস্‌লা, আঁকড়া তাঙ্গড়া, হাতড়া ইত্যাদি। দুমড়াইয়াছিল, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া, আঁকড়াইয়া ধরিয়া ইত্যাদি ক্রিয়াপদ মার্জিত ভাষায় না চললেই ভালো হয়। এসব ধাতুতে মার্জিত ভাষার ক্রিয়া বিভক্তি প্রয়োগ অশোভন।

শরৎচন্দ্র— রবীন্দ্রনাথ যখন মার্জিত ভাষায় লিখতেন, যেমন গল্পগুচ্ছের যুগে তিনিও ইয়ার ব্যবহার করতেন ঘন ঘন— আর চলতি ভাষার ধাতুতে মার্জিত ভাষার ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করতেন।

আমি— হাঁ তা করতেন। পরে তিনি বুঝলেন ঘনঘন 'ইয়া'র প্রয়োগ এড়াতে গেলে এবং চলতি ভাষার ক্রিয়াগুলোকে কাজে লাগাতে গেলে মার্জিত ভাষাই ত্যাগ করতে হয়। তিনি শেষ পর্যন্ত সবই চলতি ভাষাতে লিখতে লাগলেন। শুধু গল্প উপন্যাস নয়— সব লেখাই তিনি চলতি ভাষায় লিখে গেছেন।

শরৎচন্দ্র— গল্প উপন্যাস চলতি ভাষাতে লিখেছেন— তা ভালোই করেছেন— কিন্তু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধগুলো মার্জিত ভাষায় লিখলেই ভালো করতেন।

আমি— রবীন্দ্রনাথের গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের ভাষা প্রকৃত পক্ষে কিন্তু চলতি ভাষায় লেখা নয়— কেবল ক্রিয়াপদগুলো চলতি ভাষায়, বাকি সবই মার্জিত ভাষায় লেখা।

শরৎচন্দ্র— সবই যদি মার্জিত ভাষায় তবে ক্রিয়া পদগুলোকে চলতি ভাষায় রাখলেন কেন?

আমি— বোধহয় ঘনঘন 'ইয়া'র প্রয়োগ এড়াবার জন্য।

শরৎচন্দ্র— মার্জিত ভাষার ক্রিয়া বিভক্তিগুলোকে

তিনি একেবারেই চির বিদায় দিতে চান। আমি কিন্তু একেবারে বিদায় দিতে চাই না। লেখকের ভাষা ও পাত্র-পাত্রীর মুখের ভাষা একরূপ হয়— তা আমি চাই না।

দুই ভাষা ভঙ্গীর মিলনে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়— তাতে কথা সাহিত্য ভালোরূপ জমে ওঠে বলেই আমার মনে হয়।

শরৎচন্দ্র একদিন বলিলেন— ওহে এখন দেখছি শুধু গল্প উপন্যাস লিখতে জানলেই চলে না। কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদিও লিখতে পারলে ভালো হয়।

আমি— একথা কেন বলছেন বুঝলাম না।

শরৎচন্দ্র— এই দেখ না, আমি আর ঠিক উপন্যাস লিখতে পারছি না— অথচ আমার অনেক কথা বলবার রয়েছে— সে সব কথা উপন্যাসের পক্ষে খুব favourable নয়। প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস থাকলে প্রবন্ধে বলতাম। কবিতা লেখার অভ্যাস থাকলে কবিতায় বলতাম। বক্তৃতা করবার ক্ষমতা থাকলে সভায় সভায় বক্তৃতা ক'রে মনের ভার লঘু করতাম।

আমি— কেন উপন্যাসের মধ্য দিয়েও আপনি অনেক কথাই বলছেন।

শরৎচন্দ্র— বলছি। কথাগুলো বলা হচ্ছে। কিন্তু উপন্যাস অর্থাৎ আর্ট কি ঠিক হচ্ছে।

আমি— ঠিক উপন্যাস হচ্ছে কিনা তা আমি বলতে পারি না— তবে উপন্যাসের ভঙ্গীতে এক শ্রেণীর আর্ট হচ্ছে।

শরৎচন্দ্র— ছাই হচ্ছে। জিনিষটা বোঝ ভালো ক'রে। আমি জীবনের সঙ্গে জীবনের, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের দ্বন্দ্ব দেখিয়ে যা লিখতাম তাই হ'ত আসল উপন্যাস। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবনী শক্তি আসছে কমে— কাজেই যে চরিত্রগুলির সৃষ্টি করছি— তাতে ঠিক জীবন সঞ্চার করতে পারছি না। হঠাৎ কাল শুয়ে শুয়ে তাই মনে হ'ল।

আমি— তবে এখনকার লেখায় কি জীবনের যোগ নেই বলছেন— এগুলোতেও ত বেশ দ্বন্দ্ব রয়েছে।

শরৎচন্দ্র— দ্বন্দ্ব ত রয়েছেই— কিন্তু এ দ্বন্দ্ব জীবনের সঙ্গে জীবনের দ্বন্দ্ব নয়— এ যেন মতের সঙ্গে মতের দ্বন্দ্ব। তার ফলে action কমে আসছে— বাক্যই বেড়ে যাচ্ছে। পাত্র-পাত্রীর মুখে বক্তৃতার আকার হচ্ছে দীর্ঘতর।

আমি— রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের উপন্যাসগুলোও ত তাই— মতের সঙ্গে মতের দ্বন্দ্ব, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের দ্বন্দ্ব। action কম, কথা কাটাকাটাই বেশী। তা বলে ওগুলো সৎসাহিত্য হচ্ছে না তা ত নয়।

শরৎচন্দ্র— যে সাহিত্যই হোক আসল উপন্যাস হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়, চোখের বালি, নৌকাডুবি যদি আসল উপন্যাস হয়— তবে ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, দুইবোন আসল উপন্যাস নয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক কথা বলবার আছে— তিনি অনায়াসে প্রবন্ধে কবিতায় বলতে পারতেন— তাঁর ত প্রকাশের পন্থার অভাব নেই। আমার ন্যান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। আমাকে এই বয়সেও উপন্যাসের রূপেই আত্মপ্রকাশ করতে হচ্ছে।

আমার কি মনে হয় জান। পঞ্চাশের পর আর আমাদের জীবনীশক্তি বিশেষ থাকে না— তখন আমরা আর জীবন্ত চরিত্রের সৃষ্টি করতে পারি না— কবি বা আর্টিষ্ট আর থাকি না— গুরুর গদি পেয়ে যাই। তখন যাই করি না কেন সবই গুরুগিরির রূপ ধরে। যে সব কথা নিয়ে রস সৃষ্টি করতে পারিনি— সে সব কথার উপর মায়া কম থাকে না। সেগুলোকে একেবারে বিদায় দিতে পারি না— সেগুলো দিয়ে এমন কিছু গড়ি যা আনন্দ দেওয়ার জন্য— ঠিক নয়, চিত্তোৎকর্ষসাধনে সাহায্য করার জন্য।

আমি— বঙ্কিমের শেষ জীবনেও তাই হয়েছিল। তিনি উপন্যাস আর লিখতে পারলেন না। অথচ তাঁর চিত্তে চিন্তা ছিল পুঞ্জীভূত হয়ে। সেগুলো দেশকে না দিয়ে তিনি ত মুক্তি পেতে পারেন না— তিনি তা প্রবন্ধের আকারে দিতে থাকলেন। তিনি ছিলেন আর্টিষ্ট হলেন তাত্ত্বিক। উপন্যাসের মধ্যেই শেষটা তত্ত্বপ্রচার আরম্ভ হয়েছিল। তিনি ছিলেন সুহৃদ— হলেন গুরু। পঞ্চাশোর্দ্ধে সকল আর্টিষ্টেরই বোধ হয় এই পরিণতি হয়।

শরৎচন্দ্র— আমাদের দেশে তাই— ইউরোপে তা নয়। এত শীঘ্র আর্টিষ্টের সম্বল ফুরোয় না। দেখ আমার মনে হচ্ছে— আমার দেখা জানা মানুষগুলোর জীবনচিত্র দেওয়া ফুরিয়ে গেছে— এখন উপন্যাস লিখতে গেলে তাদের পুনরাবৃত্ত করতে হয়। পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্য আমাকে এখন কল্পনা ও চিন্তার সাহায্য নিতে হচ্ছে।

আমি— আপনার দেখা জানা নর-নারীর কথা ফুরিয়েছে হয়ত— কিন্তু আপনার দেখাও ফুরোয়নি নর-নারীও ফুরোয়নি। নূতন যুগের নর-নারীদের দেখুন— তাদের জীবন-চিত্র আঁকবেন। তাদের দিয়ে আসল উপন্যাস আবার হয়ত হবে।

শরৎচন্দ্র— দেখা ফুরোয়নি— কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হয়ে গেছে ক্ষীণ— আর, নূতন নূতন নর-নারীর অভাব নেই সত্য, কিন্তু এরা সব যেন অনাত্মীয়— এদের ভিতর পর্যন্ত দেখতে পাই না। দেখাটাও একটা শক্তির ক্রিয়া— চিত্রাঙ্কনেও আমাদের প্রয়োজন হয়— বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটা আলস্যও আসে।

এখনো কবিতা লিখছ ভাই— পঞ্চাশ পার হলেই তখন আর নূতন প্রেরণা পাবে না। আপনিই কবিতা লিখবার প্রবৃত্তি কমে আসবে। কলম অবশ্য থামবে না— তখন লিখবে প্রবন্ধ। অনেক ভেবেছ ত কাজেই হয়ে পড়বে প্রবন্ধকার। রবীন্দ্রনাথের অত অফুরন্ত শক্তি আর কার আছে?

প্রতাপকুমার রায় সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'কালান্তর' ২ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ থেকে রুবি রায়ের সানন্দ সম্মতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত। বানান অপরিবর্তিত।

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের ৩৫৬নং স্টলে

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। সহস্রাধিক পাতা। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

তৃতীয় মুদ্রণ। ₹৩৫০

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-Mail:** info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট),
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ব র ণী য় লে খ কে র স্ম র ণী য় স ঙ্গ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

। পর্ব ৯।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সান্নিধ্যে

অল্পবয়সে প্রকাশন জগতে প্রবেশের ফলে, কলেজে পড়ার সময়েই আমার সাহিত্য-জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হল।

আমার এই কর্মজগতের প্রথমদিনের অভিজ্ঞতার কথা বলি।

আমি গিয়ে কাউন্টারের কাছে একটি টেবিলে সহকর্মী দাদার কাছে কাজ শেখার চেষ্টা করছি। এমন সময়ে এক প্রবীণ ব্যক্তি এসে দাঁড়ালেন কাউন্টারের সামনে। একহাতে একটি কাপড়ের ব্যাগ, আরেক হাতে বেতের ছাতা। মুখমণ্ডল প্রসন্ন না বিরক্ত সহজে বোঝার উপায় নেই, কারণ একটি বিরাট গোঁফ অভিব্যক্তি বোঝার পথ আটকে রেখেছে।

প্রবীণ মানুষটি সহকর্মী দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে ঘর খালি দেখছি, গজেন আসেনি? গেল কোথায় সব?

'গজেন' অর্থাৎ গজেন্দ্রকুমার মিত্র তখন তাঁর মাকে দেখতে হরিদ্বার গিয়েছেন। সুমথনাথ ঘোষ অর্থাৎ প্রকাশন সংস্থার আরেক কর্তা আসেননি শরীর খারাপ বলে। সহকর্মী দাদা তা-ই বললেন, আরও জানালেন, গজেনমামা তো কলকাতায় নেই, মাকে দেখতে হরিদ্বার গিয়েছেন।

প্রবীণ মানুষটি ছাতাটি দরজায় টাঙিয়ে রেখে কাউন্টারের ওপরেই উঠে পা মুড়ে বসে পড়ে বিরক্তি সহকারে বললেন— ধুস, তাহলে তো আজকের দিনটাই মাটি, আড্ডাই জমবে না— এখন বাজারে নেই খরিদ্দার, গজেন গেল হরিদ্বার।।

আমি চমকিত হলাম। এত সহজে, হোক দুই লাইনের, কবিতা বা ছড়া বানানো যায়! এ অভিজ্ঞতা আমার কাছে অভিনব।

সহকর্মী দাদা আমাকে নিম্নস্বরে প্রবীণ মানুষটির পরিচয় দিলেন— ইনি আর কেউ নন, কবিশেখর কালিদাস রায়।

আমাদের মাতুলালয় ছিল পার্ক সার্কাসে। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পর এলাম দক্ষিণ কলকাতার তদানীন্তন শহরতলি ঢাকুরিয়ায়। ঢাকুরিয়ায় এসে একটি স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। তখন শিক্ষকরা ছাত্রদের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তাঁরাই বাড়িতে জানালেন, ছেলেটি পড়াশুনোয় মন্দ নয়, আপনারা একটু নজর দেবেন।

নজর দেওয়ার অর্থ তো টিউটর রাখা। মা বললেন, দিন কাটছে তো ভাইদের আশ্রয়ে, তাদের বলি কী করে, ছেলের জন্য মাস্টার রাখো। তাঁর মনে পড়ল, পাড়াতেই লেখক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের পত্নী প্রতিমা দেবীর অবৈতনিক পাঠশালায় বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকটি ছেলেমেয়ে পড়ে। মা তাঁর কাছেই গিয়ে পড়লেন আমায় পড়ানোর ব্যাপারে। প্রতিমা দেবী তখনকার বেথুন কলেজের অনার্স গ্র্যাজুয়েট। আমি তাঁর পাঠশালায় ভর্তি হয়ে গেলাম। মায়ের সেই চেষ্টার

যে কেশভার-সমন্বিতা মাতৃদেবী স্নানে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরলেন মুণ্ডিত-মস্তক হয়ে... এই ঘটনার বর্ণনা আছে গজেন্দ্রকুমারের 'আদি আছে অন্ত নেই' বইয়ে।

ফলেই আমার প্রতিমা দেবীর ছাত্র হওয়া এবং সেইসঙ্গে বাংলার বরণীয় সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে আসা।

নবম শ্রেণীতেই পড়ার সময়ে গজেন্দ্রকুমারকে কেন্দ্র করে আমার একাধিক সাহিত্যিককে দেখার সুযোগ হয়ে গেল— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুমথনাথ ঘোষ এবং আরও অনেককে।

এই যোগসূত্র অব্যাহত রইল প্রতিমা দেবীর জন্যই। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর যখন সকালে চাকরি করব আর রাত্রে কলেজে পড়ব ঠিক করেছি, তখন প্রতিমা দেবীই অগ্রণী হয়ে আমার জন্য মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্সে সকালের কাজ ঠিক করে দিলেন। আপনাদের সম্ভবত অজানা নেই— এই প্রকাশন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন দুই সাহিত্যিক বন্ধু— গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ।

এইভাবে সেই ষোলো বছর বয়সেই প্রকাশন জগতে ঢুকে পড়ায় আমি খুব কাছ থেকে তদানীন্তন একাধিক সাহিত্য-মহারথীদের দেখতে পেয়েছিলাম। আর দীর্ঘদিন এই জগতে থাকার ফলে, তাঁদের অনেকের প্রথম উন্মেষ না হোক, প্রথম সকাল থেকে পূর্ণ বিকাশ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

এঁদের মধ্যে অন্যতম দুজন হলেন— গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও আশাপূর্ণা দেবী। এই সময়ে আরও কয়েকজন কথাসাহিত্যিক এসেছেন।

বস্তুতপক্ষে এরকম একটি সমৃদ্ধ সময়কাল যে-কোনও জাতির পক্ষেই গর্বের বিষয়। উল্লেখ করার মতো ঘটনা। নামগুলি জন্মকাল সহ পরপর বলে যাই. লীলা মজুমদার— ফেব্রুয়ারি ১৯০৮, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— মে ১৯০৮, গজেন্দ্রকুমার মিত্র— নভেম্বর ১৯০৮, বুদ্ধদেব বসু— নভেম্বর ১৯০৮।

এর পরে-পরেই পরের বছরের গোড়ায় ৮ জানুয়ারি, ১৯০৯-এ আশাপূর্ণা দেবী এবং ১৬ জুলাইয়ে বিষ্ণু দে।

এরকম সমৃদ্ধ সময় কোনও জাতির ইতিহাসে বড় একটা আসে না। আমি জানি না, আজ থেকে একশো বছর পরে এইরকম গৌরবান্বিত যুগকে কোনওভাবে স্পর্শ করতে না পারার জন্য আমাদের উত্তরসূরিরা আপশোস করবে কিনা।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের জীবনের কথা বলি।

গজেন্দ্রকুমারের জন্ম ১৯০৮ সালের ১১ নভেম্বরে। উত্তর কলকাতায়। তাঁর যখন মাত্র তিন বছর বয়স তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। পিতা ধনী হলেও তাঁর মা ছিলেন পিতার দ্বিতীয়-পক্ষ। পিতৃবিয়োগের সময়ে প্রথমপক্ষের স্ত্রী জীবিত থাকায় এবং তাঁর পিতৃকুল সহায়শালী হওয়ায়, গজেন্দ্রবাবুর মাতৃদেবী মাত্র পঞ্চাশ টাকা খোরপোশের বিনিময়ে বাকি সম্পত্তির ওপর না-দাবিনামা লিখে দিতে বাধ্য হন।

মাসিক পঞ্চাশ টাকা তখনকার দিনে খুব কম নয়। তবু-নাবালক তিনটি ছেলেকে মানুষ করার দায়িত্ব, কলকাতায় বাড়িভাড়া করে কতদিন টানতে হবে, এইসব ভাবনাচিন্তা করে গজেনবাবুর মা সুধীরাবালা ছেলেদের নিয়ে কাশীবাসের সংকল্প করলেন। বারাণসী বা কাশী তখনকার দিনে সস্তা-গন্ডার দেশ। আর বাঙালিদের কাছে— যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি, তেষাং বারাণসীং গতি।

কাশীতে এক নতুন জীবন শুরু হল— সুধীরাবালা ও তাঁর তিন নাবালক পুত্রের। বড় ও মেজ ভর্তি হলেন কাশীর অ্যাংলো বেঙ্গলি স্কুলে। গজেন্দ্রকুমার নিতান্তই শিশু। বাড়িতে বর্ণপরিচয় হয়। সুধীরাবালার বই পড়ার অত্যুগ্র নেশা ছিল। তখনকার দিনে অভাবের মধ্যেও 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' আনিয়ে পড়তেন। গজেন্দ্রকুমার বর্ণপরিচয় শেখার পরেই মায়ের পঠিত বই ওলটাতে শুরু করলেন। সেইভাবেই বোঝা না-বোঝার মধ্যে দিয়েই গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সাহিত্যপাঠে প্রবেশ শুরু হল।

শৈশবে পিতৃহীন হওয়ার আঘাত গজেন্দ্রকুমার ততটা বুঝতে পারেননি। কিন্তু কাশীতে আসার পর যে আঘাতে তাঁর বুক ভেঙে গিয়েছিল সেটি অন্য এক ঘটনা।

মা সুধীরাবালা দেখতে অসামান্য সুন্দরী ছিলেন। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার আগে গঙ্গায় স্নান করে উঠেছেন। একটি অবাঙালি ব্যক্তি মন্তব্য করে— এমন রূপ! যে কোনও ধনী ব্যক্তি এই রমণীকে পেলে রানী করে রাখবে।

সুধীরাবালা অতিশয় তেজস্বী রমণী ছিলেন। তখনই আবার ঘাটে গিয়ে কর্মরত পরামানিকের কাছে গিয়ে মস্তক মুণ্ডিত করে আবার স্নান করলেন। তারপর মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরলেন। যে কেশভার-সমন্বিতা মাতৃদেবী স্নানে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরলেন মুণ্ডিত-মস্তক হয়ে, সে দৃশ্য দেখে গজেন্দ্রকুমার হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরই তাঁর দু-চোখ বেয়ে নেমে এল অশ্রুবারি। সে জল বহুক্ষণ ধরে অবিরল পড়ে চলল। বহুকষ্টে মা বোঝালেন, কেন মাথার ওই বিপুল কেশরাশি ফেলে দিতে হল।

এই ঘটনার বর্ণনা আছে গজেন্দ্রকুমারের 'আদি আছে অন্ত নেই' বইয়ে। আসলে সার্থক কথাকার মাত্রই এইভাবে নিজের জীবন ভেঙে ভেঙে সাহিত্য গড়ে তোলেন। এক সমালোচক এই প্রসঙ্গেই বলেছেন— every author recreates himself in his works.

দাদাদের মতো গজেন্দ্রকুমারও কাশীর অ্যাংলো বেঙ্গলি স্কুলে ভর্তি হলেন। এখানে এক নতুন অভিজ্ঞতায় তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবনের উন্মেষ ঘটল।

কোনও ক্লাসে মাষ্টারমশাই না এলে স্বভাবতই ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে গল্পগুজব শুরু করে দিত। পাশের ক্লাস- ঘরগুলিতে পড়াশুনোর ব্যাঘাত ঘটত। গজেন্দ্রকুমারের ক্লাসে একদিন এইরকম গোলমাল চলছে। স্বয়ং প্রধানশিক্ষক ক্লাসঘরে ঢুকে বকুনি দিলেন। ছাত্ররা চুপ করল। প্রধান শিক্ষক অভিজ্ঞ মানুষ, বুঝলেন এ নীরবতা ক্ষণস্থায়ী। তখন তাদের বললেন, একজন করে একেকটা গল্প বল, অন্যেরা শোন। কে গল্প বলতে পারবি, উঠে দাঁড়া।

কেউ ওঠে না দেখে গজেন্দ্রকুমার উঠে দাঁড়ালেন। প্রধানশিক্ষক বললেন, তুই পারবি? বেশ বল।

গজেন্দ্রকুমার তাঁর পঠিত গল্পের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে বলে চললেন। সহপাঠীরা মন্ত্রমুগ্ধ, প্রধানশিক্ষক চমৎকৃত। এরপর কোনও ক্লাসে শিক্ষক অনুপস্থিত হলেই গজেন্দ্রকুমারের ডাক পড়ত, গল্প বলতে হবে। তা নিজের ক্লাসে হোক বা উঁচু ক্লাসেই হোক। আর নিজের ক্লাস হলে তো কথাই নেই। ভবিষ্যৎ কথাশিল্পীর গল্পবয়ন-ক্ষমতার হাতেখড়ি এইভাবে বারাণসীর বিদ্যালয়েই শুরু হল।

মেজদা শুভেন্দ্রকুমার বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হলে, তাঁর উচ্চশিক্ষার জন্যই সুধীরাবালা মেজ ও ছোট ছেলেকে নিয়ে কলকাতা ফিরলেন। বড় ধ্যানেন্দ্রকুমার বোহেমিয়ান চরিত্রের গুণে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে চলে যান, মায়ের মত না নিয়েই। কাশী থেকে তাঁরা প্রথমে আন্দুলে থাকেন কিছুদিন। আন্দুল তখন নিতান্তই পল্লীগ্রাম। তারপর কলকাতায় প্রথমে নারকেলডাঙায় শেষে ঢাকুরিয়ায় পাকাপাকি আবাস গড়লেন তাঁরা। মেজ শুভেন্দ্রকুমার ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার্সে। গজেন্দ্রকুমার ভর্তি হলেন বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনে। বসলেন সুমথনাথ ঘোষের পাশে। এই সাহচর্য তাঁদের অটুট ছিল সুমথনাথ ঘোষের শেষ জীবন পর্যন্ত।

গজেন্দ্রকুমার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাঁর মেজদা তাঁর নিজের মতোই সেন্ট জেভিয়ার্সে বিজ্ঞান শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন। আবাল্য যাঁর মন সাহিত্যরসে নিমজ্জিত, তাঁর বিজ্ঞান পড়ায় মন বসবে কেমন করে। মাঝপথে পড়া ছেড়ে সাহিত্য-সাগরে জীবনতরী ভাসালেন। সহায়ক জীবিকার জন্য বেছে নিলেন নানারকম কাজ। তার মধ্যে বিভিন্ন পুস্তক-প্রকাশকের স্কুলবই ক্যানভাসিং অন্যতম। লেখা, সেইসঙ্গে নিজের খরচে সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করা এবং ক্যানভাসিং সব একসঙ্গে চলল। এই কাজে দোসর করে নিলেন গজেন্দ্রকুমার সহপাঠী সুমথনাথকে।

স্কুল-ক্যানভাসিংয়ের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। সেসময় পেরিয়ে গেলে দুই বন্ধু নতুন-পুরনো সাহিত্যগ্রন্থ ট্রাঙ্কে ভরে বেরিয়ে পড়েন— ধানবাদ, গয়া, পাটনা, ভাগলপুরের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে বই বিক্রি করতে। এইভাবে বই বিক্রির লাভ থেকে মূলধন সংগৃহীত করে গড়ে তুললেন তাঁদের প্রকাশন প্রতিষ্ঠান। এসবই আমার শোনা কথা, তবে একশোভাগ সত্য। পরে এই দুজনকে সামনাসামনি দেখবার সুযোগ পেয়ে, গজেন্দ্রকুমারের সস্নেহ অভিভাবকত্বের আশ্রয়ে তাঁর আত্মনির্মিতির পর্ব আরও বেশি করে বুঝতে পারি।

স্কুলবই ক্যানভাসিংয়ের অভিজ্ঞতা যে বৃথা যায়নি তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে গজেন্দ্রকুমারের নানা ছোট গল্পে, উপন্যাসে। কত লোভী শিক্ষক দেখেছেন, ক্যানভাসারদের কাছ থেকে সংগৃহীত বই অন্যত্র বিক্রি করে দেন। আবার কত দরিদ্র শিক্ষক দেখেছেন, যাঁরা প্রয়োজনের বেশি বই রাখেন না। বিনা বেতনে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের ক্লাস শেষ হওয়ার পরেও পড়া দেখিয়ে দেন। গ্রামীণ কুসংস্কারান্ধ সমাজব্যবস্থায় এবং ধর্ম ও জাতপাতের সমস্যাদীর্ণ জগতে একেকজন শিক্ষকের উজ্জ্বল পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর 'মনে ছিল আশা', 'রাত্রির তপস্যা', 'জন্মেছি এই দেশে' প্রভৃতি উপন্যাসে।

১৯৪৯ সালে সুমথনাথ ঘোষ ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যকে নিয়ে 'কথাসাহিত্য' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ সম্ভব করেন, যে পত্রিকাটি তাঁদের প্রকাশন প্রতিষ্ঠানে সদাচর্চিত সাহিত্যিক আড্ডার অন্যতম ফসল।

গজেন্দ্রকুমার সব্যসাচীর মতোই একদিকে 'কলকাতার কাছেই উপকণ্ঠে', 'পৌষ ফাগুনের পালা'র মতো ট্রিলজি লিখছেন, 'আমি কান পেতে রই', 'পূর্বপুরুষ'-এর মতো সামাজিক উপন্যাস লিখছেন, আবার অন্যদিকে 'বহ্নিবন্যা'র মতো ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় নিমগ্ন।

আমি আগে বলেছি, গজেন্দ্রকুমারের অনেক গল্প-উপন্যাসেরই ভিত্তি নিজের লব্ধ অভিজ্ঞতার ওপর। কাশী থেকে ফিরে কলকাতায় বাস করার আগে তাঁরা বছর দুই আন্দুল-মৌড়িতে ছিলেন। এখানকার জীবনের স্মৃতি তাঁর ট্রিলজির অন্যতম পটভূমি তৈরিতে সহায়ক হয়েছে। 'আমি কান পেতে রই' ও 'পূর্বপুরুষ' উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলিও তাঁর দেখা। অর্থনীতির বিখ্যাত অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত বাঙালি সমাজের বিধবা নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, আমি গজেনবাবুর এইসব উপন্যাস থেকে আমার এবং আমার ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার অনেক সূত্র পেয়েছি।

গজেন্দ্রকুমার ঐতিহাসিক রচনাতেও তাঁর দেখা অভিজ্ঞতা কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন বলি।

তখন ওঁর 'বহ্নিবন্যা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশী ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র উভয়েই অতুলচন্দ্র গুপ্ত মশাইয়ের বাড়ি যেতেন। অতুলচন্দ্র বিখ্যাত ব্যবহারজীবী, অ্যাডভোকেট আবার সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসজ্ঞও বটে। তাঁর 'নদীপথে' রচনাটি যিনিই

সুমথনাথ ঘোষ

গজেন্দ্রকুমার ভর্তি হলেন বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনে। বসলেন সুমথনাথ ঘোষের পাশে। এই সাহচর্য তাঁদের অটুট ছিল সুমথনাথ ঘোষের শেষ জীবন পর্যন্ত।

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন

প্রতুলবাবু বললেন, আরে, এই তো আপনি ঐতিহাসিক চরিত্র নানকচাঁদকে নিয়েছেন, তাঁর বাড়ির এই নিখুঁত বর্ণনা কোথায় পেলেন?

পড়বেন, তিনি স্বীকার করবেন এরকম বই বাংলা সাহিত্যে দুটি নেই। তাঁর পুত্র প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং লেখকদের ঐতিহাসিক মালমশলার জোগানদার। লেখকরা পিতা-পুত্র দুজনের কাছেই আড্ডা জমাতেন। গজেনবাবু একদিন আমাকে সঙ্গী করে প্রতুলবাবুর কাছে গেছেন। গিয়ে দেখি, টেবিলের ওপর বিস্তর বই। প্রতুলবাবু তাঁর সহযোগী শোভনবাবুকে নিয়ে কী যেন খুঁজছেন। পাশে 'বহ্নিবন্যা'টা রাখা। গজেনবাবুকে দেখে প্রতুলবাবু বলে উঠলেন, দেখুন তো আপনার জন্যে আমরা কীরকম হিমসিম খাচ্ছি।

গজেনবাবু বিস্মিত হয়েই বললেন, কেন কী হয়েছে? 'বহ্নিবন্যা' বইটা তো দেখছি যে টেবিলে!

প্রতুলবাবু বললেন, আরে, এই তো আপনি ঐতিহাসিক চরিত্র নানকচাঁদকে নিয়েছেন, তাঁর বাড়ির এই নিখুঁত বর্ণনা কোথায় পেলেন? আমি আর শোভন তন্নতন্ন করে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

গজেনবাবু হেসে বললেন, ও, এই ব্যাপার! ও পাবেন কোথায়! অল্পবয়সে কানপুরের ওই- সব গলি-মহল্লা ঘুরে বেড়িয়েছি। ওইরকম দেড়শো-দুশো বছরের বাড়ি কানপুর-আগ্রার পুরনো পাড়ায় বিস্তর আছে এখনও। নিজের চোখে দেখেই এসব লিখেছি।

প্রতুলবাবু বললেন, দেখুন কাণ্ড, এমন নিখুঁত বর্ণনা, আমি ভাবলাম নানকচাঁদের বাড়ির বর্ণনা নিশ্চয় কোথাও পেয়েছেন।

সাহিত্যজীবনের শেষপর্বে গজেন্দ্রকুমার অনেক স্থিতধী। 'পাঞ্চজন্য'র মতো উপন্যাস অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ক ছোট গল্প, 'আদি আছে অন্ত নেই' আত্মজৈবনিক উপন্যাস এবং স্মৃতিকথামূলক রচনা লিখছেন। 'পাঞ্চজন্য' উপন্যাসের জনপ্রিয়তার কথা সবাই জানেন।

একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হল, গজেন্দ্রকুমার তাঁর নাতিবৃহৎ সুবৃহৎ জনপ্রিয় উপন্যাস যখন লিখছেন, তখন ছোটদের জন্য কিশোর সাহিত্যও রচনা করছেন। আর কিশোর সাহিত্য রচনায় বিন্দুমাত্র অবহেলা দেখা যায় না।

হয়তো সেকালের যুগটা ছিল এমনই। তখনকার লেখকরা বয়স্ক ও কিশোর সবাইকে নিয়েই ভাবতেন। তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ থেকে শুরু করে, কল্লোলযুগের সাহিত্যিকরা এবং গজেন্দ্রকুমার-আশাপূর্ণা সকলেই অপূর্ব কিশোর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

১৯৫৯ সালে গজেন্দ্রকুমার সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের জন্য। 'পৌষ ফাগুনের পালা' ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার আমন্ত্রণে মস্কো, আর্মেনিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। ১৯৮৮ সালে মতিলাল পুরস্কার পান। ১৯৮৯ সালে বিভূতিভূষণের নামাঙ্কিত প্রথম 'বিভূতি সাহিত্য অর্ঘ্য' প্রদত্ত হয় গজেন্দ্রকুমারকে। ১৯৯৩ সালে শরৎ সমিতি তাঁকে শরৎ পুরস্কারে সম্মানিত করেন। পুরস্কারের কথাগুলি উল্লেখ করলাম এই কারণে, জীবনের শেষদিকে গজেন্দ্রকুমার প্রায়ই বলতেন, দ্যাখো, পাঠক কী বলল আর পাঠককে আমি কী দিলাম তারই অনুভূতি হচ্ছে লেখকের বড় পুরস্কার। এসব পুরস্কারের চেয়ে তোমাকে (অর্থাৎ আমাকে) মাইকেল মধুসূদন কলেজের প্রিন্সিপাল মশাই যা বলেছিলেন তাই আমার জীবনের সেরা পুরস্কার। দ্যাখো, রবীন্দ্রনাথ কত সম্মান পেয়েছেন, তার পরেও তাঁর কামনা ছিল— শতবর্ষ পরে জানলার ধারে বসে কে তাঁর কবিতা পড়বে। চটজলদি সম্মান ভালো লাগতে পারে, কিন্তু পাঠকের মনে স্থায়ী আসন লাভই লেখকের মূল কাম্য।

নিভৃত আলাপচারিতায় গজেন্দ্রকুমার অনেক কথা বলতেন যা আগে বলেননি। বলতেন, আত্মা-টাত্মায় আমার বিশ্বাস হয় না। মানুষের জীবন মহাকালের স্রোতে ভেসে আসে, শেষ হলে সেইভাবেই আবার চলে যায়। আরও বলতেন, যখন দেখবে আমার যাওয়ার সময় হয়েছে, শান্তিতে যেতে দিয়ো। কাটা-ছেঁড়া করো না। আর শ্রাদ্ধ-শান্তিরও কোনও দরকার নেই। ও তো ভূতভোজন। পারো তো সেদিন রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনো।

আমরা তাঁর কথা রাখতে পারিনি। মানুষ যখন খ্যাতনামা হন, তিনি তো সমাজের মানুষ— পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে যান। চিকিৎসা নার্সিংহোম সবই করতে হল। ১৯৯৪-এর ১৬ অক্টোবর তিনি আমাদের ছেড়ে যান। তাঁর শেষ কথাও রাখতে পারিনি। কাকিমা প্রতিমা মিত্র তখনও আছেন। তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও গজেন্দ্রকুমারের শ্রাদ্ধ-শান্তি হবে না তাও কি হয়! সেও করতে হল যথারীতি।

তবে অপারগতা প্রকাশ্যে স্বীকার করলে নাকি দায়ভার কমে। এখানে সেইকথা স্বীকার করে কিছুটা দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি।

সেইসঙ্গে একথাও স্বীকার করছি, 'কালের কষ্টিপাথর'-এ এই যে তাঁকে স্মরণ করলাম, তা শাস্ত্রানুমোদিত শ্রাদ্ধকার্য থেকে অনেক বেশি আন্তরিক ও যথার্থ শ্রদ্ধার্পণ।

ধারাবাহিক উপন্যাস

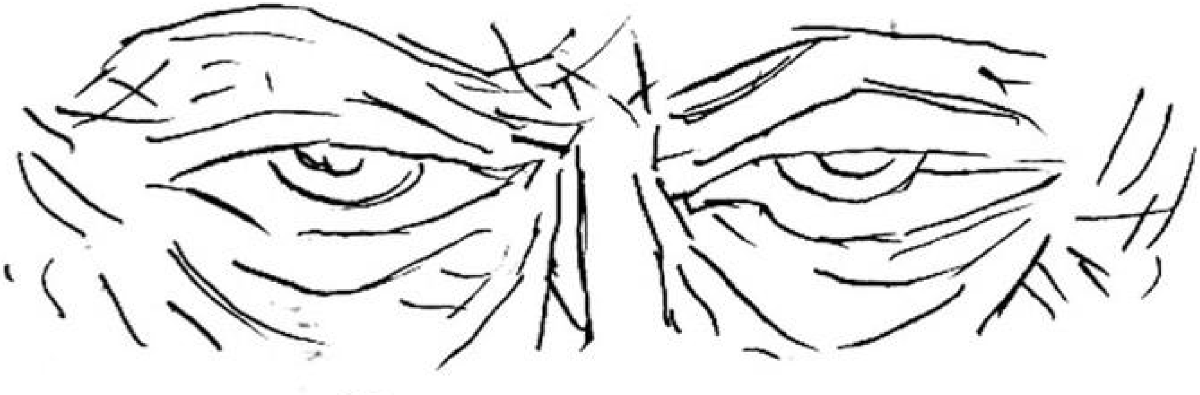

বিষাদগাথা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

৯

(পরিচ্ছেদ: ২৫, ২৬, ২৭)

রাতের বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি ভোরের দিকে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে সকাল থেকে আবার শুরু হয়ে গেল। নীলাঞ্জনা চলে যাবে বলে পরীক্ষিতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। পরীক্ষিৎ হাতের তালুতে মাথা রেখে সাদা পাতার ওপর ঝুঁকে চুপ করে বসে আছে, নীলাঞ্জনা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে তার পিছনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মৃদু স্বরে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি পরীক্ষিৎ।'

'এত বৃষ্টিতে তুমি যাবে কী করে?'

'বৃষ্টি তো একসময় থামবেই, তখন তো যেতেই হবে।'

'আর দুয়েকটা দিন থেকে যেতে পারো না?'

'পারলে চিরদিন তোমার কাছে থেকে যেতাম।'

পরীক্ষিতের একটা হাত নিজের হাতের তালুতে অনেকক্ষণ ধরে রেখে নীলাঞ্জনা বলল, 'এ-ক'দিনে তোমাকে দেখে বুঝেছি তুমি বড় দুঃখী, আমাকে তোমার প্রয়োজন। ভুল বলেছি?'

পরীক্ষিৎ এবার মৃদু হাসে, 'ভুল মানুষ যখন করে, তখন ভুল বলে তাকে চেনা যায় না। আমি ভুল ধরিয়ে দিলেও তুমি মানবে না। ভুল তো তুমি করেছই। তোমার চেয়ে বয়েসে আমি কত বড় তুমি জানো?'

নির্বাক দুজনের মাঝখান দিয়ে ধীর লয়ে সময় বয়ে যায়। নীলাঞ্জনা ব্যাগ থেকে নিজের নাম-ঠিকানা ফোন নম্বর লেখা এক টুকরো কাগজ টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে বলল, 'সরস্বতীপ্রতিমার কাছে কখনও গেলে, আমাকে ভুলে যেও না, দেখা না হলে দুঃখ পাব।'

দেশের বিভিন্ন শহর থেকে, গ্রাম থেকে নীলাঞ্জনা পরীক্ষিৎকে চিঠি লেখে। প্যারিস থেকে পর পর দুটো এয়ারোগ্রাম পেয়ে সে তার কাজের পরিধি আঁচ করে।

ব্রাজিলের সাওপাওলো থেকে পাঠানো হর্নবিল পাখির ডাকটিকিট লাগানো এনভেলাপ খুলে বড় চিঠি সে আগাগোড়া দুবার পড়ল।

সূর্য এখানে অনেকটা সময় নিয়ে অস্ত যায়। তৃণশয্যায় শায়িত যুগলমূর্তির ওপর দিয়ে একটা সাপ ধীরে ধীরে কখন একদিক থেকে আরেকদিকে চলে গেছে, দুজনের কেউই টের পায়নি।

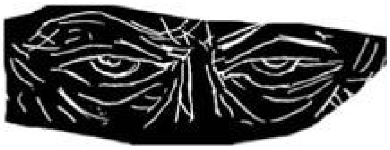

বেশির ভাগ পশুপাখির মধ্যে দেখবে স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক মিলন ভালোবেসেই হয়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। শুধু কুকুর আর মানুষের মধ্যেই বোধহয় ধর্ষণের রেওয়াজও আছে।... যা দেখছি, যত দেখছি, নারী-পুরুষের এই খাদ্যখাদক সম্পর্কের বিষ ততই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পরীক্ষিতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসার উত্তাপ লাইনে লাইনে। তার গবেষণার ক্ষেত্রে তার দার্শনিক নিরীক্ষণের কথাও পরীক্ষিৎকে লিখেছে।

'বেশির ভাগ পশুপাখির মধ্যে দেখবে স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক মিলন ভালোবেসেই হয়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। শুধু কুকুর আর মানুষের মধ্যেই বোধহয় ধর্ষণের রেওয়াজও আছে। মানুষের মধ্যে যারা ভাগ্যদোষে কি সামাজিক শোষণে পতিতাবৃত্তি নিতে বাধ্য হয়, সেটা শুধু তাদেরই লাঞ্ছনা না, সমগ্র মানবসমাজেরই ক্যানসার। যা দেখছি, যত দেখছি, নারী-পুরুষের এই খাদ্যখাদক সম্পর্কের বিষ ততই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শুনলে অবাক হবে আমাদের দেশে যত মেয়ে যে পরিস্থিতিতে এ পথে আসে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি মেয়ে একই আর্থিক সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করতে বাধ্য হয়।'

কোজাগরী পূর্ণিমার দিন সকাল থেকে নন্দিনীর দু-চোখ বেয়ে জল ঝরতে থাকে। অদ্ভুত একটা স্বরে কাঁদতে কাঁদতে সে জেদ ধরল, তাদের আগের সেই গাছবাড়িতে সেদিনই তাকে নিয়ে যেতে হবে। পরীক্ষিতের পক্ষে সেদিন নিতান্ত অসম্ভব, পরদিনও তা-ই, অগত্যা লক্ষ্মীপুজোর দুদিন পরে এক বছরের মেঘাবৃতকে সরোজিনীর কাছে রেখে নন্দিনী পরীক্ষিতের সঙ্গে সাগরখাড়ি রওনা হল। স্টেশনের দিক থেকে রিকশায় নীলাঞ্জনা আসছে, নন্দিনীর মনে ভয়, তাদের যাত্রা পণ্ড হবে না তো! ওদের গন্তব্য শুনে নীলাঞ্জনা আবদার করে সে-ও গাছবাড়িতে যাবে।

সমুদ্রতীরে চিংড়ির জল নিংড়োনোর মেশিনের দুজন ছেলের একজন শুখা-চিংড়ির প্যাকেটের পাহাড় পাহারায় সেখানেই থেকে গেল, আরেকজন নৌকোয় তিনজনকে দ্বীপে পৌঁছে দিয়ে দ্বীপের সৈকতে নৌকো তুলে নৌকোতেই চিৎ হয়ে শুয়ে রইল।

সিঁড়ির দড়ি পচে গাছের গুঁড়িতে এক টুকরো লেগে আছে, সিঁড়িটা জোয়ারের সময় ভেসে গিয়ে একটু দূরে কয়েকটা গাছের গোড়ায় আটকানো। পরীক্ষিৎ নীলাঞ্জনা সিঁড়ি টেনে এনে গাছবাড়িতে লাগাল। ঝড়ে ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো ছড়ানো, তার মধ্যে জোনাকি রাখার মাটির প্রদীপটা খুঁজে পেয়ে নন্দিনী সেটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ কী ভাবল, তারপর, বালিসোনার বাড়ি থেকে বেরনোর পর এই প্রথম কথা বলল, 'আমি এ ঘরে একটু একা থাকব।'

দ্বীপের সরু এক চিলতে সৈকত ছেড়েই জঙ্গলের শুরু। দিবাকরদের গাছবাড়ি অনেক পিছনে ফেলে পরীক্ষিৎ নীলাঞ্জনা ক্রমশ জঙ্গলের আরও গভীরে চলে এসেছে। এক জায়গায় পাতলা হয়ে আসা গাছপালার পরই দীর্ঘ কাশবন। ওপরে ছড়ানো মেঘের ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলো চুঁইয়ে পড়ছে।

এগিয়ে যাচ্ছে, না ফেরার পথ ধরেছে সে বিষয়ে কারও চেতনা নেই। ছিল কাশবন, এখন সামনেই মারাত্মক কেয়াঝোপ।

কেয়াঝোপ ঘেঁষে কিছুটা এগিয়ে পরীক্ষিৎ ধন্দে পড়ল— এবার কোনদিকে? নীলাঞ্জনা সঙ্গে নেই এতক্ষণ খেয়াল করেনি। পিছনে তাকিয়ে দেখল, অস্বাভাবিক বড় একটা মাদারিগাছের মোটা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে নীলাঞ্জনা দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যায় অনেকক্ষণই সে পরীক্ষিতের চলে যাওয়ার দিকে অপলক চেয়ে আছে। তার মাথাটাও কন্টকাকীর্ণ গাছের গায়ে হেলানো, কিছুটা ডান কাতে। মুখে, মাথার চুলে শেষ বিকেলের আলো অতি স্বচ্ছ রেশমফালির মতো লেগে আছে।

মাদারিগাছের লাল রঙের পাতলা ফুলের আকর্ষণে বালকবয়েসে পরীক্ষিৎ অনেকবার কাঁটার আঁচড় খেয়েছে। নীলাঞ্জনা জানে আছে তো!

পরীক্ষিৎ কাছে এসে নীলাঞ্জনার মুখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে দুহাতে মুখটা ধরে ধীরে ধীরে নিজের দিকে টেনে নিল।

'তোমার জীবন থেকে আমি সত্যিই ঝরে গেলে তুমি হয়তো টেরও পাবে না পরীক্ষিৎ।' এই প্রথম তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ল।

'আমি তো জানিই না তুমি আমার সঙ্গে আসছ না।'

'কী ভাবছিলাম জানো? তুমি যদি এই দ্বীপে আমাকে একা রেখে চলেও যাও, আমি পিছু ডাকব না।'

কথা শেষ হতে না হতেই পরীক্ষিতের বাঁ কনুই তুলে ধরে বলে উঠল, 'এ কী! কাটল কী করে?'

'কী জানি! হয়তো কেয়াপাতায়।'

'এ তো রক্তের ধারা নামছে! চোষো, চোষো, চুষে নাও।'

পরীক্ষিতের দ্বিধা দেখে নীলাঞ্জনা হঠাৎই নিচু হয়ে রক্তরেখায় মুখ লাগিয়ে চুষতে শুরু করেছে।

পরীক্ষিৎ বলল, 'সাপে কাটলে ওঝারা এভাবে বিষ ঝাড়ে দেখেছি।'

নীলাঞ্জনা মুখ তুলল। রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। বলল, 'আমি তো তোমার বিষই ঝাড়লাম। তুমি আমাকে অমৃত দাও।'

আমূল লজ্জায় সে পরীক্ষিতের বুকে মুখ গুঁজে তাকে জাপটে ধরে রইল। ফিসফিস করে তার স্বর শোনা গেল— 'আমার সমস্ত শরীর থর থর করছে!'

পরীক্ষিৎ প্রবলভাবে তাকে পিষ্ট করতে করতে কী বলতে চাইল বোঝা গেল না। শুধু তার গলা দিয়ে 'নীলা' 'নীলা' বলে ঘরঘরে একটা আওয়াজ বেরল।

সূর্য এখানে অনেকটা সময় নিয়ে অস্ত যায়।

তৃণশয্যায় শায়িত যুগলমূর্তির ওপর দিয়ে একটা সাপ ধীরে ধীরে কখন একদিক থেকে আরেকদিকে চলে গেছে, দুজনের কেউই টের পায়নি।

ক্রমশ সূর্য ডুবে গেলে, নারকেলবনের সারির ফাঁকে তখনও রঙিন আভা, পুবদিকে দ্বাদশীর সদ্যোজাত জ্যোৎস্না, দুজনে উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে হাঁটতে নীলাঞ্জনা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'চলো, ফিরে যাই। যাবে? সেই আমাদের তৃণশয্যায়? ওই আদিম জঙ্গল, প্রাণী বলতে শুধু আমরা— তুমি কী ভাবছ?'

'ভাবব কী, দুটো চোখ কিছুতেই ভুলতে পারছি না। প্রথমে ভেবেছিলাম প্যাঁচা, পরে দেখলাম মানুষ। লোকটা উবু হয়ে বসে চোখের সামনের লতাগুল্ম দুহাতে সরিয়ে নিষ্পলক চোখে আমাদের দেখছে, কতক্ষণ কে জানে! তুমি যখন উঠে দাঁড়িয়েছ তখনই আমি প্রথম দেখলাম।'

পরীক্ষিৎ এবার সময় নিয়ে আবার বলল,

'মানুষের শরীর বোধহয় মহাকাশের মতোই বিস্ময়কর।'

গাছবাড়ি খুঁজে পাওয়ার যেন তাড়া নেই, বড় বড় প্রাচীন সব গাছের বাধা পেরিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে আসার পথে নীলাঞ্জনা বলল, 'আজকের এই জঙ্গল, এই সন্ধ্যা তুমি ভুলে যাবে?' কথাটা বলে পরীক্ষিতের মুখের দিকে চাইল।

অনেকক্ষণ অনুমানে অচেনা জঙ্গলে হাঁটার পর নীলাঞ্জনার সন্দেহ হল তারা পথ হারিয়েছে। পরীক্ষিতের মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

দূর থেকে সমুদ্রের শব্দ শুনে নীলাঞ্জনা হঠাৎ বলল, 'আমার একটা কথা মনে আসছে। অভাগা মেয়েদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য দুনিয়া জুড়ে একটা আন্দোলন করা যায় না? একটা চিন্তার বিপ্লব?'

পরীক্ষিৎ অন্যমনস্কতা ভেঙে বলল, 'দিবাকরকে যারা খুন করল তারাও কি বিপ্লবই করছে?'

'সে কি? কবে? ওকে কারা খুন করবে?'

আবার অনেকক্ষণ কারও কোনও কথা নেই, ডালপালা সরিয়ে পথ করার আওয়াজও ঝিঁঝির একটানা তীক্ষ্ণ ডাকে চাপা পড়ে যাচ্ছে।

গাছবাড়ির কাছাকাছি এসে নীলাঞ্জনা জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ বলো তো?'

'ভাবছি এ জীবন নিয়ে আমি কী করব?'

নন্দিনী ঘরের মধ্যে কারও সঙ্গে কথা বলছে। যে-ছেলেটা নৌকো বেয়ে কাল সকালে সৈকতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সে-ই হয়তো এসেছে। হয়তো দিবাকরের খবর চায়। পরীক্ষিৎ ঘরে ঢুকে দেখল, নন্দিনী কাঠের রং-চটা দেওয়ালের দিকে মুখ করে হাত মাথা নেড়ে একা একা কথা বলছে, 'অত ঘন কোঁকড়া চুলে জোনাকির ঝাঁক বাসা বাঁধল কী করে? চুল যদি পুড়ে যায়? চুলের ছায়ায় তোমার মুখ ঢেকে যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না গো।'

বালিসোনা থেকে আনা টিফিন ক্যারিয়ার খুলে নীলাঞ্জনা পুরি হালুয়া নিমকি সন্দেশ নন্দিনীকে দিতে এসে নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পরীক্ষিৎ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'নন্দিনী! যেটুকু পারো খেয়ে শুয়ে পড়ো। কাল ভোর-ভোর বেরতে পারলে ভালো হয়।'

নন্দিনী ঘোর ভেঙে পরীক্ষিতদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

সমুদ্রসৈকত ছেড়ে যাবার আগে, পরীক্ষিৎ চিংড়ি-মেশিনের ছেলেদুটির সঙ্গে কথা বলল। ছেলেদুটি জানাল, কাছাকাছি দোকান-বাজারে খুব সস্তায় সের দরে চিংড়ির প্যাকেট পৌঁছে দিয়ে যা পাওয়া যায় তা দিয়ে তারা কোনওরকমে কাজটা চালু রেখেছে। লিওন যেমন বলে দিয়েছিল, পরীক্ষিৎ সেইমতো চিংড়ি

পরীক্ষিৎ বলল, 'এখানে কোথাও একটা দ্বীপে একটা গাছবাড়ি ছিল না?'
'এখনও আছে, জলের নীচে। গাছবাড়ির ভাঙা-পচা কাঠের টুকরা-টাকরা, সমসারের দু-একখানা সামগ্গিরি মাঝেমধ্যে আমাদের জালে ওঠে।'

মেশিনের ছেলে দুটিকে জানাল, এরপর থেকে দিবাকরের লিওনদাদা এই ব্যবসা দেখবে। শিগগিরই এসে টাকাও দিয়ে যাবে। বিপণনের ব্যবস্থাও করবে সে-ই।

'দিবাকরদা আর আসবে না?' এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে তিনজন নদী পার হয়ে গেল।

জুলাই মাসের গোড়ায় একদিন বেলাবেলি লিওনার্দো পরীক্ষিতের সঙ্গে এসে অসীম সৈকতের কোথাও শুখাচিংড়ির কারখানা দেখতে পেল না। সাগরখাঁড়ি জায়গাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই সৈকতটাই সমুদ্রে তলিয়ে গেছে দেখে কারখানার ছেলে দুটো হয়তো সাগরের আরও ভেতরের দ্বীপে, হয়তো দিবাকরের গাছবাড়িতে যন্ত্র তুলে নিয়ে গেছে— এমন অনুমান করে একটা জেলেডিঙিতে তারা দ্বীপের দিকে এগিয়ে চলল।

চারদিকে সমুদ্র, দ্বীপ কোথাও নেই।

তীর ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে এসে ডিঙি-বাওয়া জেলে সাগরে জাল নামিয়ে দিয়েছিল, বাবুদের কথা থেকে আঁচ পেয়ে বলল, 'আপনারা কি কিছু খুঁজতে এয়েছেন বাবু?'

পরীক্ষিৎ বলল, 'এখানে কোথাও একটা দ্বীপে একটা গাছবাড়ি ছিল না?'

'এখনও আছে, জলের নীচে। গাছবাড়ির ভাঙা-পচা কাঠের টুকরা-টাকরা, সমসারের দু-একখানা সামগ্গিরি মাঝেমধ্যে আমাদের জালে ওঠে।'

ফেরার পথে নদীর পাড়ে শুখাচিংড়ির ছেলে-দুটোর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। পরীক্ষিৎদের সামনে ঝুঁকে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দিবাকরদা কবে আসবে?'

'ইনি দিবাকরের লিওনদাদাবাবু। চিংড়িকারখানার জন্য কিছু টাকা এনেছেন।'

'সে-কারখানা সাগর গিলে খেয়েছে বাবু। আমরা এখন সাপধরার কাজ করি। ওষুধকারখানায় সাপের বিষ সাপ্লাই দিই।'

আকাশ কালো করে বৃষ্টি আসছে। লিওন ছেলেটার দিকে টাকা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এটা রাখো।'

'দিবাকরদার সেই যন্ত্রই তো নেই, টাকা দিয়ে আর কী হবে বাবু!'

'তবু রাখো। সাপধরা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক, তোমরা তো বেদে নও। পারলে একাজ ছেড়ে অন্য কিছু করো।'

'জন্ম থেকে আমাদের তো বাবু সাপ-খোপ নিয়েই জীবন কাটে। এই বর্ষাকালেই ফি বছর কত লোককে এখানে সাপে কাটে।'

ছেলে-দুটোকে দূরের নারকেলবনের দিকে হারিয়ে যেতে দেখে লিওন-পরীক্ষিৎও মেঘ-বিদ্যুৎ মাথায় নদী পার হতে এগিয়ে গেল।

২৬

বাদায় সকাল থেকে লোক আসার আর বিরাম নেই। বেলা যত বাড়ে ভিড়ও তত বাড়ে। যেখানে বুজকুরি কেটে জল উঠছে সকলেই সবার আগে সেই জায়গাটা দেখতে চায়।

জলের উৎসমুখ জলে ঢাকা, শুধু বুজকুরি উঠে বৃত্তাকারে জল বেড়ে চলেছে। হারানো নদীর খোঁজে বেশ কয়েকটা গভীর গর্ত খোঁড়া হয়েছিল তারই কোনওটা থেকে হয়তো অবিরাম জল উঠছে।

জল যত বাড়ে, মানুষের আনাগোনাও তত বাড়ে। তৃতীয় সপ্তাহে অম্বরীশের কাটা খাত ধরে হঠাৎই একদিন উত্তরে দক্ষিণে জল ছুটতে লাগল। সাউথ উইন্ড টাউনশিপের গভীর করে খোঁড়া দীর্ঘ ভিতও আর আলাদা করে বোঝা যায় না।

সারাদিনের কাজের শেষে চারজন মাটি-তোলা শ্রমিক গর্তের ঠান্ডায় ঘুমিয়ে পড়েছিল,

তিনদিন পর আবার তাদের জলে-ফোলা শবদেহ পাওয়া গেল বালিসোনার পাঁচ গ্রাম পরের সোনাগুঁড়া গ্রামের নারকেলসারির নীচে যেখানে বহু যুগ পরে শীর্ণকায় নদী হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে আছড়ে পড়েছে।

'বলা নেই কওয়া নেই, এমন কৌশিকী ষাঁড়াসাড়ির বান এল কোত্থেকে?' বালিসোনার বয়োবৃদ্ধদের মনে ভয়, অল্পবয়সিদের মনে উত্তেজনা। অশুভ সংকেত ধরে নিয়ে গৃহবধূরা পুজো দেয়। বান যদি, তবে আর নামে না কেন— তা নিয়ে পথে-ঘাটে, মাঠে-বাজারে আলোচনা তর্কাতর্কি দিনে দিনে বেড়ে চলল।

অম্বরীশের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া ঘাটের ধ্বংসাবশেষের নকশা ও অবস্থান অনুযায়ী একটা ঘাট নির্মাণ করা হবে, পরীক্ষিৎ তার সাধ ও কল্পনা মতো শহর থেকে সাদা পাথরে 'মিতাম্বর শাখানদী' লিখিয়ে একটা স্তম্ভের গায়ে বসাচ্ছে, পর পর তিনটে জিপে পুলিশ ও দুটো অ্যাম্বাসাডরে কয়েকজন সরকারি অফিসার এসে কাজ থামাবার নির্দেশ দিল। একজন সরকারি অফিসার পরীক্ষিতের সামনে এসে কড়া স্বরে বলল, 'এ জমি সরকারি, সরকার লিজ দিয়েছে। অন্য কেউ এখানে কিছু করার চেষ্টা করলে সেটা আইনের চোখে অপরাধ, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।'

একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে একটা অস্পষ্ট কার্বন কপি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আর এক মিনিট এখানে থাকলে এই কোর্ট অর্ডার অনুযায়ী আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।'

সরকারি অফিসারদের আরেকজন যোগ করল , 'আপনার মতো শিক্ষিত মানুষ ভুললেন কী করে সরকারের জমিতে বিনা অনুমতিতে কিছু করা যায় না!'

'এ তো জমি না, নদী!'

'নদীর নীচেই জমি আছে।'

'ভুল। জমির নীচে এই নদী প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। মানুষই তাকে মাটি চাপা দিয়েছে।'

'ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট! চলুন, আমার সঙ্গে থানায় চলুন, কাল আপনাকে কোর্টে প্রডিউস করা হবে।'

আসামীকে জিপে তুলে কিংসাইজ সিগারেট ধরিয়ে অভ্যাসবশে দু-হাতের তালুতে গাঁজার কলকের মতো ধরে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পুলিশ অফিসার না বলে পারল না, 'আপনাদের মতো চিন্তাশীলদের জন্যই আজকাল পুলিশের কাজ বেড়ে গেছে! সেবার তো দেখলেন, বেশ্যাপাড়ায় রেইড করে কিছু পাওয়া গেল?'

পরীক্ষিৎ এতক্ষণে চিনেছে, এ সেই ও-সি, যে নন্দিনীকে জেরায় নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল। নীলাঞ্জনাকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমপাড়ায় সাজানো রেইডে গিয়েছিল!

দুপুর থেকে বসিয়ে রেখে সন্ধে নাগাদ একজন কনস্টেবল এসে পরীক্ষিৎকে জানাল বড়বাবু বলে পাঠিয়েছেন আপনি বাড়ি চলে যেতে পারেন।

নদীর নামকরণ ও ঘাট নির্মাণে সরকারি বাধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরীক্ষিত থানা থেকে লক্ষ্মী-লিওনের বাড়ি গিয়ে দেখল শিবকৃষ্ণের সাধনসঙ্গী উমাশশীও এসে বসে আছে। সকলের মুখ থমথমে, উমাশশীর বাড়িতে আজ সকাল থেকেই অরন্ধন।

শিবকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে নীলাম্বরের ভর্তি হওয়ার সুযোগ নেই, লিওনদের স্কুল পুরোপুরি আবাসিক, তার মা তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না, ফলে সেখানেও সে ভর্তি হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির ফ্রি স্কুলে নাম লেখাতে হয়েছে। তার এমন ভয়ানক দাম দিতে হবে কেউ ভাবেনি।

দাম শুনে পরীক্ষিতের মুখও অন্ধকার।

'জানেন ভাই, কী হয়েছে? কী আর বলব দাদা, আপনাদের?' —বলে উমাশশী উদ্বেগভরে বলে চলল, 'কাল স্কুল থেকে ফিরে নীলাম্বর আমাকে কী বলল জানেন? বলল— 'আমার ফিতে' ইংরিজিতে কী মা? আমি যখন জানতে চাইলাম, তোকে এসব কে বলেছে? তখন কী বলল আপনারা ভাবতে পারবেন না। বলল ওদের স্কুলের দু-ক্লাস উঁচুতে কে এক হলধরদা আছে, সে আমাদের স্কুলের ক্লাস টেনের মেয়েদের আমার ফিতের ইংরিজি জিজ্ঞেস করতে বলেছে। আরও এরকম কী কী শিখছে ভগবান জানেন! আমি আজ রান্নাঘর খুলিনি, ওকে স্কুলেও যেতে দিইনি।'

সকলেই পরস্পরের দিকে চিন্তিত চোখে তাকায়। পরীক্ষিৎ শোক পালনের নীরবতা ভেঙে হঠাৎ স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল, 'কী অপরূপ আদিগন্ত ধানখেত ছিল এখানে। ধানখেতের ঢেউ লেগে লাল টালির বাড়িটা যেন আবেশে দুলত। সেসব কোথায় গেল!'

লক্ষ্মীদি ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সত্যি রে, পরীক্ষিৎ। কত পাখি আসত এখানে, আর আসে না।'

'লক্ষ্মীদি, তোমার মনে আছে, মিতার সঙ্গে এখান থেকে চলে যাবার পরও আমি যখনই আসতাম ফিরতে চাইতাম না!'

উমাশশী উদ্বেগ আর ধরে রাখতে পারল না। লিওনের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনাদের স্কুলে এখন আর ভর্তি হওয়া যায় না? হোস্টেলে থেকেই না-হয় পড়ুক। ছেলে তো মানুষ হবে। ওকে বাড়িতে রাখতে আর ভরসা পাচ্ছি না। ছি ছি!'

লক্ষ্মী আশ্বাস দিল, ক্লাসের সিট ও হোস্টেলের ব্যবস্থা দেখে কিছু একটা নিশ্চয়ই করা যাবে।

বাবার সারা জীবনের স্বপ্নের সঙ্গে মায়ের নাম জুড়ে দেবার ইচ্ছে থেকে নতুন এই আঞ্চলিক নদীর নাম 'মিতাম্বর শাখানদী'। এ নাম লক্ষ্মী লিওন অবনীমোহন সরোজিনী সকলেরই পছন্দ। ঘাট নির্মাণের বাধা দূর করতে অন্যদের সঙ্গে মেজো জ্যাঠাবাবুরও পরামর্শ নেওয়া হল। সেজোজ্যাঠা ও তার দলনেতাদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও ঐতিহাসিক ঘাট নির্মাণের পক্ষে বালিসোনার মানুষের সাত হাজার স্বাক্ষর ও তেরো হাজার টিপ সই পুরসভায়, পুরমন্ত্রণালয়ে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে জমা দিয়ে সরকারকে অনুমতি দিতে বাধ্য করা হল।

জল একইভাবে বেড়ে চলেছে। সাউথ উইন্ড টাউনশিপের যেটুকু বা কাজ হচ্ছিল, তার সবটাই জলের তলায়। কপিখেতের যুদ্ধের শহীদদের স্মৃতিফলকের ডগাটুকু শুধু জেগে আছে।

দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় পরীক্ষিৎ নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায়। কখনও নির্মীয়মাণ ঘাটের দেওয়ালে মাথা রেখে বহু দূরের দিকে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মাথা একপাশে ঢুলে পড়েই সোজা হয়ে যাচ্ছে দেখলে বোঝে দু-চার মিনিট ঘুমিয়েও পড়েছিল।

সমুদ্রে সাংঘাতিক জলোচ্ছ্বাসের বিস্তারিত খবর বালিসোনায় পৌঁছল ঘটনার অনেকদিন পর। কুড়ি-পঁচিশ ফুট উঁচু ঢেউয়ের তোড়ে তীরের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে গ্রামের পর গ্রাম চিরতরে তলিয়ে গেছে। সরকারি হিসেবে মানুষ মারা গেছে তিনশো সাতান্ন জন। নিখোঁজের সংখ্যা চার হাজার। তাছাড়া এগারটা নদী-শাখানদী-উপনদীর গতিপথ কম-বেশি বদলে গেছে। তার সঙ্গে বালিসোনা নদীর পুনর্জন্মের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও যোগসূত্র আছে কিনা সেটা এখনও জানা যায়নি। লিওনের মতে ইন্দোনেশিয়ায় বালিদ্বীপের হোলিস্প্রিং মন্দিরের কুণ্ড যেমন অবিরাম পাতাল ফুঁড়ে ওঠা জলেরই সৃষ্টি, এ-ও হয়তো তেমনই, পাতাল-নদী। কে একজন বলল, পাতালগঙ্গা নয় তো?

একদিন গোধূলিতে গাছের মোটামোটা ডাল বেঁধে তৈরি নৌকোর মতো একটা জলযান অসমাপ্ত ঘাটে এসে নোঙর করল। জোর বাতাসে ফুলে-ওঠা খুব উঁচু পালের নীচে দু-পাশের দুই গুঁড়ির ওপর পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে রোগা ঢ্যাঙা একটা লোক। বয়স চল্লিশ হতে পারে, ষাটও হতে পারে, সঠিক আন্দাজ করা যায় না। দুই গুঁড়ির মাঝখানের বিরাট ফাঁকা জায়গা থেকে জল ছিটকে উঠে লোকটার

প্যান্টের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। গায়ে নানা রঙের ছিটকাপড় জোড়া দেওয়া ঢিলে-ঢালা জ্যাকেট, মাথায় বেতের ছুঁচলো টুপিতে ময়ূরের পালক গোঁজা, কোমরে তলোয়ারের মতো কাঁচা কাঠের দিশি বেহালা ঝুলছে।

পালতোলা, অথচ নৌকোও ঠিক না, অদ্ভুত চেহারার এই বাহন বালিসোনায় কেউ কখনও দেখেনি। অদ্ভুতদর্শন নৌকো থেকে নেমে আরও অদ্ভুতদর্শন লোকটি অসমাপ্ত সিঁড়ির ঢাল বেয়ে পরীক্ষিতের সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, 'স্বর্গত অম্বরীশ চৌধুরীর বাড়ি কোন দিকে বলতে পারেন ভাই?'

পরীক্ষিৎ চমকে উঠে দাঁড়ায়। লোকটার টুপির পিছনে আকাশ রাঙিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ফলে তার মুখ আরও অস্পষ্ট, প্রায় অন্ধকার, পরীক্ষিৎ সম্পূর্ণ সংশয়াচ্ছন্ন মনে নিয়ে জানতে চাইল— 'আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন? আপনার নাম কী? কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন?'

'আসছি নেগম্বো থেকে। না, না, নিকোবর থেকে, এটাও ভুল বললাম, আসছি ফিফি দ্বীপ থেকে। হয়তো এটাও ভুল। এই আজকাল আমার হয়েছে, সবসময় সব কিছুর নাম ভুলে যাই। মনে পড়েছে, এখন আসছি রাশিয়ার মারস্মার্ক বন্দর থেকে, না কী, কে জানে— হয়তো ব্লাডিভস্টক থেকে। দূর ছাই, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে— এখন আসছি ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের ফোতোভেনতুরা থেকে। মুশকিল কী জানেন, যত বলি ততই ভুল বলি। ধরে নিন চূর্ণী বা জলঙ্গী নদী থেকে আসছি। কোত্থেকে আসছি-র থেকে, কোথায় এলাম অনেক বড় ব্যাপার। তার চেয়ে বড় কথা, আমার নাম বীরবল বিদুষক, না, না, আলাউদ্দিন খিলজি, দূর ছাই, মনে পড়ে না কেন? আমার নাম কী জানেন? চেঙ্গিস খান, নাকি কুবলাই খান, না না, আমার নাম কলম্বাস, এও বোধহয় ভুল বললাম, আমার নাম কি তবে আলেকজান্ডার, নাকি হিউয়েন সাং? ভাস্কো ডা গামা বলেছি নাকি? আমার নাম মনে হয় আলেকজান্ডারই হবে। সবচেয়ে বড় কথা আমি জাহাঙ্গীরসাহেবের নোকর। এখন বলুন তো স্বর্গত অম্বরীশ চৌধুরীর বাড়ি কোন দিকে?'

কথা বলে শরীর দুলিয়ে-দুমড়িয়ে, সামনে-পিছনে ঘন ঘন ঘাড় ঝাঁকিয়ে। তারই ফাঁকে ফাঁকে অস্তগামী সূর্যের মেঘফাটা আলো হঠাৎ হঠাৎ পরীক্ষিতের চোখের ওপর ঝাঁপায়। লোকটার কোমরের বেহালার সঙ্গে প্যান্টের ঢোলা পকেটের কঠিন কিছুর ঠোকাঠুকি পরীক্ষিতের কান এড়াল না।

'আমার সঙ্গে আসুন। অম্বরীশ চৌধুরী আমার বাবা। জাহাঙ্গীরসাহেব এখন কোথায় আছেন?'

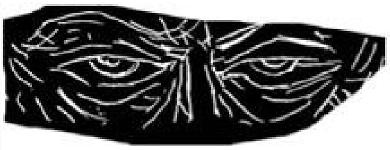

আল্লাহ্ যখন নদী ফিরিয়ে দিয়েছে তখন এখানকার মাটিতে মানুষের মনও হয়তো নতুন করে গড়া যাবে। অম্বরীশের স্বপ্ন ছিল বিরাট, জীবন ছিল ছোট। সে নদী এনেছে, তুমি মানুষ আনো।

টুপিটা একবার খুলে জোরে জোরে তার ভেতরে বার-কতক ফুঁ দিয়ে আবার পরে নিয়ে হাতের বিচিত্র ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে আলেকজান্ডার বলল, 'তিনি এখন রেকিয়াভিক, না না, নানোরতালিকে তাঁর সাগরবিবির সঙ্গে নিদ্রা গেছেন। ভুল, একদম ভুল বলেছি। তিনি একটা অন্ধ ছেলেকে নিয়ে লন্ডনে চোখের হাসপাতালে দিন-রাত্তির এক করে দিচ্ছেন। ভুল নাকি? এটাও কি ভুল বললাম? মনে পড়েছে, তাসিলাকের পথে প্রচণ্ড ঝড়ে জাহাজডুবি হতে হতে বেঁচে গিয়ে তিনি জাহাজের ছাদে বসে বালিসোনার নকশা আঁকতে লেগেছেন। না না, এই ঠিক মনে পড়েছে— জলদস্যুদের আক্রমণে বিধ্বস্ত একটা জাহাজ থেকে একটা মেয়েকে উদ্ধার করতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন। এই এক মুশকিল। যত বলি তত ভুল বলি। এই দেখুন না, 'দরিয়াবিবি' বললাম তো—?'

'সাগরবিবি বলেছেন?'

'সাগরবিবি ভুল, দরিয়াবিবি ঠিক।'

টুপি খোলার সময় পড়ে যাওয়া ময়ূরের পালক ফিরিয়ে দিয়ে পরীক্ষিৎ বলল, 'দরিয়াবিবি কে?'

'সম্রাট জাহাঙ্গীরের যেমন নূরজাহান, জাহাঙ্গীরসাহেবের তেমনই দরিয়াবিবি।'

'জাহাঙ্গীরসাহেব বলেছিলেন, তিনকুলে ওঁর কেউ নেই—'

'কুলে তো নেই, সমুদ্রে আছে। আমিও সমুদ্র থেকেই আসছি। আপনাকেই আমার দরকার।'

বাড়ি পর্যন্ত এসে প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাঠের বাক্স বের করে পরীক্ষিতের হাতে দিয়ে বাক্সের গায়ের লেখাটা দেখিয়ে বলল, 'এই যে দেখছেন আইসল্যান্ড লেখা, এদিকে আইসল্যান্ডের মাটি, আর ওপাশে গ্রিনল্যান্ড লেখাটা দেখেছেন? ওদিকে গ্রিনল্যান্ডের মাটি, মাঝখানে পার্টিশান। এই মাটি আপনার বাবার কবরে ছড়িয়ে দেবেন। জাহাঙ্গীরসাহেব নিজে আসতে পারলেন না, তাই আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।'

কথাটা বলেই লোকটা সোজা উল্টো মুখে হন হন করে ঘাটের পথে হাঁটা লাগাল।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আজকের রাতটা এখানে থেকে যান।' বলতে বলতে পরীক্ষিৎ দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরার আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, অসমাপ্ত সিঁড়ির ধাপে তার কপাল ঠুকে গেছে। নির্জন সন্ধ্যায় নদীর হাওয়ায় এমন গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল তার নিজেরই বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া যেসব কথা লোকটা বলল সেসব তো সত্যিও হতে পারে, অথচ আইসল্যান্ড-গ্রিনল্যান্ডের মাটির অংশটা বাদে পরীক্ষিৎ কোনওটার বিন্দুবিসর্গ জানত না। তবে এই যে বলে গেল— তার ওই অদ্ভুত নৌকোটা আসলে ক্যাটামেরন, তামিল ভাষায় ক্যাটা মানে গাছ আর ম্যারন মানে বাঁধা, এখন মনে পড়ছে পরীক্ষিত সেটা অম্বরীশের লংকাদ্বীপের কাগজপত্রের মধ্যে দেখেছিল। সেখানে ক্যাটামেরনের একটা স্কেচও ছিল। বড় বড় গাছের ডাল বেঁধে নৌকোর মতো একটা যান। তাহলেও কি এটাকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে! ওর অনেক কথাই তো পরীক্ষিৎ আগে কারও কাছে শোনেনি! আবার স্বপ্নই যদি না হবে তাহলে সেই কাঠের বাক্স কোথায় গেল? আর সেই অদ্ভুত ক্যাটামেরন?

২৭

বালিসোনায় প্রতিবছর শীতকালে কুয়াশা যেন বেড়েই চলেছে। এরকম এক শীতের কুয়াশা ঢাকা ভোরে চৌধুরীবাড়ির দরজার ভারি কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। এবারও জাহাঙ্গীর। সঙ্গে লজ্জাবতী-ময়নামতীর সেই জন্মান্ধ ভাই।

জাহাঙ্গীর জানাল, ছেলেটাকে নিয়ে যাবার পর থেকেই তার জীবনে অনেক শুভ ঘটনা ঘটছে। সে জন্য আজন্ম নামহীন ছেলেটার নাম রেখেছে শুভ।

শুভ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আমার দিদিরা কেমন

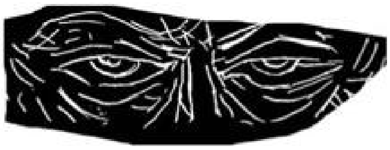

মুখে পুরু পাউডার, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, ঝলমলে শাড়ি-ব্লাউজে সেজে তার দিদিরা দরজার বাইরে কেন দাঁড়িয়ে আছে ভেবে না পেয়ে শুভ দুজনের হাতে গার্নেটের লাল টকটকে বালা তুলে দিতে দিতে বলল, 'আমি আসব বলে তোমরা এমন সেজেছ?' 'তুই দেখতে পাস? তুই আমাদের দেখতে পাচ্ছিস? মা গো!'

আছে? আমি দিদিদের কাছে একবার যাব। দুজনের জন্য অনেক কিছু এনেছি।'

পরীক্ষিৎ জাহাঙ্গীরকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কাঠের বাক্সে দু-দেশের মাটি নিয়ে এসেছেন? ডালায় দু-দেশের নাম পাশাপাশি লেখা?'

'আশ্চর্য! আশ্চর্য! তুমি কী করে জানলে? তুমি কি আল্লার দূত? আল্লার করুণা তুমি পেয়েছ?'

দুদিন পরে অম্বরীশের মৃত্যুদিনে তার সমাধিতে পরীক্ষিৎ পারমিতা ও তাদের অনুরোধে জাহাঙ্গীর প্রথমে আইসল্যান্ডের, পরে গ্রিনল্যান্ডের মাটি ছড়িয়ে দিল। অবনীমোহন সেদিন ভোর থেকেই ভাইয়ের সমাধির পাশে বসে দীর্ঘক্ষণ ধ্যানে কাটাল। সরোজিনী প্রতিবারের মতো ফুল ছড়িয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে যাবার সময় নন্দিনীর ছেলে মেঘাবৃতর কচি হাতে কয়েকটা ফুল গুঁজে দিয়ে গেল। লিওনার্দো নিজের বুকে ক্রশ এঁকে তাদের মেয়ের দু-হাতের ফুল কবরের ধারে ছড়ানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত লক্ষ্মীকে হাতের আড়াল দিয়ে হাওয়া বাঁচিয়ে পর পর অনেকগুলো ধূপকাঠি ধরাতে সাহায্য করে।

আগের দু-রাতের মতো রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর পরীক্ষিৎ জাহাঙ্গীরকে অতিথিকক্ষে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবার সময় জাহাঙ্গীর তাকে বসতে বলল।

'বালিসোনার কথা কিছু ভাবছ? এখানকার নতুন নতুন দোকান-বাজার বা ব্যবসা-বাণিজ্যের বদলে যাওয়ার ধরন আর চাষের জমির ব্যবহার— এই দুটো বিষয় নিয়ে ভাবো, দ্যাখো কিছু করা যায় কি না। আল্লাহ্‌ যখন নদী ফিরিয়ে দিয়েছে তখন এখানকার মাটিতে মানুষের মনও হয়তো নতুন করে গড়া যাবে। অম্বরীশের স্বপ্ন ছিল বিরাট, জীবন ছিল ছোট। সে নদী এনেছে, তুমি মানুষ আনো।'

পরীক্ষিৎ সোফায় বসে মুখ নিচু করে শুনছিল। মাথা তুলে বলল, 'দরিয়াবিবি আপনার কে হয়?'

'দরিয়াবিবি?'

'সম্রাট জাহাঙ্গীরের যেমন নূরজাহান, আপনার তেমনই দরিয়াবিবি, তাই তো? আপনি বলেছিলেন, আপনার কেউ নেই।'

'দরিয়াবিবি, নূরজাহান— এসব কী বলছ তুমি?'

'আলেকজান্ডার নামে আপনার কোনও কর্মচারী আছে?'

জাহাঙ্গীর বিছানায় বসে কথা বলছিল, লাফিয়ে উঠে বলল, 'আলেকজান্ডার? কী ব্যাপার বলো তো? আমার একজন কর্মচারী ছিল, তার নাম আলালুদ্দিন। একবার মাঝসমুদ্রে জাহাজডুবি হতে হতে বেঁচে ফিরি, ও আর ফিরতে পারেনি।'

'দরিয়াবিবি বা সাগরবিবি বলেও কি কেউ নেই?'

'এসব নাম তুমি পেলে কোত্থেকে? সাগর, দরিয়া— আমার তো কোনও বিবিই নেই। তবে একজন ছিল, সে আমার কেউ না, আলালুদ্দিন তাকে বুয়েনস-বিবি বলত।' খানিক চুপ থেকে জাহাঙ্গীর আবার বলল, 'আমার জীবনে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে, সমুদ্রে অনেক আশ্চর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু সান্দ্রা আরান্দার সঙ্গে আলালুদ্দিনের প্রেম দেখে ভেবেছি এ কী করে সম্ভব? ওই একবারই আমি আমার জীবন নিয়ে আফশোস করেছি! উন্মাদ সমুদ্রঝড়ে মারাত্মক বিদ্যুৎচমকের মতো ওই একবারই আমার হৃৎপিণ্ড চলকে উঠেছিল! আর্জেন্টিনার মেয়ে, জলদস্যুদের হঠাৎ হানায় জাহাজের প্রায় সবাই যখন হয় মৃত, নয় বন্দী, তখন সে জলে ঝাঁপ দেয়। আমিই তাকে আল্লার কৃপায় উদ্ধার করি। আমার জাহাজ থেকে সমুদ্রে জোডিয়াক নামিয়ে আলালুদ্দিনকে দায়িত্ব দিই সবচেয়ে কাছের বন্দরে নিয়ে যেতে। যতদিন না তার দেশের আপনজনদের সন্ধান মেলে ততদিন সেই বন্দরশহরে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিই। দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিলাম আলালুদ্দিনকে। হয়তো জোডিয়াকে তুলে নেবার পর থেকেই আলালুদ্দিন ওর প্রেমে পড়ে যায়। সান্দ্রাকে সে বুয়েনস-বিবি বলত। আলালুদ্দিনের মৃত্যুর খবর পেয়ে সান্দ্রা সেই যে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল, চার মাস পর মারা যাবার আগে পর্যন্ত তাকে আর কিছু খাওয়ানো যায়নি। ওষুধও না।'

আবার চুপ। এবার বলল, 'তুমি বালিসোনার কথা ভাবো। আমার দিক থেকে সবরকম সাহায্য তুমি পাবে। চালু লাইনসুদ্ধ জাহাজ বিক্রি করেও আমি চলে আসতে পারি। আমার জীবনে ওই একজনই বন্ধু— অম্বরীশ।'

লজ্জাবতী-ময়নামতী ভাইকে এরকম পরিবেশে আসতে দেবে কিনা তা নিয়ে পরীক্ষিতের মনে সংশয় ছিল। প্রসঙ্গটা তোলবার আগেই বালিসোনায় ভাই এসেছে শুনে দুই বোন আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

পরীক্ষিৎ তবু বলল, 'ভাইয়ের সঙ্গে কোথায় দেখা করতে চাও?'

'আমাদের তো কোথাও যাবার উপায় নেই, ওকেই এখানে নিয়ে আসুন। একবার অন্তত চোখের দেখা দেখে নিই।'

শুনে শুভরও আর তর সয় না। বেলা থাকতে থাকতে পরীক্ষিতের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

মুখে পুরু পাউডার, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, ঝলমলে শাড়ি-ব্লাউজে সেজে তার দিদিরা দরজার বাইরে কেন দাঁড়িয়ে আছে ভেবে না পেয়ে শুভ দুজনের হাতে গার্নেটের লাল টকটকে বালা তুলে দিতে দিতে বলল, 'আমি আসব বলে তোমরা এমন সেজেছ?'

'তুই দেখতে পাস? তুই আমাদের দেখতে পাচ্ছিস? মা গো!'

প্রথম বাক্যটা লজ্জাবতীর। দ্বিতীয়টা ময়নামতীর। 'মাগো!' দুজনের একসঙ্গে কঁকিয়ে ওঠা।

'এটা খুব বিচ্ছিরি জায়গা! ফিশিং-হারবারের মতো আঁশটে গন্ধ!' শুভর মুখ থেকে সব খুশি নিমেষে মুছে গেল।

দুই বোন গলা চিরে চেঁচিয়ে উঠল— 'ওকে এখানে আনলেন কেন?'

'তোমরাই তো বললে।'

'ও যে দেখতে পায় বলেননি তো?'

'এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে বলে তোমরা খুশি হওনি?'

এক মাঝবয়সি মাতাল 'লজ্জাবতীর লজ্জা ভাঙতে এয়েচি গো!' বলতে বলতে ময়নামতীর চিবুক ধরে আদর করতেই ময়নামতী পিছন ফিরে মুখ আড়াল করল।

'দিদি গো! কী মুখ দেখলাম তোমাদের।

জীবনে প্রথম তোমাদের দেখলাম। এই তোমাদের বাড়ি? এখানেই তোমরা থাকো?' বলতে বলতে শুভ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

রাতে অতিথিকক্ষে ঘটনাটা শুনে জাহাঙ্গীর কিছুক্ষণ থম মেরে থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'এ তো একটা মাত্র ঘা, গোটা শরীরের রক্তই যেখানে দূষিত, সেখানে শরীরের নানা জায়গাতেই বিষ শুধু ফুটে বেরবার অপেক্ষা। কথাটা সবাই মিলে ভাবো। বালিসোনায় কবি, শিল্পী, ভাবুকের তো অভাব নেই।'

যেদিন কোনও রাজনৈতিক দলের মিছিল বা জনসভা নেই সেরকম একটা রবিবার দেখে রাসমাঠে বালিসোনা-মঙ্গলমঞ্চের সমাবেশ ডাকা হল। হাতে আড়াই সপ্তাহ সময়, তার মধ্যে সভার পরিকল্পনা ও প্রচারের সব কাজ শেষ করতে পরীক্ষিৎরা সকলেই হাত লাগাল। সমাবেশে বালিসোনার মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন অবনীমোহন, লক্ষ্মী, লিওনার্দো, প্রদীপ, পরীক্ষিৎ, পারমিতা, অম্বরীশের বন্ধু হিসেবে জাহাঙ্গীর, তাছাড়া আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কবি, অধ্যাপক ও চিন্তাশীল মানুষ। নন্দিনী ওদিন কিছু বলতে চায়, তাকে বোঝাতে হল এখনও তার শোকের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে, এখনই তার জনসমক্ষে কিছু না বলাই ভালো, তার বক্তব্য অন্যরা তো বলবেনই। সরোজিনীর মঞ্চে বলা অভ্যেস নেই, নেপথ্যে থেকে পুরো অনুষ্ঠানের দেখভাল করার দায়িত্ব তার।

সমাবেশের লোকসংখ্যা আগের শোভাযাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেল। নানা দিক থেকে আলোচনার পর ঠিক হল বালিসোনার মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য দৈনন্দিন যা কিছু করণীয়, পুলিশ, প্রশাসন ও মঙ্গলমঞ্চকে একসঙ্গে বসে তা স্থির করতে হবে। মঙ্গলমঞ্চের মতে, বালিসোনাকে অশুভের প্রভাব-মুক্ত করতে প্রথমেই তিনটি ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হোক। একদিকে নতুন নতুন দোকান-বাজার ব্যবসা-বাণিজ্যের নৈতিক-সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, আরেকদিকে চাষের জমির ন্যায্য ও মানবিক ব্যবহার। তৃতীয় সমান গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র— ভয় ও দারিদ্র্য থেকে বালিসোনার সব শ্রেণীর মানুষের মুক্তি। এইসব কাজে বালিসোনা মঙ্গলমঞ্চ থেকে যখন যে ন্যায়-নীতির বিধান দেওয়া হবে, স্থানীয় প্রশাসনকে মেনে চলতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোও এর বিরোধিতা করতে পারবে না। আপাতত মঙ্গলমঞ্চের একটি অস্থায়ী কোর কমিটি... ঘোষণা শেষ হবার আগেই বিস্ফোরণের শব্দে ধোঁয়ায় আর্ত চিৎকারে বালিসোনার ঐতিহাসিক সমাবেশ ছত্রখান হয়ে গেল।

সেদিনই বেশি রাতে সেজোভাই আনন্দমোহন বাড়ি ফিরেই অবনীমোহনকে ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'তোরা কী মনে করিস— প্রশাসন গাঁজাখোরদের আসর? নাকি ছোকরা কবিদের বাসর?'

অবনী শান্ত স্বরে জানতে চাইল, 'এসব কথা উঠছে কেন?'

'উঠছে এই জন্য যে তোরা প্যারালাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাতে চাস! এ আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।'

কথার সঙ্গে মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে, অবনীমোহন ভ্রু কুঁচকে চুপ করে রইল।

যেতে গিয়েও আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে আনন্দমোহন কৈফিয়ত চায়, 'পরীক্ষিৎ, প্রদীপ, রাঙাবউ, লক্ষ্মী, লিওনরাই বা এসবের মধ্যে যাচ্ছে কেন? দেশের ব্যাপারে কিন্তু বিদেশিদের নাক গলানো সহ্য করা হবে না!'

অবনীমোহন এবারও শান্ত স্বরে বলল, 'এর মধ্যে বোমা-বারুদ আসছে কী করে সেটা তো আগে ভাবা দরকার।'

বিস্ফোরণের ঘটনায় পরীক্ষিতের মন বিষাদে ছেয়ে গেছে। মঙ্গলমঞ্চের পথে কোথাও শেষ পর্যন্ত পৌঁছনো যাবে কিনা সে-বিষয়ে তার মনে ঘোর সন্দেহ।

রথের মেলায় শুভকে পঞ্চমুখী বাঁশের বাঁশি কিনে দেবার শপথ ভেঙে রথের চার মাস আগেই সে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। এবার সেও সমুদ্রে যাবে।

বাঁশির কথা শুভরও আর মনে নেই। বেশিরভাগ সময় সে জাহাজে তার ছোট্ট কুঠুরিতে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, নয়তো পিছনের ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে অনন্ত জলরাশির দিকে চেয়ে থাকে। যখন কাঁদে, তখন কখনও কখনও পরীক্ষিৎ এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। জাহাজ গভীর সমুদ্রে না পড়া পর্যন্ত এভাবেই নির্বাক তার দিন কাটে। গার্নেট কেটে বালা তৈরির কাজ আবার শুরু করার দিনও মাঝে মাঝেই মেশিনে মাথা রেখে তাকে কাঁদতে দেখে জাহাঙ্গীরও এসে তার মাথায় হাত রাখে। কোণের টেবিলে গার্নেট পালিশ করা থামিয়ে প্রৌঢ় ইংরেজ কারিগর বলে, 'হি মাস্ট হ্যাভ লস্ট সামওয়ান ভেরি ডিয়ার টু হিম।' একটু পরে আবার বলে, 'আই কুড ফিল হিজ সাফারিং। গত বছর লন্ডন টিউবে বিস্ফোরণে স্ত্রী-কন্যা দুজনকেই হারিয়েছি আমি।'

পরীক্ষিতের স্বপ্নের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়, জাহাঙ্গীরকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শুভকে আপনি লন্ডনের আই হসপিটালে অনেকদিন ধরে চিকিৎসা করিয়ে ছিলেন, না?'

জাহাঙ্গীর মাঝসমুদ্রের মতো স্থির দৃষ্টিতে পরীক্ষিতের দিকে চেয়ে থাকে।

বালিসোনায় মিথ্যার মহামারী থেকে পালিয়ে দেশে-দেশে মানুষের জীবন দেখে বেড়ানোর স্বপ্ন পরীক্ষিতের মনে দিনে-দিনে ফিকে হয়ে আসছে। জাহাঙ্গীরের অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার মালবাহী জাহাজে এই সমুদ্রযাত্রার কোনও মিল নেই।

ওপর তলায় ছ'টা একশয্যার এয়ার কন্ডিশানড কেবিনের চারটেয় তারা থাকে। বাকি দুটিতে কখনও কখনও বিশিষ্ট দুয়েকজন যাত্রীও নেওয়া হয়। তারা মন্ত্রীও হতে পার, মাফিয়াও হতে পারে। একবার এক আরবদেশের রাজা গণআন্দোলনের চাপে শুধু তাঁর কনিষ্ঠ বেগমকে নিয়ে গোপনে দেশত্যাগ করে এই জাহাজেই বেশ কয়েকদিন ছিলেন। সেসময় জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মগোপনে নানা ভাবে সাহায্য করেছিল। তাঁর শোক লাঘব করতে কোমল শয্যা ও বিবিধ সুখাদ্যের ব্যবস্থা করেছিল। পালকের চেয়েও হালকা চিনদেশের রেশমসুতোর লেপ আর আর্জেন্টিনার বিফের স্টেক বিষাদগ্রস্ত বেগমসাহেবার আহারে-শয্যায় অরুচি নাকি কিছুটা হলেও কাটিয়ে দিয়েছিল। সেই উপকারের কথা রাজা ভোলেননি। তাঁর বর্তমান আবাস স্পেনের গ্রানাডার কাছে আলমেরিয়া উপসাগরের তীরে আলমেরিয়া বন্দর থেকে যখনই তাঁর কোনও না কোনও জাহাজ জাহাঙ্গীরের সমুদ্রপথ দিয়ে যায় তখন ক্যাপ্টেনের হাতে তিনি জাহাঙ্গীরের জন্য অতি মূল্যবান সব উপহার পাঠান। জাহাজের ব্যবসার বীজও তিনি নাকি জাহাঙ্গীরের কাছেই পেয়েছেন। একবার রেকিয়াভিকে জাহাজ আনলোডিং-লোডিংয়ের মাঝখানে আরব-রাজার ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরকে হীরের কুচি বসানো স্পেনের ষাঁড়ের শিঙের তৈরি বড় এক জোড়া চিরুনি ও মিনে-করা কাঠের বাক্সে তিল-পেস্তার আরবি মিঠাই দিয়ে জানাল, রাজার ইচ্ছেয় তাঁর সমুদ্রপরিবহণ ব্যবসা বাড়াতে জনা-ষাটেক শখের অভিযাত্রী নিয়ে ছোট একটা জাহাজে সে শিগগিরই বিশ্বপরিক্রমায় বেরোবে।

'মাই অ্যারাবিয়ান কিং জানতে চেয়েছেন তোমার জাহাজের দায়িত্ব তোমার লোকেদের হাতে ছেড়ে তুমি রাজার মেহমান হিসেবে আমাদের সঙ্গে যেতে চাও কিনা।'

রাজার আতিথেয়তা সম্পর্কে গ্রানাডায় আল-হামব্রার প্রাসাদের কাছে তাঁর নতুন কেনা মস্ত অট্টালিকায় দু'দিন থেকেই জাহাঙ্গীরের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এবার জাহাজে বিশ্বপরিক্রমায় পরীক্ষিৎকে ঠেলে দিতে চায়। ঠিক হল, তার প্রাণের বন্ধু অম্বরীশের ছেলে, তার ইয়াং ফ্রেন্ড, পরীক্ষিৎকে নিয়ে জাহাঙ্গীর নিজেই রাজার গ্রানাডার বাসভবনে যাবে। তাঁর সম্মতি থাকলে এই স্বপ্নচর, বিষাদগ্রস্ত পরীক্ষিৎকে আলমেরিয়া বন্দরে সে-ই জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে আসবে।

(ক্রমশ)

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
  'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

বারিদবরণ ঘোষ

পর্ব: ৮

বসুমতী

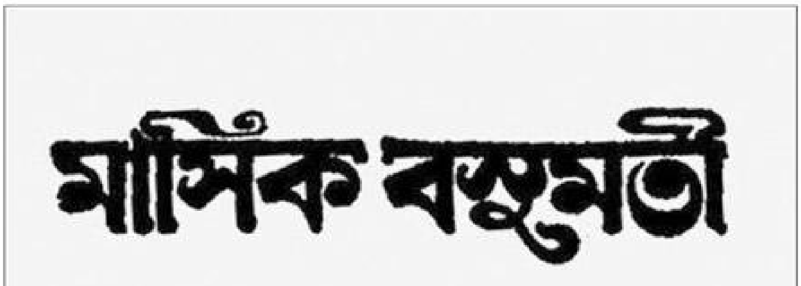
মাসিক বসুমতী

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

১৯তম বর্ষের বৈশাখ সংখ্যা

'প্রতিদিনই বাঙ্গালা সংবাদপত্রের গ্রাহকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়া বোধ হয়, অতৃপ্ত-হৃদয় পাঠকবৃন্দ যেন কোন্ পত্রে মনোমত প্রবন্ধ পাইবেন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।... এই অভাব যথাসাধ্য মোচনার্থ চেষ্টা করিবার জন্যই 'বসুমতী' প্রচারিত হইল।' এই যে বসুমতী 'প্রচারিত হইল'— সেটি কোনও দৈনিক কাগজ ছিল না, ছিল সাপ্তাহিক আকারের একটি কাগজ— প্রথম বের হল ১০ ভাদ্র বাংলা ১৩০৩, ২৫ আগস্ট ইংরিজি ১৮৯৬ তারিখে। 'অন্নপ্রাণ বাঙ্গালী অবসন্ন প্রাণে যাহাতে দুটা সুখের কথা, দুটা অর্থের কথা, দুটা উপাদেয় কথা, দুটা আশার কথা, দুটা হাসির কথা পড়িতে পায়'— এই চেষ্টা নিয়ে কাগজ বের করলেন কলকাতার পূর্ণচন্দ্র মুখুজ্যের ছেলে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯১৯)। একসময় ইনি সুরেশ সমাজপতির 'সুখ্যাত' 'সাহিত্য' মাসিকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজেদের একটা ছাপাখানা ছিল। এই ছাপাখানা থেকে দীনবন্ধু, মাইকেল, অমৃতলাল বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ থেকে সেকালের বাঘা বাঘা লেখক-লেখিকাদের গ্রন্থাবলি ছেপে বাংলা সাহিত্যের প্রচারকে তুঙ্গে তুলে দিয়েছিলেন। নিজেও বইপত্র লিখেছিলেন।

এই আদি সাপ্তাহিক বসুমতীর অফিস ছিল ১১৮ পুরনো চিনেবাজার। সম্পাদনা করতেন ব্যোমকেশ মুস্তাফি, কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়েরা বিভিন্ন সময়ে। এটি চলতে থাকে, গ্রাহক সংখ্যাও বাড়তে থাকে। অনেক পরে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগস্ট, বাংলা ২১ শ্রাবণ ১৩২১ তারিখে 'বসুমতী'র দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ পেল। প্রথম সম্পাদক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। আর কিছুদিন পরেই তো এর শতবার্ষিকী!

উপেনবাবু মারা গেলেন ১৯১৯-এর ৩১ মার্চ। বসুমতীর স্বত্বাধিকারী হলেন তাঁর ছেলে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৪৪)। তাঁর মাথায় তখন দৈনিক 'বসুমতী' ছাড়াও এর একটি মাসিক সংস্করণ প্রকাশের পোকা ঘুরঘুর করছিল। বাঘা সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬-১৯৬২) এই 'পোকা'টি তাঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ততদিনে তিনি 'বসুমতী'র দৈনিক সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছেন। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসীর মতো মাসিক পত্রিকা থাকলেও তিনি উৎসাহ দিলেন। সতীশবাবু তাঁকেই সম্পাদক করে বাংলা ১৩২৯-এর বৈশাখ মাসে 'মাসিক বসুমতী' প্রকাশ করে বসলেন। 'ভাবের প্রচার যত অধিক হয়, উন্নতির পথ ততই জাতির পক্ষে সুগম হয়।' বিজ্ঞান, শিল্পবাণিজ্য, ইতিহাস, কৃষি, রাজনীতির বিভিন্ন 'ভাব' প্রচারের সঙ্গে গল্প-উপন্যাসের ককটেল বানিয়ে বেশ উপাদেয় একটা মাসিক পত্রিকা তিনি উপহার দিলেন। তবে এতে হেমেন্দ্রপ্রসাদের নাভিশ্বাস উঠে গেল। দৈনিক আর মাসিক— দুটোর দায়িত্ব পালন চাট্টিখানি কথা নয়, মাসিকের ভার তিনি ছেড়ে দিলেন। অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত আটমাসে তিনি আয়োজন মন্দ করেননি।

উপেন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য। প্রথম সংখ্যার একেবারে শুরুতেই শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ত্রিবর্ণ ছবি ছাপিয়ে অগৌণে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে নিলেন এবং সম্ভবত জনগণের এই 'দেবতা'র মাধ্যমে সাধারণ সংসারে ঢুকে পড়তে চাইল গৃহী শিষ্যের মতো। তারপরে পূর্ব যোগাযোগের সূত্রে একগুচ্ছ লেখকদের এনে উপস্থিত করলেন মাসিক বসুমতীর আসরে— উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে সে আসর জমজমাট। কে-না লিখছেন— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, মনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী থেকে শরৎ চাটুয্যে; শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ইস্তক প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরি, প্রফুল্লচন্দ্র রায় মায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। বসুমতী একেবারে সাহিত্যসম্ভারে টলমল করে উঠল।

কিন্তু এই টেম্পোটা ধরে রাখতে পারলেন

না পরবর্তী সম্পাদক সতীশচন্দ্র। তাঁর না-ছিল উদার দৃষ্টি, না-ছিল পরিকল্পনার শক্তি। তাঁর হাতে বসুমতী ঘরোয়া একটা পাঁচ-পাঁচি কাগজ হয়ে উঠল। সত্যেন্দ্রকুমার বসুকে ডেকে এনে যুগ্ম-সম্পাদক করেও আদি চরিত্রে ফিরতে পারল না ১৩৩১-এর পরবর্তী বসুমতী। তবে সত্যেন্দ্রকুমার বসু একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেললেন রবীন্দ্রনাথকে এই আসরের মধ্যমণি করে এনে। কিন্তু ছাপিয়ে দিলেই কাগজ হয় না। লেখায় না-আছে বিন্যাস, না-আছে অধিকাংশ লেখার উপযুক্ত মান। রবীন্দ্রনাথের লেখা আর ভোটরঙ্গের বিজ্ঞাপন পাশাপাশি ঠাঁই পেতে লাগল। এবং যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এলেন বাজিমাত করতে ১৩৩৪ সালে মাত্র চার বছরের মধ্যে তাঁকেই অপমানের 'ঘুঁটের মালা'টি পরিয়ে দিতেও সতীশ-সত্যেন্দ্র পিছপা হলেন না। 'সাহিত্যিক মোরগের লড়াই' ছাপিয়ে রবীন্দ্রনাথের অপমানের ভরা পূর্ণ করে দিলেন এবং ধারাবাহিকভাবে তা অব্যাহত থাকল। তাঁরাও কি 'নারায়ণী সেনা'র দলে নাম লেখালেন!

১৩৪০ সালে সত্যেন্দ্রকুমার চলে যেতেই সতীশচন্দ্র একাই পত্রিকাকে একশো বছর পিছিয়ে দেওয়ার আয়োজন করলেন। হিন্দুধর্মের প্রচার প্রসারের কথা বলছি না— সে একেকটা কাগজ একেকরকমের হতেই পারে। তা বলে বাল্যবিবাহকে সমর্থন (হায় বিদ্যাসাগরমশায়!) এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার বিপক্ষে ক্রমাগত লেখালেখি চলবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বের একটা মাসিক পত্রিকায়! এসব লেখা সতীশচন্দ্র নিজেই নির্বাচন করতেন। তবে তিনি আর যে একটি পশ্চাদবর্তী কাজ করতেন তা তো রবিঠাকুর-স্বামী বিবেকানন্দ এবং প্রমথ চৌধুরি— সবাইকে একসঙ্গে হত্যা করার শামিল। তিনি চলিতভাষা পছন্দ করতেন না। সাধু বাংলার প্রতি তাঁর এতই আগ্রহ ছিল যে, তিনি অ-সাধু চলিত ভাষার লেখাগুলোকে সাধুভাষায় পরিবর্তিত করে তবে ছাপতেন! এজন্যই কি 'সাধু সাবধান' কথার উৎপত্তি? ভীতিপ্রদ সম্পাদনার আদর্শ! গুরুগম্ভীর হিন্দুধর্মাত্মক প্রবন্ধ এবং রহস্যরোমাঞ্চ সিরিজের মন্দিরা দুটি দুই-হাতে নিয়ে বাদ্যরত পাঠকচিত্ত বিভ্রান্ত এবং আরও সন্ত্রস্ত— 'টমাস' প্রভৃতি শিল্পীদের ছবিপ্রকাশ। ১৩৪৬-এ বৈশাখ সংখ্যায় টমাসের আঁকা 'সিক্তা' ছবি দেখে শনিবারের চিঠির চাটনি-মন্তব্য উদ্ধার না করে পারা যায় না— 'বৈশাখের গরমে 'বসুমতী' উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। 'শিল্পী মিষ্টার টমাস' সেমিজ ব্লাউজ খুলিয়াছেন, অর্ধআবৃত দেহের বাকি কাপড়টুকুও ভিজাইয়া ফেলিয়াছেন। Better Late than never. আমরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইতেছি।' কিন্তু সতীশচন্দ্রের

সত্যেন্দ্রকুমার বসুকে ডেকে এনে যুগ্ম-সম্পাদক করেও আদি চরিত্রে ফিরতে পারল না ১৩৩১-এর পরবর্তী বসুমতী। তবে সত্যেন্দ্রকুমার বসু একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেললেন রবীন্দ্রনাথকে এই আসরের মধ্যমণি করে এনে।

'সতী'ত্ব তাতে এতটুকুও টোল খায়নি। রামকৃষ্ণ-সনাতন হিন্দুধর্ম এবং বোম্বেটের সহাবস্থানে 'বসুমতী' স্থির রইল।

কিন্তু কিছুটা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন লেখকগোষ্ঠী। পাঠককুলের প্রতিক্রিয়া ততখানি জানতে পারা যায়নি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এলে গেছেন বটে, কিন্তু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সরোজনাথ ঘোষেরা বলতে লাগলেন— সতীশ/সতীশবাবু একটু বদলে যান। এই করতে করতেই ১৩৫১ সালের বৈশাখ মাসে সতীশচন্দ্র মারা গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন কৃতী অধ্যাপক যামিনীমোহন কর। বসুমতীতে আগেই তাঁর লেখাপত্তর ছাপা হত যদিও তাতে তাঁর সুনাম বৃদ্ধি ঘটেনি। প্রায়শই তিনি বিদেশি লেখকদের লেখা নাম-ধাম বদলে দিয়েই নিজের নামে ছাপাতেন! বড়ো মাপের 'কুম্ভীলক'! কিন্তু তিনি এসেই 'বসুমতী'র গায়ে লেপটে থাকা প্রাচীনপন্থী গন্ধটাকে মুছে ফেলে একপোচ আধুনিকতার রং লাগিয়ে দিলেন। আসলে রং লাগাবার আসল মিস্ত্রিটি যিনি ছিলেন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের তুখোড় ছাত্র প্রাণতোষ ঘটক। তাঁর ঘটকালিতে 'বসুমতী'র প্রাণ তুষ্ট হল। আমরা যে 'মাসিক বসুমতী' অতঃপর পেলাম তার নাম বদলে 'মাসিক বসুমতী': আধুনিক সংস্করণ' নামটি দিলেই সঙ্গত হত।

প্রাণতোষ যখন বসুমতীর পুরোপুরি সম্পাদক তখন বসুমতীতে এসে পড়েছেন দ্বারবঙ্গের বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় থেকে রাঢ়বঙ্গের তারাশঙ্কর, পুববাংলার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে পূর্ণিয়ার সতীনাথ ভাদুড়িরা। এমনকি বিনয় ঘোষ লিখছেন নবজাগরণের প্রবন্ধ। ছবিতে অদলবদল ঘটেছে। টমাসরা পথ দেখেছেন— এসেছেন রুচিকর ছবির পসরা নিয়ে গোপাল ঘোষ, জয়নুল আবেদিন, রমা চক্রবর্তী, অবনী সেন, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরি, শৈল চক্রবর্তীর মতো আধুনিক মনের শিল্পীরা। এবং রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথদের ছবিও। নতুন নতুন বিভাগ খুলেছেন তিনি। মেয়েদের জন্য 'অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ', 'দেশের কথা', 'পত্রগুচ্ছ' (রোজেনবার্গের চিঠিগুলো এখন কাঁপায় আমার মন)। ১৩৫২ সালে বসুমতীর প্রচার সংখ্যা চব্বিশ হাজার এবং ১৩৫৪ সালে বিবিধবদ্ধ গ্রাহক সংখ্যা তেরো হাজার! লেখকদের কত সম্মান করে তিনি লিখতে বলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য উদ্ধার করি— প্রাণতোষ তিনি লিখলেন— 'এমন আন্তরিকতার সঙ্গে কেউ কোনদিন আমাকে লিখতে আহ্বান জানায়নি। বসুমতীতে লিখবো বৈকি, নিশ্চই লিখব।'

এই আগ্রহ ছিল সবার বুকে— নইলে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কেমন করে লিখলেন, 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', অনূদিত হল রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'ভোলগা থেকে গঙ্গা' অথবা লিজেল রেমঁ-র নিবেদিতা। অচিন্ত্য লেখেন রামকৃষ্ণ এবং সৈয়দ মুজতবা আলি লেখেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব' এবং বিনয়কুমার সরকার 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ দর্শন'। কিন্তু প্রাণতোষরা তো চিরকাল থাকবেন না। ১৩৭৭ সালে মাত্র আটচল্লিশেই 'বসুমতী'র ভার লাঘব করে তিনি চলে গেলেন।

আর তারপর থেকেই বসুমতীর প্রচ্ছদে ঠাঁই পেতে লাগলেন চলচ্চিত্রজগতের মক্ষীরানি দেবী চিত্রাবলি। আর লেখেন না প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'জামাতা বাবাজি' বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'সত্যান্বেষী'কে নিয়ে হাজির হন না (তাঁকে তো বসুমতীই ঠাঁই দিয়েছিল প্রথম)। নাই-বা বললাম বসুমতী ক্ষয়ে যাওয়ার ইতিহাস। বাঙালি তার অন্দরমহল থেকে বিদায় দেওয়ার সময় চোখের জল তো ফেলেছিলই।

কৃতজ্ঞতা: স্বপন বসু

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে যে একটি পত্রিকা চলেছিল, তার পিছনে এর লেখক-গোষ্ঠীর একটা ধনাত্মক ভূমিকা ছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মশায় তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অনুরূপা-নিরুপমা-শৈলজানন্দদের আনতে পেরেছিলেন। মধ্যপর্বে খানিকটা অনুর্বর কাল গেছে বটে তবে সেসময়ে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলি খুব সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ব্রহ্মসূত্র, গীতাবিচার রস, মহাভাষ্যের দার্শনিক মত, শঙ্করাচার্য ও বসুবন্ধু— এরকম শতখানেক প্রবন্ধের নাম আমরা করতে পারি— এমনকি একটি প্রবন্ধের নাম 'মাফিয়া ও মুসোলিনী'। প্রবন্ধসম্পদ অবশ্যই একটি মাসিক পত্রিকার দেহগঠন

করে। কিন্তু বসুমতীতে যেসব কালজয়ী লেখা প্রকাশ পেয়েছিল— সেগুলিই বসুমতী অর্ধশতকব্যাপী জীবনে খাদ্য সরবরাহ করেছিল। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বর্গাদপি গরিয়সী', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নগরবাসী', তারাশঙ্করের 'ঝড় ও ঝড়াপাতা' অথবা সতীনাথ ভাদুড়ির 'মিনাকুমারী'র পাশে গোপাল হালদারের 'অন্যদিন', রমাপদ চৌধুরির 'লালবাঈ' অথবা স্বয়ং সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের 'আকাশ-পাতাল' পড়ে আকাশ-পাতাল ভাবেননি— বসুমতীর সেকালের পাঠক এমন কেউ ছিলেন কিনা জানি না।

একসময় আমরা ধর্ম-দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে যে বসুমতীকে নিবিষ্ট দেখেছিলাম সেই বসুমতীই পরে বিনয় ঘোষের 'বাংলার জাগৃতি', শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'বাল্মীকি ও কালিদাস' আর মেঘনাদ সাহার 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার বিজ্ঞান'-এর মতো প্রবন্ধ পড়ে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি', মনোজ বসুর 'চীন দেখে এলাম', বিনয় ঘোষের 'বার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত' যখন তরুণ বয়সে আমরা পড়েছিলাম— বুঁদ হয়ে থাকতাম। ১৩৫২ সাল, সেই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বছরে আমরা বালক। বই আকারে যখন বের হল তখন পড়লাম বসুমতীতে ছাপা যাযাবরের দৃষ্টিপাত। ছদ্মনামে বিনয় মুখোপাধ্যায়ের ভাষার প্রবচন আমরা নকল করি তখন— 'তাতে নেই গতির ছন্দ, আছে গতির আয়াস।' তার 'রঞ্জন' নামধারী নিরঞ্জন মজুমদারের লেখার প্রথম পংক্তিটি আজও ওষ্ঠস্থ— 'মুমূর্ষু সরীসৃপটা হঠাৎ যেন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল।' রঞ্জন যদি আর কিছু না লিখতেন— এই 'শীতে উপেক্ষিতা'র জন্য বিশ্বসাহিত্যে ঠাঁই পেতে পারতেন। বসুমতী তো আমাদের এসবও উপহার দিয়েছে। আর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অননুকরণীয় জীবনীগ্রন্থগুলি?— 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' তো ছিলই— লিখলেন 'ভাগবতীতনু রবীন্দ্রনাথ'-এর মতো বইও। চিরকালীন এবং চিরস্থায়ী। লেনিনের জীবনীও এখানে ধারাবাহিক ছাপা হয়েছিল। আর সর্বকালীন জনপ্রিয় লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবিষ্কারের কৃতিত্ব ঘোষণা করে বসুমতী একাই একশোতে পরিণত হয়েছিল।

আয় আয়/ ছুটে আয়/ আয় তোরা বাঙালি
সাহসের/ লালরঙে/ মন আজ/ রাঙালি
বিদ্রোহী/ রণ সাজে/ দেহ আজ/ সাজালি।...

'ধূমকেতু' ছিল এই সাহসের 'লালরঙে' রাঙানো একটা জ্যোতির্ময় আলোকপুঞ্জ।

> একটি প্রবন্ধের নাম 'মাফিয়া ও মুসোলিনী'। প্রবন্ধসম্পদ অবশ্যই একটি মাসিক পত্রিকার দেহগঠন করে। কিন্তু বসুমতীতে যেসব কালজয়ী লেখা প্রকাশ পেয়েছিল— সেগুলিই বসুমতী অর্ধশতকব্যাপী জীবনে খাদ্য সরবরাহ করেছিল।

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের স্টলে

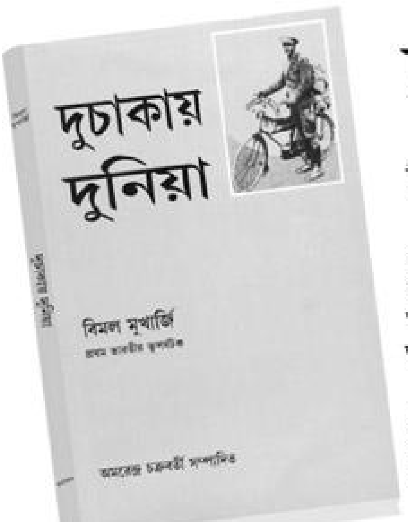

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন
প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি।
তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলি-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর **স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড**, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

বুড়োক্রেজি

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢিলটি মারলে...

লেখার শুরুতেই স্মরণ করিয়ে দিই ব্যুরোক্রেসির সেই বিখ্যাত আপ্তবাক্য, ব্যুরোক্র্যাটরাই ব্যুরোক্রেসির জনক, ব্যুরোক্র্যাটরাই ব্যুরোক্রেসির সন্তান।

বুড়ো হলে মানুষ যেমন ক্রেজি বা বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়েন, ব্যুরোক্রেসির সিস্টেমে বাঁধা পড়ে ব্যুরোক্র্যাটরাই হয়ে পড়েন ক্রেজি।

তাই বুড়োক্রেজি।

ব্যুরোক্র্যাটরা একেকজন একেক ধরণের, তাঁদের স্বভাব-চরিত্র অনুযায়ী ছাপ ফেলে যান তাঁদের কাজে, তাঁরা যে উত্তরাধিকার রেখে যান, তাতেই রপ্ত হয়ে যান পরের ব্যুরোক্র্যাট। এভাবেই বহু বছরের উত্তরাধিকার জমতে জমতে ব্যুরোক্র্যাটদের একটা প্যাটার্ন এখন লোকমানসে জাজ্বল্যমান।

এহেন ব্যুরোক্র্যাটদের প্রথম পোস্টিং হয় জেলায় বা মহকুমায়। জেলা হল জনতার যুদ্ধক্ষেত্র। বড় শহরে পার্টিতে-পার্টিতে লড়াই প্রধানত মস্তিষ্কের। গ্রামে-গ্রামান্তরে মস্তিষ্ক ব্যাপারটা ঢাকা থাকে কাঁথার তলায়। সেখান থেকে বেরিয়ে আসে নানা কিসিমের অস্ত্র। ছুরি-চাকু-লাঠিসোঁটা বেরিয়ে আসে ঝাঁ-চকচকে চেহারায়। শুরু হয় সম্মুখ সমর।

কিন্তু দিন বদলেছে, ছুরি-চাকু-লাঠিসোঁটা এখন অবসোলেট, এখন ক্যাডারদের কোমরে গোঁজা থাকে চেম্বার, কেউ বেগোড়বাই করলে চেম্বার চালানো হয় চোখের পলক না ফেলতে।

জেলায় পার্টিতে-পার্টিতে লড়াইয়ের জন্য মস্তিষ্কের ব্যবহার তেমন হয় না, যতটা হয় অ্যাকশনে। জেলা তাই জনতার যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যুরোক্র্যাটদের প্রথম পোস্টিং। সেখানে পার্টির নেতাদের সঙ্গে লড়াই করে মগজ পাকাতে হয় ব্যুরোক্র্যাটকে। অর্থাৎ ব্যুরোক্রেসি বনাম মবোক্রেসি। জেলার যুদ্ধক্ষেত্র তাই ব্যুরোক্র্যাটদের ব্যুরোক্র্যাট হয়ে ওঠার প্রথম সোপান।

মফস্বলে গিয়ে ব্যুরোক্র্যাটরা নিজেরাই আইন তৈরি করেন ও তাঁদের মুখনিঃসৃত বাক্যকেই জনতা মনে করে আইন। জেলার শাসনকার্যের প্রধান অস্ত্র হল পুলিশ ও বাক্যবাণ। পার্টিতে-পার্টিতে লড়াই হবে আর ব্যুরোক্র্যাট নামবেন আম্পায়ারের ভূমিকায়। রুলিং পার্টির প্রতি পক্ষপাতিত্বে দু-চারটে ভুল আউট দেন আম্পায়ার, আর বিজিত পার্টি তাই নিয়ে আস্ফালন করে, ঠিক আছে, আমরা ক্ষমতায় এলে দেখে নেব।

আর আছে হাইকোর্ট। জনতা কথায় কথায় হাইকোর্টে যাবে, আর পলক না ফেলতে নিয়ে আসবে একটি 'ইঞ্জেকশন' অর্ডার। অর্থাৎ কিনা ইনজাংকশন।

কখনও ইনজাংকশনের পরিবর্তে হাইকোর্ট ইস্যু করেন 'স্টে অর্ডার'। স্টে অর্ডার এমনই সাংকেতিক ভাষায় লেখা হয় যার মানে এ-ও হয়, অ্যা-ও হয়। বিবদমান দুই পার্টির উকিলবাবু তাঁদের মক্কেলদের অনুকূলে স্টে অর্ডারের অর্থ করেন ও বিবাদটি জিইয়ে রাখেন অনন্তকাল।

কোর্টের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে পরে বিস্তারিত লেখা যাবে।

ফিরে আসি ব্যুরোক্র্যাটদের কথায়। জেলার মানুষ কাগজে লেখা 'জি ও' অর্থাৎ গভর্নমেন্ট অর্ডারকে যতটা না অনুসরণ করে, তার চেয়ে বেশি অনুসরণ করতে চায় নেতার মুখনিঃসৃত বাণীকে। নেতাদের মতে 'জি ও' মানে গ্রেট অবস্টাকল। তাঁরা যা বলতে চান বা করতে চান, সরকারের জি ও তাতে বাগড়া দেয়, ফলে নেতারা সর্বক্ষণ ব্যুরোক্র্যাটদের পরামর্শ দেন জি ও উপেক্ষা করে তাঁদের বাণী শুনতে।

সেই পরামর্শ উপেক্ষা করলে নেতার রক্তচক্ষু বর্ষিত হবে ব্যুরোক্র্যাটদের ওপর। আর যদি পরামর্শ মান্য করতে হয় তবে উপেক্ষা করতে হয় সরকারি আদেশ।

অতএব জনতার যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যুরোক্র্যাট সর্বদাই সম্মুখীন একটি শঙ্খনির্মিত করাতের।

কোনও কোনও এলাকায় নেতাদের দাপট এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, নবীন ব্যুরোক্র্যাটের তখন মনে হয়, ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।

সেরকমই এক মহকুমাশাসক নেতাদের দাপটে অস্থির হয়ে পালিয়ে বাঁচলেন অন্য মহকুমায় বদলি হয়ে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন আরেক নবীন ব্যুরোক্র্যাট। মহকুমায় যোগদান করার আগেই ব্রিফ্ড হয়ে এসেছেন যে, এখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে সেই শঙ্খনির্মিত করাতটি।

মহকুমায় এস ডি ও পদটি এমনিতে বেশ পায়াভারী। মফস্বলে এস ডি ও-র কথা মানেই আইন। গাঁয়ে এস ডি ও-র জিপ ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ঢুকলে ভয়ে একদা দরজা-জানলা বন্ধ করে দিত কত মানুষ। কিন্তু পঞ্চায়েত হওয়ার পর গাঁয়ের মানুষের সাহস বেড়েছে। গাঁয়ের নেতারা অফিসারদের গালিগালাজ করে নিজেদের প্রতাপ জাহির করে। ফলে মহকুমাশাসকের দাপট আর আগের মতো নেই। আর নীচের তলার বি ডি ও-র অবস্থা তো একেবারে কেরোসিন। বি ডি ও মানে বড় দুঃখের অফিসার।

তা নবীন এস ডি ও জয়েন করেই মুখে এমন কুলুপ এঁটেছেন যে, তাঁর সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল! মফস্বলের নিয়ম হল কোনও নতুন অফিসার জয়েন করলে এলাকার নেতারা প্রথম কয়েকদিন বুঝতে চেষ্টা করেন অফিসারের মতিগতি, ভাবভঙ্গি। তারপর দলবেঁধে এস ডি ও অফিসে গিয়ে দাপাদাপি করে জানান দিয়ে

আসেন তাঁদের অস্তিত্ব। প্রথম রাতেই বিড়াল মারার মতো একবার এ-পার্টি একবার ও-পার্টি তুমুল ডেপুটেশন দিয়ে তাঁর পার্টির ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করতে চান অফিসারকে যাতে তাঁদের পার্টির দাবিদাওয়া বিষয়ে স্পেশ্যাল কনসিডারেশন করেন নতুন অফিসার। কখনও যদুর দল, কখনও রামের দল, কখনও শ্যামের দলের নেতারা তাঁদের জঙ্গি ক্যাডারদের নিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিয়ে যায়। রাম পার্টি যদি দলবল নিয়ে দাবিদাওয়া জানিয়ে এল তো শ্যাম পার্টি ভাবে, এই যাহ, পালের হাওয়া বোধহয় ওরা কেড়ে নিল। তারাও অমনি নন্দীভৃঙ্গী নিয়ে ঘেরাও করে নানা দাবিদাওয়া জানিয়ে আসে। পরদিন কোমর বেঁধে যদুপার্টিও—

তো এবারও নতুন এস ডি ও-র আবির্ভাব হওয়ার পর তাঁর চালচলন মাপতে শুরু করে পার্টিগুলো। তিনি চেহারায় ছোটখাটো, গলার স্বরও তেমন বাজখাঁই নয়, তবে কীরকম চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন! বেঁটের ওপর মোটাসোটা হওয়ায় ঘাড়ে-গর্দানে এক।

সবার আগে তৈরি হয়ে গেল শ্যাম দল। নেতারা গুচ্ছের দাবিদাওয়া কাগজে লিখে চললেন এস ডি ও-কে 'টাইট' দিতে। এখনকার রাজনীতির অলিখিত নিয়ম হল যে দল যত জঙ্গিপনা দেখাতে পারবে তারাই দেশের হিরো। রীতিমাফিক চেম্বারের বাইরে বহুক্ষণ হাত-পা ছুঁড়ে নিজেদের কেরামতি জাহির করে অবশেষে এস ডি ও-র চেম্বারে ঢুকে আরেক ঝলক বক্তৃতা। তারপর এস ডি ও-কে ধমকের সুরে বললেন, আমাদের দাবিদাওয়ার ব্যাপারটা বুঝেছেন কিছু?

ঘাড়ে-গর্দানে-এক এস ডি ও কীরকম চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, আই আনডারস্ট্যান্ড, আই আনডারস্ট্যান্ড, বলেই হঠাৎ দু-ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফুচুৎ করে কী একটা শব্দ বার করলেন তার অর্থ না-নেতা না-ক্যাডারবৃন্দ কেউ বুঝে উঠতে পারলেন না!

না বুঝতে পারলেও ক্যাডারদের তখনও দম ফুরোয়নি, কিছুক্ষণ এস ডি ও-র কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করে পুনরায় বললেন, বুঝলেন, এর আগে অনেক অনেক এস ডি ও দেখেছি। সবাই শাসকশ্রেণীর ধামাধরা। আমাদের পার্টির লোকদের বেছে-বেছে বাদ দেওয়া হয় সব দানখয়রাতির তালিকা থেকে। এমনকি মুনিশদের নামও বাদ দেওয়া হয় সব কর্মকাণ্ড থেকে। এসব আর চলবে না! এই আমাদের দাবিদাওয়া রইল, আমাদের কথা না-শুনলে আপনার লাইফও আমরা হেল করে দেব।

এস ডি ও অনেকক্ষণ মন দিয়ে শুনলেন নেতার বক্তৃতা, তারপর সেরকমই ফুলো ফুলো ঘাড় দোলাতে দোলাতে বললেন, আই আনডারস্ট্যান্ড, আই আনডারস্ট্যান্ড। তারপর আবার ফুচুৎ করে কী যেন বললেন নেতাকে উদ্দেশ করে।

নেতা বুঝতে না পেরে কটমট করে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী বললেন?

এস ডি ও চোখ গোল্লা করে আবার গলায় কীরকম অস্পষ্ট শব্দ করে বললেন, ফুচুৎ ফুচুৎ—

নেতা কিছু বুঝতে না-পেরে তাকালেন তাঁর সঙ্গী-সেবাদাসদের দিকে। চাপদাড়িওলা জঙ্গিমুখের এক সঙ্গী বেশ চোখমুখ খিঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী বলতে চাইছেন আপনি?

এস ডি ও ঠিক একইরকম নির্বিকার ভঙ্গিতে বেশ কয়েকবার ফুচুৎ ফুচুৎ করলেন নেতার রাগত মুখের দিকে তাকিয়ে।

নেতা কিছু বুঝতে না পেরে তাকান ক্যাডারদের দিকে। একজন ঝাঁকড়াচুলো ক্যাডার চেঁচিয়ে উঠে বলল, ও রে, এ যে দেখি চন্দ্রলোক থেকে এসে কথা বলছে।

বলে আরেক রাউন্ড বক্তৃতা, গালিগালাজ ও চোখমুখ খিঁচিয়ে চলে গেল বাইরে।

তারা চলে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই এসে হাজির হল রামের দলবল। তারাও, শুধু কলাকুশলী বদলে একটু আগেই ঘটে যাওয়া নাটকের দৃশ্যটির পুনরভিনয় করে এগিয়ে দিল দাবিদাওয়ার কাগজখণ্ডটি। এস ডি ও ঠিক আগের মতোই ঘাড় আন্দোলিত করে বললেন, আই আনডারস্ট্যান্ড। আই আনডারস্ট্যান্ড। পরক্ষণে সেই একই কণ্ঠস্বরে বললেন, ফুচুৎ ফুচুৎ—

রামনেতা অমনি তিরিক্ষি হয়ে বললেন, কী বললেন?

এস ডি ও আরও জড়ানো গলায় পুনরাবৃত্তি করলেন, ফুচুৎ ফুচুৎ ফুচুৎ ফুচুৎ—

কিন্তু সেই ফুচুৎগুচ্ছের অর্থ একবর্ণও উদ্ধার করতে না পেরে নেতা তাকান ক্যাডারদের দিকে, ক্যাডাররা নেতার দিকে, আরও সন্দিগ্ধ হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কী যেন ষড়যন্ত্র খোঁজার চেষ্টা করলেন, পরক্ষণে নেতা প্রবল গর্জন করে বলে উঠলেন, আপনি যাই বলুন না কেন, আপনি আমাদের কথা না শুনলে রেহাই পাবেন না! এই রইল ডিমান্ড তালিকা। আমাদের ডিমান্ড না মিটলে—

না মিটলে কী হবে তা আর স্পষ্ট করে না-বললেও রক্তচক্ষু দেখিয়ে দিয়ে গেলেন ইঙ্গিতে।

রামের দল ফিরে গেলে আবির্ভাব যদুর দলের, তারাও এস ডি ও-কে তাদের লম্বা তালিকা ধরিয়ে দিয়ে বলল, শুনুন, যে যাই বলুক, আমরা যাহা বলিব তাহাই সত্য। অন্যে কে কী বলিয়া গেল তাহা লইয়া আপনার মাথা না ঘামাইলেও চলিবে। আমরা যাহা বলিব তাহাই রচিবেন। মনে রাখবেন আমরা রুলিং পার্টি।

এস ডি ও আবার যথা পূর্বং তথা পরং কণ্ঠে ফুচুৎ ফুচুৎ করে যা বললেন তা নেতাদের কর্ণগোচর হলেও বুদ্ধিগোচর হল না, অতএব নেতারা কিছুটা হতভম্ব হয়ে, ঠিক আছে, আমাদের কথা না শুনলে কী পরিণতি হবে তা বুঝিয়ে ছাড়ব, বলে রক্তচক্ষু করে ফরমান দিয়ে সশব্দে, সগৌরবে প্রস্থান করিল।

কিছুদিনের মধ্যে রটে গেল নতুন এস ডি ও ঠিক কী ভাষায় কথা বলছেন তা কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। যে কেউ তাঁর ঘরে ঢুকছে, কিছু ফুচুৎ ফুচুৎ শব্দ ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য হচ্ছে না কারও। তাঁর কথনভঙ্গি এলাকার মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

কিন্তু অফিসের লোকদের খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। তাঁরা ফাইল পাঠাচ্ছেন, ফাইল যথানিয়মে সই হয়ে বেরিয়ে আসছে। কর্মীরাও যা কথা বলছেন তা কীভাবে যেন বুঝে ফেলছেন এস ডি ও। যা উত্তর দিচ্ছেন তা কর্মীরা বুঝে ফেলে তাঁর হুকুম তামিল করছে। তাহলে নেতাদের বেলায় তার ব্যত্যয় হচ্ছে কেন?

অনেক খোঁজখবর নিয়ে পার্টির নেতারা জানলেন ওঁট চেহারার মহকুমাশাসক আসলে প্রবাসী বাঙালি। দিল্লিতেই কেটেছে স্কুল-কলেজ পিরিয়ড। তারপর ফিলাডেলফিয়া না জর্জটাউন কোথায় গিয়েছিলেন রিসার্চ করতে। সবাইকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন শৈশব থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ার সুবাদে বাংলাটা নাকি তাঁর একেবারেই 'আসে না'। তার ওপর কয়েকবছর বিদেশে থাকায় তাঁর উচ্চারণ এখন একেবারে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে। ফলে যা কিছু কথা বলেন সবই ওই ফুচুৎ ফুচুৎ।

ফলে এলাকার দাপুটে নেতারা এস ডি ও-র চেম্বারে গিয়ে যতই নাচুনিকুঁদুনি করুন, তার উত্তরে ওই ফুচুৎ ফুচুৎ ছাড়া আর কিছুই তাঁদের পাওনার ঘরে নেই। তাঁরা ওপরতলায় অভিযোগ করছেন, কিন্তু ওপরতলার লোকেরা বুঝে উঠতে পারছেন না সমস্যাটা আসলে কী! তাঁরা তো এস ডি ও-র কথা ভালোই বুঝতে পারেন!

এস ডি ও-র চেম্বার তখন একেবারে ডেপুটেশনবিহীন। তাঁর ওই ফুচুৎ ফুচুৎ শুনতে কেউ আর আগ্রহী নয়!

মাসকয়েক পরে এস ডি ও একদিন রহস্যটা ভাঙলেন তাঁর নিকটবর্তী সহকর্মীদের কাছে, গোদা বাংলায় বললেন, বুঝলেন, টিট ফর ট্যাট। নেতারা যেমন ক্যাডার-সহযোগে ত্যান্ডাইম্যান্ডাই করে, তার ওষুধ হল আমেরিকান অ্যাকসেন্টের ইংরিজি। সব ব্যাটাকে দিয়েছি টাইট করে!

দানিয়েল পেনাক-এর কিশোর উপন্যাস

নেকড়ের চোখ

মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ **মৈত্রেয়ী নাগ**

অ ন্য জ গ ৎ

১

এইভাবেই বিয়াব্বা, বিয়াম্মা আর তাদের ছেলে আফ্রিকা এসে পৌঁছল এখানে, আমাদের এই অন্য জগতে। আমাদের শহরে ওদের এক আত্মীয় ছিল। আত্মীয়টি খবরের কাগজ দেখে বিয়াব্বাকে কাজ খুঁজতে সাহায্য করেছিল। বিয়াব্বা যে কোনও কাজ করতে তৈরি ছিল, কিন্তু কাগজে বলছিল যে, করার মতো কাজ প্রায় কিছুই নেই।

— চিন্তা কোর না, বিয়াম্মা বলত, একটা না একটা কিছু পাওয়া যাবেই।

আর, একদিন, সত্যিই, আত্মীয়টি পেয়েও গেল।

— এই যে, খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপনে ডট পেন দিয়ে গোল দাগ দিয়ে সে বলেছিল, এইটেই তোমার পক্ষে ঠিক হবে!

বিয়াব্বা তখন শহরের চিড়িয়াখানায় "গ্রিন হাউসের রক্ষণাবেক্ষণ"-এর কাজে বহাল হল।

— "গ্রিন হাউস" ব্যাপারটা ঠিক কী? জানতে চেয়েছিল সে।

— এক ধরনের কাচের খাঁচা, তার মধ্যে আমাদের দেশের গাছগাছড়া বন্ধ করে রাখে, জবাব দিয়েছিল আত্মীয়।

গাছগুলো প্রায় মরে গেছিল, বিয়াব্বা তাদের বাঁচিয়ে তুলল।

আফ্রিকা প্রথম যেদিন চিড়িয়াখানায় গেল, সেদিনটা ওর সারা জীবন মনে থাকবে। ওর কোনও ধারণাই ছিল না ব্যাপারটা ঠিক কী হতে পারে।

বিয়াম্মা বলেছিল, জীবজন্তুদের একটা বাগান।

জীবজন্তুদের ধরে কীভাবে বাগানে পুঁতে দেওয়া যায়, তা আফ্রিকার ভালো মাথায় ঢোকেনি। তাছাড়া, ওর মনও ভালো ছিল না। সবুজ আফ্রিকার সবুজ বাসার জন্য ওর কষ্ট হচ্ছিল। আমাদের শহরের চার দেওয়ালের মধ্যে ওর জেলখানার মতো লাগছিল। আর কী একা! কী একা ...

কিন্তু, যেই না ও চিড়িয়াখানার লোহার গেট পেরিয়েছে, অমনি একটা

চেনা গলা ওকে থামিয়ে দিল:
— এই যে, পুঁচকে! অ্যাদ্দিনে তাহলে আমাকে খুঁজে পেলি? তুই সব পারিস!
কয়েক সেকেন্ড আফ্রিকা তো একেবারে স্পিকটি নট। এ যে বড্ড সুন্দর। নিজের চোখ কানকে ও বিশ্বাস করতে পারছিল না।
— বাসনকোসন!
হ্যাঁ। দাঁড়িয়েছিল উটটা সেখানে, ওর সামনে, নিজের চার পায়ের ওপর, তারের বেড়া ঘেরা একটা চত্বরের ঠিক মধ্যিখানে।
— বাসনকোসন! তুই এখানে কী করছিস?
— দেখতেই পাচ্ছিস, তোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তোয়া আমাকে বেচে দেওয়ার পর থেকে একটি পাও ফেলিনি।
— এক পাও না?
— তোকে যেমন কথা দিয়েছিলাম। সব্বাই আমাকে হাঁটানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই; যখন থেকে আমরা আলাদা হয়েছি, একটা পাও আরেক পায়ের সামনে ফেলিনি।
আফ্রিকার তো হৃৎপিণ্ডের ওঠাপড়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ওর বিস্ময় আর কাটে না।
— কিন্তু তা হলে তুই এই অব্দি এলি কী করে?
বাসনকোসন ওর সেই মনে মনে হাসিটা হাসল:
— একখানা পক্ষাঘাতগ্রস্ত উট নিয়ে একটা খদ্দের কী করবে বল?
আফ্রিকা চমকে ওঠে:
— তোকে মেরে ফেলতে পারত।
— না রে না, এই দেখ, আমার খদ্দের বরং আমাকে ফের বেচে দিল।
— কার কাছে?
— তাতে কী যায় আসে? আরেক খদ্দেরের কাছে ... সে আমাকে আবার বিককিরি করে দিল।
— আর তারপর?
— তারপর একজনের হাত থেকে আরেকজনের হাতে ঘুরতে ঘুরতে আমি শেষ অব্দি চিড়িয়াখানার জোগানদারের হাতে এসে পড়লুম। আর সে তো, একটা অনড় উট, বুঝলি না, একেবারে ঠিক যা খুঁজছিল, আমাকে অনেক দামে কিনেছে।

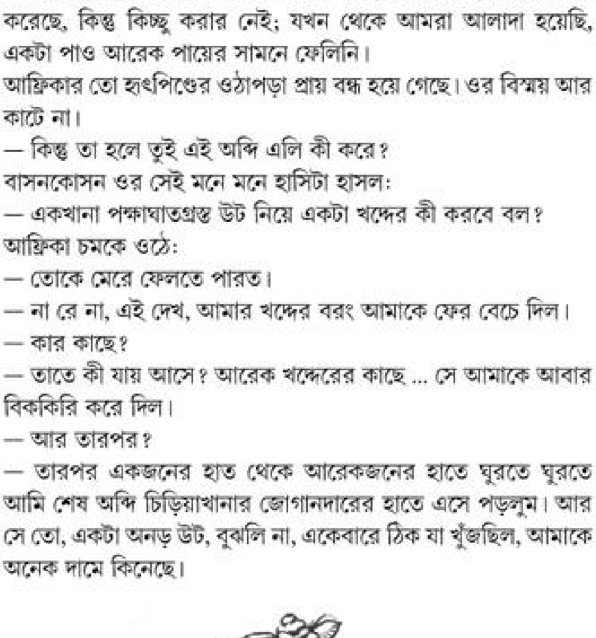

আবার সেই মনে মনে হাসি।
— এখানে আসতে অনেক ঘুরতে হয়েছে আমাকে, নৌকো করে, ট্রেনে করে, ট্রাকে করে, এমনকী ক্রেনে করেও! (ক্রেনে করেই ওরা আমাকে এই খাঁচার মাঝখানটায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।) তোকে না নিয়ে এক পাও না, পুঁচকে, একটা পাও ফেলিনি!

"আমি কেঁদে ফেলব এবারে", আফ্রিকা ভাবে, "এবারে ঠিক কেঁদে ফেলব!"
— তবে এখন আমি পা-টা একটু ছাড়িয়ে নিতে পারব! বলে ওঠে বাসনকোসন। আর বলেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফাতে থাকে, প্রচণ্ড জোরে তারের বেড়া বরাবর ছুটতে থাকে, তারপর ধুলোয় গড়াগড়ি খায়, আর নিজের কুঁজের ওপর ভর দিয়ে, লাট্টুর মতো পাক খেতে থাকে। ঠ্যাংগুলো শূন্যে তোলা, আর হাসির সে কী ধূম!
খাঁচা থেকে খাঁচায় সেই ক্ষ্যাপা হাসি ছড়িয়ে পড়ল, সব জন্তু-জানোয়ার এবং শেষ পর্যন্ত আফ্রিকাও শামিল হল সেই হাসিতে। সবচেয়ে জোরে হাসছিল যে জন্তুটা, সে হেঁকে বলল:
— ও রে! উট, তুই কি নিজেকে আবিসিনিয়ার শ্বেতকপোত ঠাউরেছিস নাকি?
"এই হাসিটা ...", ভাবল আফ্রিকা, "এ হাসি তো আমার চেনা!"
ওর থেকে দশ হাত দূরে, মোটা মোটা লোহার গরাদের পিছন থেকে, ধূসর আফ্রিকার হায়েনা অন্য সবার চেয়ে বেশি জোরে হাসছিল। তারপর, পাশের খাঁচার জন্তুকে উদ্দেশ করে সে বলে উঠল:
— কী রে, "কান্নাকাটি", তুই হাসছিস না যে? উটটাকে চেয়ে দেখ!
— আমার ফুর্তি করার সময় নেই। এই কণ্ঠস্বর চিনতে আফ্রিকার এক মুহূর্ত লাগল না, আমি হলাম রাখাল, আমি ছাগল পাহারা দিই!
গলাটা (আর কী দুঃখী একটা গলা) আবার বলে:
— তাছাড়া, তুই যদি আর একটু মন দিয়ে পাহারা দিতিস, আমরা আজ এখানে থাকতাম না!
— যতটুকু পেরেছি, করেছি তো! প্রতিবাদ করে হায়েনা, তুই কি আমার চেয়ে ভালো রাখাল নাকি?
আফ্রিকা এক দৌড়ে ঝগড়াঝাঁটির জায়গায় পৌঁছে গেছিল, এখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, বড় করে শ্বাস টেনে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল:
— আরে চিতা যে, তোকেই কি ও "কান্নাকাটি" বলে ডাকে? আর দুঃখ করিস না, এখন তো আমি এসে পড়েছি ...
— আরে রাখাল যে! দুঃখ করব কেন, একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এই যা। আমি যে দিনরাত শ্বেতকপোতকে পাহারা দিয়ে চলেছি, সেই যেদিন থেকে জ্যান্ত পশুর শিকারিরা ওদেরকে ধরল, ওকে আর "ওটাকে"।
আফ্রিকা হায়েনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল, ওকে একটু অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিল।
— আমি যতটুকু পেরেছি, করেছি আফ্রিকা, সত্যি বলছি, ওরা আসলে আমাকে মাংসের টোপ দিয়েছিল; তুই তো আমায় চিনিস, লোভ সামলানো কী চাট্টিখানি কথা?
—আর আমি ইচ্ছে করেই ধরা দিয়েছি, বলল চিতা, শ্বেতকপোতকে যাতে ছেড়ে দিতে না হয়। ওকে দেখ, কী সুন্দর, না?
মাথা দিয়ে হাত দশেক দূরের একটা খাঁচার দিকে দেখায় চিতা, সেখানে আবিসিনিয়ার শ্বেতকপোত আফ্রিকার সম্মানে আনন্দে একেবারে লাফালাফি জুড়ে দিয়েছিল।
— এক মুহূর্তের জন্য ওকে চোখের আড়াল করিনি, আবার বলে চিতা, দিনে এবং রাতে! যাকগে, এখন তুই এসে পড়েছিস, এবার আমি বিশ্রাম নিতে পারি ... বলেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সব্বাইকে। অন্য জগতের চিড়িয়াখানায় এসে আফ্রিকা সব্বাইকে খুঁজে

পেল। সাভানার ধূসর গোরিলা আর তার সবুজ বনের তুতো-ভাই (''তা কী করব, ওরা আমার গাছপালা নিয়ে যাচ্ছিল, ভাবলুম আমিও ধরা দিই! কিন্তু এরা কীরকম লোক দেখ, আমার গাছপালাদের রাখল এক খাঁচায়, আর আমাকে আরেক খাঁচায়...''), ধূসর আফ্রিকার বুড়ো সিংহ, নালার কুমির, লাল লেজওলা নীল টিয়ে, আর, চকচকে কাচের অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে, মুঠো পাকিয়ে, সেই ক্রুদ্ধ, কালো, ছোট্ট কাঁকড়াবিছে, অনাবৃষ্টি যার সইছিল না। এমনকী ব্যাপারি তোয়াও! এখন সে আইসক্রিম বেচে। কিন্তু একটুও বদলায়নি; নিজের বুড়ো দাড়িতে আঙুল চালায়, আর সময় কাটায় গালমন্দ করে:

— হুঁঃ! অন্য জগত! এটা নাকি অন্য জগত!

হ্যাঁ, আফ্রিকা এই চিড়িয়াখানার বাসিন্দাদের সক্কলকে চিনত, কেবল একজনকে ছাড়া।

২

— সব্বাইকে, কেবল আমাকে ছাড়া। তাই তো?

এখন বসন্তকাল। নেকড়ে আর ছেলেটা এখনও মুখোমুখি।

— হ্যাঁ, নীলনেকড়ে। আমার তোকে দেখে মনে হত, কী একা, কী দুঃখী ...

''অদ্ভুত ছেলে'', ভাবে নেকড়ে, ''অদ্ভুত মানুষ! কালোশিখা হলে কী বলত কে জানে?''

কিন্তু নেকড়ে এবার ছেলেটার চোখে যা দেখল, তা অন্য সব কিছুর চাইতেও বেশি বিস্ময়কর ...

সন্ধেবেলা, বিয়াব্বা আর বিয়াম্মা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে। আফ্রিকা ওদের সামনে একটা টুলের ওপর বসে আছে। সিলিং থেকে একটা হলদে বাল্ব ঝুলছে। বিয়াম্মা ছেলেটার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে, মুখটা দুহাতে ধরা। ছেলেটার একটাই চোখ। অন্যটা মাস কয়েক ধরে বন্ধ। সকালে, ঘুম থেকে উঠে আফ্রিকা একটাই চোখ খোলে।

বিয়াম্মা দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ে।

— নাঃ, বিড়বিড় করে সে, মনে হয় না সারাতে পারব বলে, এ যাত্রা আর হল না ...

বিয়াব্বা উসখুস করে, নিজের না-কামানো চিবুক চুলকোয়।

— ইয়ে, মানে, ডাক্তার দেখালে হত না?

দেখানো হল। ডাক্তারবাবু ফোঁটা ওষুধ লিখে দিলেন। আফ্রিকার চোখের পাতা তাতে চটচটে হয়ে থাকত। দেখে মনে হত, ও সকাল সন্ধে কেবল চোখের জল ফেলছে। কিন্তু চোখ আর খুলছিল না। ওরা আবার ডাক্তারবাবুর বাড়ি গেল। ইনি ছিলেন একজন সৎ ডাক্তার:

— কিছুই বুঝতে পারছি না, বললেন তিনি।

— আমিও না, বলল বিয়াম্মা।

''আমি খুব ভালোই বুঝতে পারছি'', ভাবল নীলনেকড়ে।

রান্নাঘরে ছেলেটার ওপর ঝুঁকে পড়া বিয়াম্মা, আর বিয়াব্বা, তার রাতের ঘুম চলে গেছে, নীলনেকড়ের দুঃখ হয়।

আর এই ছেলেটা, সে এক চোখে ওর দিকে তাকিয়েই আছে!

নীলনেকড়ে কয়েকবার মাথা নাড়ে, তারপর জিজ্ঞেস করেই বসে:

— কী করে আঁচ করলি?

ছেলেটা চুপ। শুধু ওর ঠোঁটের ওপর একটা হালকা হাসি ফুটে ওঠে।

— সে যাই হোক, সে যাই হোক, আমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে এটাকে, এই চোখটাকে বন্ধই রাখব! ...

আসল কথা হল, বন্ধ চোখের পাতার তলায় নেকড়ের চোখটা অনেক দিন আগেই সেরে গিয়েছিল। কিন্তু এই চিড়িয়াখানা, এইসব দুঃখী জীবজন্তু, এইসব দর্শক ...

— ''ধুর'', ভেবেছিল নেকড়ে, ''এই দেখার জন্য একটা চোখই ঢের।''

— হ্যাঁ, নীলনেকড়ে, কিন্তু এখন আমি আছি!

তা বটে। এখন এই ছেলেটা রয়েছে। আফ্রিকার জন্তুদের ও বলেছে সুমেরু প্রদেশের গল্প।

নীলনেকড়েকে শুনিয়েছে তিন আফ্রিকার কথা। আর সকলেই স্বপ্ন দেখতে লেগে গেছে, এমনকী জেগে জেগেও!

নীলনেকড়ে এই প্রথম ছেলেটার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখে, আর দেখে, পরিষ্কার দেখে খড়কুটো আর হায়েনা ছুটোছুটি করছে, চিড়িয়াখানার মাঝখানে, সাহারার সোনালি ধুলোর মধ্যে। ওদের সঙ্গে তিতিরও যোগ দেয়, আর পাটকিলেরাও, ওরা সবাই লাট্টু-উটকে ঘিরে নাচতে থাকে। বিয়াব্বা গ্রিন হাউসের দরজা খুলে দেয়, সবুজ আফ্রিকার সুন্দর গাছগাছড়ায় পথ ছেয়ে ফেলে। সবচেয়ে ওপরের ডালে পাহারাদার-ধূসরদাদা আর বনের গোরিলা পাশাপাশি বসা।

আর দর্শকেরা, যারা কিছুই খেয়াল করছে না ...

আর চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ, টহল দিয়েই চলেছে ...

আর তোয়া ব্যাপারি, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, ক্রুদ্ধ কাঁকড়াবিছের তাড়া খেয়ে ...

আর বাচ্চারা, যারা জানতে চাইছে, হায়েনাটা এত জোরে হাসছে কেন ...

আর কালোশিখা, সে এক্ষুনি ছেলেটার পাশে এসে বসেছে, নীলনেকড়ের মুখোমুখি।

আর এই সবকিছুর ওপরে তুষার পড়ছে (এই ভরা বসন্তে!), আলাস্কার মনোরম নীরব তুষার, যা সব ঢেকে দেয়, যা গোপন কথা গোপনেই রাখে ...

''দেখাই যাচ্ছে'', ভাবে নীলনেকড়ে, ''দেখাই যাচ্ছে যে, এ সব বড়ই লোভনীয়, এ তো দুচোখ মেলেই দেখতে হবে।''

''টক''! খুলে যায় নেকড়ের চোখের পাতাটা।

''টক''! খোলে ছেলেটার চোখের পাতাটাও।

—কিছুই বুঝলাম না, বলবেন জীবজন্তুদের ডাক্তার।

—আমিও না, বলবেন ডাক্তারবাবু।

ছবি: কুরচি দাশগুপ্ত

শেষ

ক য়ে ক টি চি ঠি

সাহিত্যে অন্ধকার বাস্তবতা?

'কালের কষ্টিপাথর'-এর প্রথম সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'র মাথায় রবীন্দ্রনাথের যে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন— 'আমাদের যুগ ক্রমেই ইতর হইয়া আসিতেছে' কয়েক দশক ধরেই তা ক্রমশ আরও বেশি সত্যি হয়ে উঠছে। এই ক'মাসে যেন ইতরতম হয়ে উঠল। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বামপন্থী বিধায়কের সদম্ভ প্রশ্ন নিক্ষেপ 'ধর্ষিতার ফি তো কুড়ি হাজার। আপনার ফি কত?' কিংবা পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ-কাণ্ড প্রসঙ্গে তদন্তে জোর আশ্বাসের বদলে মুখ্যমন্ত্রীর নিঃসংশয় ঘোষণা— 'ওটা সাজানো ঘটনা', বা পরবর্তীতে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ, সমাজ সচেতন নাট্যকর্মী তথা বিশাল মাপের কবি-সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত শিশু-কিশোর আকাদেমির চেয়ারপার্সন অর্পিতা ঘোষের ব্যাখ্যা-ভাষ্যে 'সাজানো ঘটনা' ঘোষণার নির্দোষিতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও প্রায় একই সময়ে, তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারের দাবি— 'পার্ক স্ট্রিটে আদৌ ধর্ষণ হয়নি। ওটা আসলে ওই মহিলা ও তাঁর খদ্দেরের ভুল বোঝাবুঝি' শুনতে শুনতে মনে হয় আমাদের যুগ সত্যিই ক্রমেই ইতর থেকে ইতরতর হয়ে আসছে।

সম্পাদকীয় দ্বিতীয় শিরোউদ্ধৃতি কবি জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ'-ও ক্রমশই গাঢ় সত্যে পরিণত হচ্ছে। এই অন্ধকার-বাস্তবতা হয়তো কখনও সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে, আমার সভয় প্রশ্ন— আমাদের সাহিত্য এর প্রতিলিপি হয়ে উঠবে না তো?

দীপককুমার বসু
বর্ধমান

অপেক্ষাও অনুভবের

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চলে যাওয়া যেন বাংলা সাহিত্যাকাশ থেকে এক ইন্দ্রপতন। সে শোক পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি এখনও। তারমধ্যেই হাতে এল ডিসেম্বরের 'কালের কষ্টিপাথর'। আর তাতে সুনীলকে লেখা চিঠিগুলি পড়ে যেন নতুন করে খুঁজে পেলাম আমাদের প্রিয় সাহিত্যিককে। মনে হল, তিনি এখনও আমাদের মাঝে দৃশ্যমানভাবে জাগরূক। সম্পাদক মহাশয়কে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আরও একটি কারণে। এই ক্ষয়িষ্ণু সময়ে এমন একটি আদ্যন্ত অনাবিল ও সর্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্যপত্রিকা আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। আজ প্রতিদিন চারদিকে অবক্ষয়ের যে চূড়ান্ত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, প্রতিদিন যে কঠিন পীড়নে পীড়িত হচ্ছি, তার থেকে ক্ষণিকের নির্মল মুক্তি দিতে এমন এক মাধ্যমের যে আমাদের বড়ই প্রয়োজন। শুধু তাই নয় আমার ব্যক্তিগত মত, এমন সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলই অবক্ষয়ের অধোগতি থেকে আমাদের সমাজকে রক্ষা করতে পারে। কালের কষ্টিপাথরে মণিমুক্তোর ছড়াছড়ি। সমরেশ মজুমদারের 'গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি', জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি', শুভাপ্রসন্নের 'আমার ছবিজীবন' এবং সম্পাদকের ধারাবাহিক উপন্যাস 'বিষাদগাথা' এককথায় অনবদ্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাজের বাংলা' এবং দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হেঁয়ালির ছন্দ' মননের পরিপুষ্টিসাধন করে। বিভাস চক্রবর্তীর লেখাটিতে তাঁর প্রজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট। মাননীয় সম্পাদককে আমরা আজন্ম ভ্রামণিক ও বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের এক অনন্য পথিকৃৎ বলেই জানি। তাঁর ভ্রমণকথায় আরও একবার তাঁর চরৈবেতির পরিচয় পেয়ে বেশ ভালো লাগল।

বাংলা কবিতাচর্চার জগতে একদা আলোড়ন তুলেছিল কবিতা-পরিচয়। তার পাতা থেকে যে অংশগুলি 'কালের কষ্টিপাথর'-এর পাতায় তুলে আনা হচ্ছে তা আমাদের কবিতার বোধকে পুনরায় ঋদ্ধ করবে। শুধু তাই নয় নবীন কবিদের কাছে এ এক অবশ্যপাঠ্য।

এই সংখ্যা থেকেই 'কালের কষ্টিপাথর' মাসিক পত্রিকা হচ্ছে। তাতে অভাববোধ নেই। কারণ এমন এক সুন্দরের জন্য অপেক্ষা করে থাকাটাও অনুভবের।

অশোক কুমার ভট্টাচার্য
গোবরডাঙা, উত্তর ২৪ পরগনা

অনবদ্য পত্রিকা, প্রাসঙ্গিক সাহিত্য

ইদানীংকালে সাহিত্যপত্রিকা অনেকই বেরোয়, কিন্তু সেটা কতখানি সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ওঠে তা বিতর্কের বিষয়। সেইদিক থেকেই 'কালের কষ্টিপাথর'কে পথিকৃৎ বলা চলে। নিটোল সাহিত্যরস-সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি আজ খুবই প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন প্রসঙ্গ, বিভিন্ন আঙ্গিক, বিভিন্ন অনুষঙ্গ পত্রিকাটিকে অনবদ্য ও অবশ্যপাঠ্য হিসেবে গড়ে তুলছে। ধারাবাহিকগুলির মধ্যে 'শহিদ জননী' জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি'র পৃথক প্রশংসা প্রাপ্য। তরুণ পাঠকের সঙ্গে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য পত্রিকা ও তাঁর সম্পাদককে অজস্র অসংখ্য ধন্যবাদ। তার ওপর আমাদের আদি নিবাস যেহেতু ওপার বাংলা তাই আলাদা আবেগও এখানে কাজ করে। সংখ্যায় সংখ্যায় 'মহাজনসঙ্গ' ও 'বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সঙ্গ'— অনেক না-জানা, না-শোনা কথা জেনে ভালো লাগে। সেদিক থেকে বিভাস চক্রবর্তীর সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা 'হ্যামলেট' প্রসঙ্গে তাঁর নিজের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। বিদেশি নাটকের অনুবাদ 'কালের কষ্টিপাথর'-এ জায়গা পেলে ভালো লাগবে। অবশেষে ছোট্ট একটি অনুযোগ— পৃষ্ঠা সংখ্যাগুলি বাংলা হরফে হলে আরও ভালো লাগত।

আবির মুখোপাধ্যায়
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

ক্ষণকথা

'কালের কষ্টিপাথর' নিয়মিত পড়ছি। এমন বিশুদ্ধ সাহিত্যপত্রিকা এই সময়ের পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়টি নেই। সব লেখাই সুন্দর। সব লেখাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আকর্ষিত করে রেখে পরবর্তী সংখ্যাটি হাতে পাওয়ার আগ্রহকে সজীব করে রাখে। তবে তার মধ্যেও বিশেষভাবে ভালো লাগছে 'ক্ষণের বচন' শিরোনামে অণু-কবিতাগুচ্ছ। আমরা খনার বচনের কথা শুনেছি, এও যেন আমাদের অনেকের সমাজ ও তার মানুষজনের জন্য তেমনই স্পষ্ট ও অমোঘ মন্তব্য। হৃদয়ে গেঁথে যায়। বারবার পড়েও মনে হয় কোনও অণু-কবিতার কোনও আলগা শব্দে বুঝি কোনও গভীরতর ব্যঞ্জনা রয়ে গেল, ধরা গেল না। তাই আবার পড়তে হয়। কেবল একটাই অস্বস্তি— সবটা পড়ার পরে কবির নামের কাছে এসে হোঁচট খেয়ে থমকানো। যিনি লেখেন, তাঁর ছদ্মনামের আড়ালে থাকাটা এই অসামান্য কবিতাগুচ্ছের প্রতি তো বটেই, মুগ্ধ পাঠকের প্রতিও অবিচার। সনির্বন্ধ অনুরোধ, তিনি এবার আত্মপ্রকাশ করুন।

অরুণ সেনগুপ্ত
বাঁশদ্রোণী, কলকাতা

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

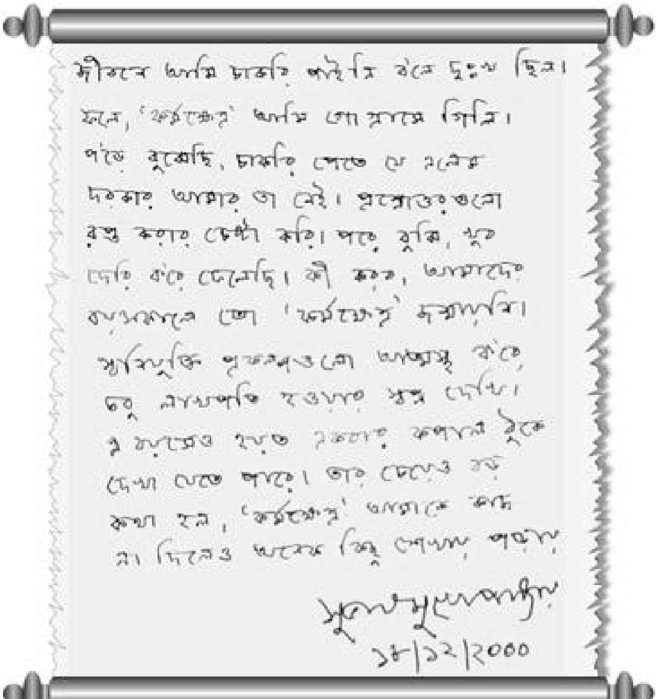

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল।
ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি।
প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম
দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো
রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব
দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের
বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি।
স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে,
তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি।
এ বয়সেও হয়ত একবার কপাল ঠুকে
দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড়
কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ
না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
১৮/১২/২০০০

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

বই-টই

নতুন বই

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের 'নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা'

তিরিশ পেরোলেই দেখা যায় আমাদের চারপাশ থেকে বেশ কিছু জিনিস ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যেতে থাকে। ধাপে ধাপে যত বয়স বাড়ে তালিকাটি দীর্ঘ হয়। অবসরে, আনন্দে, আপশোসে আমরা বলে উঠি, 'আমাদের ছোটবেলায় এমনটা হতো, এখন আর হয় না।' সে সমস্ত একরাশ হারিয়ে যাওয়া জিনিসের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা' বইটিতে।

বইটিকে আমরা Bells letter, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্য রচনা যা খুশি বলে চিহ্নিত করতে পারি। প্রতিটি লেখা সাজানো আছে ভালোলাগা কিছু টুকরো স্মৃতিতে। যার অনেককিছুই মিলিয়ে নিতে পারবেন তিরিশ পেরোনো অনেকেই নিজের স্মৃতির সঙ্গে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, সিনেমার ভ্যাম্প, এল নাইন বাস, পেটো, খৈরি, অ্যান্টেনা, ক্রস কানেকশান, প্রেমপত্র, গুপ্তধন, কর্কেট বল, টিনের সুটকেস, সুমন চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চাটুজ্যে, শৈলেন ঘোষ— এরকম চুয়াল্লিশটি হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন অনিন্দ্য।

অনেকেরই মনে হতে পারে, অমুকের কথা তো লিখল না, তমুকটার কথা বাদ রয়ে গেল। সে কথা ভূমিকাতেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন অনিন্দ্য— 'এ বইতে সেইসব বিষয় নিয়েই লিখেছি যার সঙ্গে আমি ও একমাত্র আমার কোনও যোগ আছে।'

অনিন্দ্যর সাবলীল গদ্যও মনোমুগ্ধকর। তাছাড়া, কখনও কাগজ কেটে, কখনও লাইন ড্রইং—কৃষ্ণেন্দু চাকির ইলাস্ট্রেশন দেখার মতো।

নীলা বন্দ্যোপাধ্যায়

'সমর সেনের কবিতা'

বঙ্গীয় প্রকাশনা জগতে ডিকে তথা দিলীপকুমার গুপ্তর অবদান প্রায় প্রবাদপ্রতিম। বাংলা কবিতাও সম্ভবত সেই প্রথম কোনও প্রকাশকের উদার দাক্ষিণ্য ও সুরুচির স্পর্শ পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশ থেকে বুদ্ধদেব বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী থেকে কৃত্তিবাস গোষ্ঠী— সকলকেই ডিকে সসম্মানে তাঁর লেখক-তালিকায় ঠাঁই দিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, ডিকের আহ্বানেই সেসব বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে তৎকালীন স্বনামখ্যাত চিত্রকররা।

নানা কারণে অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দিলীপকুমারের সিগনেট প্রেস-এর কর্মকাণ্ড। সম্প্রতি ফের ঝাঁপ উঠেছে। পুরনো বইগুলির ধাঁচ অবিকৃত রেখে নতুন সংস্করণ বের হচ্ছে। নতুন বইও প্রকাশিত হচ্ছে।

সদ্য পড়লাম ডিকে-র সময়কার সিগনেট প্রেস-এর একটি অনবদ্য নিবেদন 'সমর সেনের কবিতা'। পাকাপাকিভাবে সিরিয়াস সাংবাদিকতায় মগ্ন হয়ে পড়ার আগে বাংলা কবিতায় সমর সেনের যে স্বতন্ত্র স্বর, তা ধরা আছে এ বইয়ে। বইটি দোকানের শেলফে থাকাকালেই আকর্ষণ করে সেটির প্রচ্ছদ। উজ্জ্বল ব্রাউন পেপারের ওপর লাল আখরে প্রাচীন পুঁথির ক্যালিগ্রাফিতে তিন ধাপে শুধু লেখা 'সমর সেনের কবিতা'। সত্যজিৎ রায়ের মনন আর তুলির সপাট তান। পুরনো 'কবিতা পরিচয়'-এ ভার্টিকাল আধ পাতা জোড়া তিন ধাপের ওই সাদা-কালো বিজ্ঞাপনও হয়তো অনেকের মনে আছে।

বইটিতে আছে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত সময়কালে লেখা বাহাত্তরটি কবিতা। অনেকদিন পর আবার যেগুলির পাঠ বয়ে আনল চেনা ছকের বাইরে অন্যরকম গন্ধ আর অনুভূতি। সমর সেনের কবিতা সমকালীন নাগরিক জীবনের বার্তাবহ, স্পষ্ট, আড়ালহীন, খানিকটা আপাত ভাবাবেগবর্জিত এবং নৈর্ব্যক্তিক। সমর সেন নিজেই বেছে দিয়েছিলেন এই বইয়ের কবিতাগুলি।

কবিতাগুলির আবেদন এখনও ফুরোয়নি। আশ্চর্যজনকভাবে ফুরোয়নি প্রাসঙ্গিকতাও।

অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থনায় 'আপনাদের সেবায়'

'আপনাদের সেবায়' ওস্তাদ আলি আকবর খানের আত্মজীবনী। শিল্পীর শেষ তিন দশকের ছাত্র অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় অসীম যত্নে গ্রন্থনা করেছেন বইটি। বইটির প্রথমার্ধে অনিন্দ্য তাঁর গুরুর স্মৃতিচারণ করেছেন ভারি সরস ভঙ্গিতে। দ্বিতীয়ার্ধে ওস্তাদ আলি আকবরের কথা রয়েছে তাঁরই জবানিতে। শেষার্ধে রয়েছে শিল্পীর যাবতীয় অ্যালবাম, সুরসৃষ্টি, রাগনির্মাণের সম্পূর্ণ তালিকা এবং বেশ কিছু বিরল আলোকচিত্র।

তাঁর অতিবিখ্যাত সহপাঠীর মতো আলি আকবর তত বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। যদিও রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর দুজনেরই গাণ্ডা বাঁধা এবং শেখা একজনেরই কাছে, তিনি মাইহার ঘরানার বাবা আলাউদ্দিন খান। এই বইয়ে আলি আকবরের নিজের কথা যত আছে, বাবা আলাউদ্দিনের কথাও তার চেয়ে কম নেই। সহজ সরল মানসিক গঠনের আলি আকবর তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত মনে করতেন, বাবা আলাউদ্দিনই তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করেন। বাবা আলাউদ্দিনের মৃত্যুর অনেক বছর পরেও আলি আকবর বলতেন, তিনি যখন রেওয়াজে বসেন, তখন বাবাও তাঁর সামনে এসে বসেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরে দেন, শুধরেও দেন। অথচ বাবার কড়া শাসনের জন্যই কিশোর আলি আকবর মাইহারের বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন, সে গল্পও রয়েছে এখানে।

পাশাপাশি এই বইয়ে রবিশঙ্কর এবং বোন অন্নপূর্ণা তো আছেনই, প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, বাবা আলাউদ্দিনের অন্য শিষ্যদের কথাও, যেমন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, তিমিরবরণ।

বইটির পরিবেশনাও খুব উঁচু মানের। ছবিগুলি আর্টপেপারে ছাপা। মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন আরেক বিখ্যাত বাঙালি সরোদিয়া বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।

কুশীলব উপাধ্যায়

একটি কবিতা-পংক্তি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার একটা পংক্তি— 'ভালোবাসা পেলে সব লন্ডভন্ড করে চলে যাবো' বহুকাল ধরে বহুবার পড়েছি, প্রতিবারই কবিতার শক্তিতে চমকে উঠেছি। এবার ভিয়েতনামের উপসাগরে এক সূর্যাস্তক্ষণে কবিতার ওই বাক্যটি মনে পড়তেই হঠাৎ মনে হল, কথাটা ভালোবাসা পেলে, না না-পেলে? ভালোবাসা পেলে আর সব লণ্ডভণ্ড করতে যাবেন কেন? অথবা, হয়তো, ওই পংক্তিতে চাপা দ্যুতির মতো এই স্বরই শোনা যাচ্ছে যে, ভালোবাসা পেলে এতাবৎকালের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সফল সাজানো সংসারও লণ্ডভণ্ড করে এক মহার্ঘ সম্পদের দিকে ছুটে যাব! শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কিছুটা অসফল বৈষয়িক জীবনে এই অর্থের খুব একটা সমর্থন পাওয়া যায় কি? তবে, অব্যর্থ ওই পংক্তিতে 'পেলে'র আগে 'না' তো ছন্দসমর্থনই পাবে না। তাছাড়া মন কেন 'ভালোবাসা পেলে সব লন্ডভন্ড করে চলে যাবো'তেই মাতাল হয়! এ-বিষয়ে কেউ আলোকপাত করলে কৃতজ্ঞ বোধ করব।

জনৈক কবিতাপাঠক

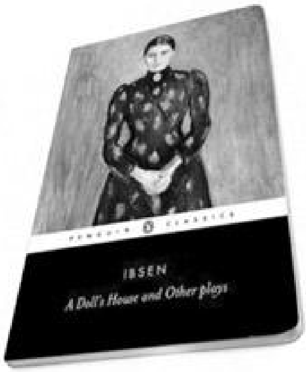

ইবসেনের ‘এ ডলস্ হাউস’

নরওয়ের নাট্যকার ইবসেনের সমকালে যথেষ্ট বিতর্কিত নাটক ‘এ ডলস্ হাউস’। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে রয়্যাল থিয়েটারে ১৮৭৯ সালে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, এই নাটক নারী মুক্তির ভাবনাকে উসকে দিয়ে উনিশ শতকের বিবাহ প্রতিষ্ঠানের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছে।

ইবসেন স্বয়ং এই তত্ত্বকে খারিজ করে বলেছিলেন, তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে এই নাটকে দেওয়া বার্তা তার সমকালীনতাকে পেরিয়ে চিরন্তন হয়ে গেল। পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত এবং অভিনীত হয়েছে ‘এ ডলস্ হাউস’। ১৯৫৮-এ নাট্যকার ও পরিচালক শম্ভু মিত্র এই নাটকটির ছায়ায় মঞ্চে নিয়ে আসেন ‘পুতুলখেলা’ যা প্রবল দর্শক-চাহিদায় কলকাতায় অভিনীত হয়েছে একাদিক্রমে ১৯৭৮ সাল অবধি। ২০০১ সালে ইউনেস্কো ‘এ ডলস্ হাউস’-এর ইবসেন-স্বাক্ষরিত পাণ্ডুলিপিটিকে তার ঐতিহাসিক মূল্যের স্বীকৃতি দিয়ে ‘মেমোরি অব দি ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে’ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বড়দিনের প্রাক-সন্ধ্যায় হেলমার পরিবারের প্রশস্ত সাজানো-গোছানো লিভিংরুমে ফিরে এল নোরা হেলমার । নোরার স্বামী টোরভাল্ড সদ্য পদোন্নতি পেয়ে এখন ব্যাঙ্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

স্বামী-স্ত্রীর সাংসারিক কথাবার্তার মধ্যেই একজন অতিথি আসেন—ক্রিস্টিন লিন্ডে, নোরার স্কুলের বান্ধবী। ভদ্রমহিলা বিধবা, নিঃসন্তান। স্বামী কোনও সঞ্চয় রেখে যাননি। নোরা মন খুলে কথা বলতে থাকে। বলে, বিয়ের পর প্রথম কয়েকবছর কী দারিদ্র্যে

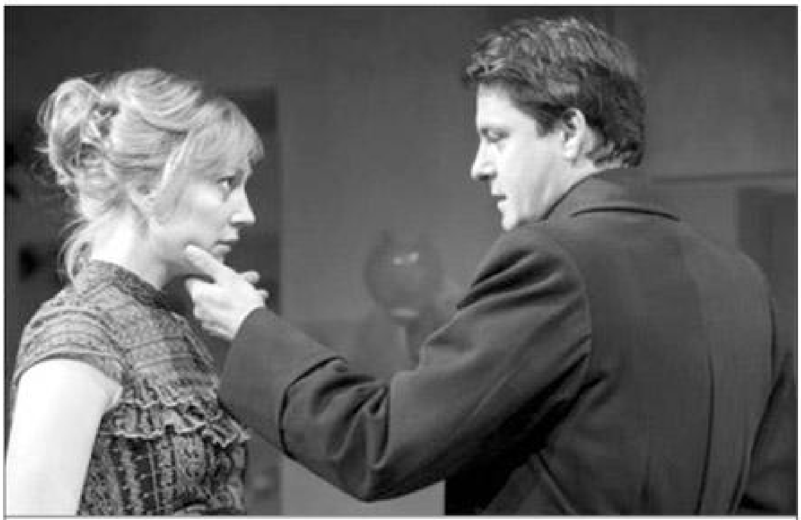

লন্ডনে ‘এ ডলস্ হাউস’-এর সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা। নোরার ভূমিকায় হলিউডের অভিনেত্রী হ্যাটি মোরাহান, টোরভাল্ডের ভূমিকাভিনেতা ডোমিনিক রোয়ান

কেটেছিল তাদেরও। অসুস্থ টোরভাল্ডকে ইতালিতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার দরকার ছিল। শেষে নিলস ক্রগস্টাড নামে এক উকিলের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ধার করতে হয়েছিল নোরাকে। সেও সোজা পথে নয়, বন্ডে নোরার বাবার সই জাল করে। যা এক কথায় অপরাধ। নোরা একথা কাউকে বলতে পারেনি সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে। এমনকী টোরভাল্ডকেও নয়। গোপনে সংসার খরচের টাকা বাঁচিয়ে সেই ধার সে শুধে চলেছে আজও।

সেই ক্রগস্টাড এখন ব্যাঙ্কে টোরভাল্ডের অধস্তন কর্মী। সে হঠাৎই ওই বাড়িতে এসে হাজির হয়। নোরাকে বলে, টোরভাল্ড তাকে বরখাস্ত করতে চায় এবং একমাত্র নোরাই এখন পারে স্বামীর ওপর প্রভাব খাটিয়ে তার চাকরিটা বাঁচাতে। নোরা অস্বীকৃত হওয়া মাত্র ক্ষিপ্ত ক্রগস্টাড তাকে নোরার পুরনো অপরাধ ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দেয়।

অগত্যা নোরা বারংবার টোরভাল্ডকে অনুরোধ করে ক্রগস্টাডকে চাকরিতে বহাল করার জন্য। টোরভাল্ড নারাজ। সে বরং ক্রিস্টিনকে নিয়োগে আগ্রহী। ফলে, নোরা ক্রগস্টাডের কাছে তার অসহায়তা প্রকাশ করলে সে হেলমারদের বন্ধ লেটার বক্সে ফেলে যায় একটি কালো চিঠি।

এদিকে জানা যায় ক্রিস্টিনের পুরনো প্রেমিক এই ক্রগস্টাড। মা ও দুই ভাইয়ের বৃহৎ পরিবারকে প্রতিপালন করতে পারবে বলে এক ধনী ব্যক্তিকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল ক্রিস্টিন। ক্রিস্টিনই নোরার ত্রাতা হয়ে দাঁড়ায়। আর যতক্ষণ না ক্রিস্টিন ও ক্রগস্টাডের দেখা হচ্ছে ততক্ষণ ক্রিস্টিনেরই পরামর্শে নোরা টোরভাল্ডকে চিঠির বাক্স খোলা থেকে বিরত রাখে, পরের দিনের পার্টিতে কীভাবে নাচবে তার মহড়া দেখিয়ে।

ক্রিস্টিন আবার ক্রগস্টাডের কাছে ফিরে আসতে চাওয়ায় উৎফুল্ল ক্রগস্টাড চিঠিটি যে করে হোক ফেরত আনতে চায়। কিন্তু এইবার ক্রিস্টিনই তাকে বাধা দেয়। বলে, সত্যি কথাটা হেলমার দম্পতির উভয়ের কাছেই পরিষ্কার হওয়া দরকার। তাতে দুজনের মনই নির্ভার হবে।

কিন্তু সব কথা জানার পর চরম হতাশায় ফেটে পড়ে টোরভাল্ড, বলে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে নোরা। সে মুহূর্তে সে ভুলে যায় তাকেই সুস্থ করে তোলার জন্য উপায়ান্তর না দেখে অবৈধ রাস্তা নিতে বাধ্য হয়েছিল নোরা।

নোরা বলে, বিয়ের আট বছর পরেও তারা একে অপরকে বুঝতে পারে না। সে যেন একটা পুতুল, যাকে নিয়ে টোরভাল্ড খেলা করেছে, ভালোবেসেছে। নোরা নিজেকে এবং পারিপার্শ্বিককে সফল ও অর্থবহ করে তোলার জন্য টোরভাল্ডকে ছেড়ে যায়।

প্রথম সংখ্যা থেকে

খোলা খাতা

'কালের কষ্টিপাথর'-এর প্রথম সংখ্যাটি নানা বাধায় সকলের কাছে পৌঁছতে পারেনি। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে এই বিভাগটির বিশদ উল্লেখ দেখে অনেক দিন ধরে অনেক পাঠক সেটি পড়তে চেয়েছেন। তাঁদের অনুরোধে ওই সংখ্যার 'খোলা খাতা' ও 'বই ঠেক' এই সংখ্যায় হুবহু ছাপা হল।

এখানে যারা কথাবার্তা বলেছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই লেখালেখির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কথাবার্তা প্রধানত বই নিয়েই, তবে ভাষার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সামাজিক বিষয়ও উঠে আসে। আজকে পাঠকদের জন্য সেরকমই একটি আলোচনা তুলে দিলাম। একটি আলাপচারিতার সূত্র ধরে শমীক ঘোষ বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির মনোভাব সংক্রান্ত এই বিষয়ে আলাপচারিতা শুরু করেছিলেন। নিজে মূলত গদ্য লেখেন। কর্মসূত্রে গুজরাট হয়ে বর্তমানে মহারাষ্ট্রে। অন্য যারা এই আলাপচারিতায় মন্তব্য করার মাধ্যমে অংশ নিয়েছেন, তারা প্রায় সকলেই কর্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বাইরেই থাকেন।

▶ শমীক ঘোষ

"বাংলা ভাষাকে বলছে আঞ্চলিক,
হিন্দি রাষ্ট্র মতবাদ গড়ে তুলে,
দরকার হলে আমি খুব প্রাদেশিক
রাষ্ট্র মানি না নিজের ভাষাকে ভুলে।
প্রতিটি ভাষাই জাতীয় ভাষার দাবি,
কেউ কারও চেয়ে কম নয় বেশি নয়,
তবুও আমার স্বপ্নলোকের চাবি,
বাংলায় পাব পৃথিবীর পরিচয়।"

—কবীর সুমন

নিজেদের ভাষাকে নিজেদের সাহিত্যকে আমরাই যদি আঞ্চলিক বলি তাহলে আর আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সেই সব লেখা কেন পড়বে? কী দরকার? গুজরাতে দেখেছিলাম পুলিশ ডায়েরি লিখছে গুজরাতিতে, ভোদাফোনের কানেকশানের ফর্ম গুজরাতি, বাড়ির দলিল গুজরাতি এমনকি বাসের নম্বর গুজরাতি হরফে। গুজরাত বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগে ভারতবর্ষের সব থেকে এগিয়ে থাকা একটা রাজ্য। তারা যদি বিশ্বকে আহ্বান জানানোর পাশাপাশি নিজের ভাষাকে আঞ্চলিক ভেবে হীনম্মন্যতায় না ভোগে, তাহলে আমাদের ভারতীয় বাঙালিদের এত হীনম্মন্যতা কেন?

▶ উদয়ন ঘোষ (কবি)

ঔপনিবেশিকতার অজুহাত আর আমাদের মেরুদণ্ডহীনতা, হীনম্মন্যতা শুধু গুজরাত কেন, মুম্বইয়ে সব সরকারি কাজ মারাঠি ভাষায় (বাসের নম্বরও)। তামিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি? যে-বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সেখানে হয়, আর কোন আঞ্চলিক ভাষা শুনে চমকে যাই, "মা, জল খাবো।" কাল দাদাগিরিতে দেখলাম, তিন বছরের একটি বাচ্চা বলছে "অ্যাস"। মিঠুন বললেন, 'বাংলায় বলো'। মেয়েটি প্রচুর চিন্তা করে বলল, 'ডঙ্কি'। শেষে মিঠুন নিজেই বাংলাটা বলে দেওয়ায় বাচ্চাটি বলল, 'মা এটা শেখায়নি'।

▶ দোলনচাঁপা চক্রবর্তী (কবি, অনুবাদক)

গুজরাতিরা ভারি অবলীলায় বলতে পারে, "গুজরাতে থাকতে হলে তো গুজরাতি ভাষা জানতেই হবে, নইলে বেশি দিন থাকতে পারবে না।" মহারাষ্ট্রে মারাঠি জেনে ও না-জেনে মারাঠি মানুষের সঙ্গে মেশার মধ্যে অনেকটা প্রভেদ তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু আমরা, বাঙালিরা অবাঙালিদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের সুবিধার জন্য হিন্দি বলি।

কোনও ভাষার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোনও বিরোধিতা বা অপছন্দের ভাব নেই, আমি বিভিন্ন ভাষা জানতে পছন্দ করি। কিন্তু বাঙালি হিসেবে বাংলাকে অন্য সব ভাষার ওপরে স্থান দেওয়াটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বলে মনে করি। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সুনির্দিষ্ট ভাবে বজায় রাখার মাধ্যমেই অন্যের সঙ্গে মেলবন্ধন সম্ভব। বিগত বহু বছর, বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের সঙ্গে মেশার অভিজ্ঞতা আজ আমাকে এভাবে ভাবায়।

▶ শমীক ঘোষ

উদয়ন, অথচ আমরা মাতৃভাষার জন্য দু'বার অন্তত রক্ত দিয়েছি। অবশ্য আমরা মানে এখানে আমি জাতি হিসেবে বাঙালিদের কথা বলছি, কারণ পশ্চিমবঙ্গে আমরা বাঙালিরা কখনও ভাষার জন্য রক্ত ঝরাইনি।

দোলনচাঁপা, আসলে গুজরাতিরা তো ব্যবসাদার। ওরা ব্যবসার জন্য ভাষা শেখে, তা ইংরিজি হলে ইংরিজি, বাংলা হলে বাংলা, চায়না হলে মান্দারিন। আর বাড়িতে বলে মাতৃভাষায়। আমরা তো আসলে কেরানি, তাই প্রভুদের খুশি করতে তাদের ভাষায় কথা কইতে চাই। তা সে যতই ভুল হিন্দি হোক না কেন।

▶ প্রার্থপ্রতিম মণ্ডল

আসুন, আমরা সবাই আমাদের শিশুদের মনে বাংলা সম্পর্কে গর্ববোধ গড়ে তুলি।

▶ কণিষ্ক ভট্টাচার্য

অন্তত এই 'খোলা খাতা'য় বাংলায় মতামত প্রকাশ করি, ঠিক বাংলায়। ('সঠিক' নয়, ওটা ভুল)

▶ চন্দ্রাণী ঘোষ

মনে হয় ভাষা নিয়ে যন্ত্রণাটা তারাই বেশি অনুভব করে যাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে এমন একটা জায়গায় এসে পড়তে হয় যেখানে চারপাশে কচিৎ কেউ তার নিজের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। যে রাজ্যে বেশিরভাগ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে সেখানে আজকাল জন্মের কিছুদিন পরেই মা, বা মা চাকুরিরত হলে, ঠাকুমা (যিনি নিজে সাকুল্যে ক'দিন স্কুলে যেতে পেরেছেন সন্দেহ) আত্মীয়বন্ধু বাড়িতে এলেই শিশুকে বলেন, 'নোজ কই, দেখাও তো তোমার নোজ। আর টাঙ্গ, টাঙ্গ। আর আইজ, আইজ। আর বেলি, বেলি'। যদিও প্রথম দিকে বাচ্চা আইজ বললে ছোট্ট জামাটা তুলে পেট দেখায়। ইয়ার বললে দু'বার চোখ পিটপিট করে চোখ দেখায়। তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পাখি-পড়া করে বলে-বলে ওগুলো গিলিয়ে দেওয়াই হয়। আর ওই প্লে-স্কুল না কী, সেখানে ভর্তির আগে 'হোয়াট ইজ ইয়োর নেম', 'হোয়াট ইজ ইয়োর ফাদার'স নেম', 'হোয়াট ইজ ইয়োর গ্র্যান্ড-ফাদার'স নেম' এসবও গিলিয়ে দেওয়া হয়। তিন বছরের শিশুকে সুন্দরী ম্যা'ম ইংরিজিতে নিজের নাম জিজ্ঞাসা করলে সে যদি বলে ফেলে 'মাই ফাদাল'স নেম ইজ অমুক' তবে তো খুব কেলো, ডিস-কোয়ালিফাই। বাবা-মা

ওই ধোকলা আর কেম ছো
মজা মা ছাড়া আর কিছু জানি না

রাতদিন ভেবেই আকুল 'আমার ছেলেটা (বা মেয়েটা) পিছিয়ে পড়ল, সমাজে মুখ দেখাব কেমন করে'। বাংলাভাষী রাজ্যের একটা অংশ এখন এরকমই এক অলীক প্রতিযোগিতায় শুরু থেকে দৌড়চ্ছে। এখন আর তাই আধো-আধো উচ্চারণে শোনা যায় না 'তাদ উতেচে ফুল ফুতেছে... বা ইকিল মিকিল ছাম চিকিল, চামেল কাটা মজুমদাল...।' অথচ স্কুলের বাংলা হোমটাস্ক-টা করছে ঠিকঠাক। আরও বড় হলে খুব কম সংখ্যক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পাবে বলে একটু 'আবোলতাবোল' বা আবৃত্তি শিক্ষকের শেখানো ছড়া সুর করে বলছে। আশ্চর্য লাগে যখন এ শহরে যেখানে আমি থাকি, আমার পাশের বাড়ির বছর পাঁচেকের মিষ্টি ছেলেটার সঙ্গে কিছুতেই আমি ভাব জমাতে পারি না কারণ ও কিছুতেই মারাঠি ছাড়া অন্য ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। তাহলে কি এখানে স্কুলে ভর্তির যোগ্যতার নিয়ম আলাদা? প্রথম প্রথম অদৃশ্য হাত জোড় করে রাখতাম মারাঠি সমবেত কোনও অনুষ্ঠানে। বলতাম (মনে মনে) 'ওহে আমি 'ইকড়ে-তিকড়ে' আর 'পুরে চলা' ছাড়া আর একবর্ণ জানি না, দয়া করো আমার ওপর'। একইভাবে গুজরাতিদের মাঝে ওই ধোকলা আর 'কেম ছো', 'মজা মা', ছাড়া আর কিছু জানি না। আবার প্রতি বৃহস্পতিবার উল্টোদিকের দক্ষিণ ভারতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হলে সারা সন্ধে দু'হাতে মাথা ধরে বসে থাকি। 'আয়াপ্পা' ছাড়া কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। আসলে নিজেদের ভাষার মধ্যে, সংস্কৃতির মধ্যে থাকতে পারার সৌভাগ্যে মনে হয় এইসব বাঙালি নিজের ভাষাকে ভালোবাসতে ভুলে গিয়ে অহেতুক প্রয়োজনের টানে ছুটছে। এক্ষেত্রে একটা কথা বলি, বিভিন্ন ভাষা শিখতে আমার ভালো লাগে। আর আমার মনে হয় ভাষা একটা মানুষের সঙ্গে অন্য একটা মানুষের সম্পর্ক গড়তে বেশ সাহায্য করে। এজন্য বাঁকুড়ার অখ্যাত এক জায়গায় একটিমাত্র হোটেলের ছেলেটাকে স্থানীয় উচ্চারণে কথা বলতে সে খুশি হয়ে নিজের ভাগের আলু ভাজাটুকুও উপুড় করে ঢেলে দেয় আমাদের পাতে। আবার মহারাষ্ট্রের একজন আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে গ্রামের অন্য বাড়িতে বেড়াতে গেলে শুধু মারাঠি সম্বোধনগুলো জানতাম বলে ওরা আমাকে কত ভালোবেসেছিল। আবার ওই গ্রামেই, যার ত্রিসীমানায় বাঙালির চিহ্ন নেই, সেখানে জন্ম থেকে মানুষ হওয়া আমার ওই আত্মীয়ের পুত্র দুটি যখন এক অক্ষর বাংলা পড়তে না পারলেও বাড়িতে নিজেদের মধ্যে বা আমাদের সঙ্গে প্রান্তিক বাঙাল ভাষায় কথা বলে তখন আনন্দ হয়।

আর হ্যাঁ, এখানে আমি বাংলাভাষীর একটা অংশের কথা

বই-টই

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

▶ বাংলা গদ্যের যাঁরা ইতিহাস লিখেছেন, কেউ-ই তাঁরা উপেন্দ্রকিশোরকে গুরুত্ব দেননি। প্রমথ চৌধুরির 'সবুজ পত্র'-র চলিত গদ্য নিয়ে হৈচৈ শুরু হওয়ার ঢের আগে উপেন্দ্রকিশোর অনবদ্য গদ্যে লিখেছিলেন **টুনটুনির বই**। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'টুনটুনির বই'-এর পুনর্মূল্যায়ন হোক।

▶ আমাদের শিশুসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সাগরপারের শিশুসাহিত্যের থেকে খুব কিছু কম নয়। আজও তবে এ বঙ্গের বা বহির্বঙ্গের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই বাংলা শিশুসাহিত্য পড়ানো হয় না কেন? এম এ-তে স্পেশ্যাল পেপারে কত বিষয়ই তো পড়ানো হয়। পড়ানো হোক না বাংলা শিশুসাহিত্য।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

▶ আমাদের ভিডিও ক্যামেরার সামনে তাঁর **স্তনদায়িনী** গল্পটি পড়তে পড়তে থেমে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী স্বগতোক্তির মতো বলে উঠলেন, 'এ কী করে লিখলাম! কীভাবে যেন লেখা হয়ে গেছে!'

'স্তনদায়িনী' বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির একটি বলে আমি মনে করি। 'স্তনদায়িনী'র আগে আমার অনুরোধে প্রথমেই পড়লেন **তালাক**। এই গল্পটিকে আমি গ্রামবাংলার মর্মোৎসারিত শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প বলে ভাবি। গ্রামবাংলার জীবনযাপনের ছন্দ ও জীবিকানির্বাহের দ্বন্দ্ব নিংড়ানো এরকম আরেকটি আশ্চর্য গল্প পড়েছিলাম বহুকাল আগে— গল্পটির নাম **রস**। লেখক, ছোটোগল্পের যাদুকর নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

অমর মিত্র

▶ **দশ লক্ষ বছর আগে** খুব সম্ভবত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ উপন্যাস। এই নভেলেটটি মানবজীবন, জিন প্রযুক্তি, জীবের টিকে থাকা, অবলুপ্তি— সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলেছে অননুকরণীয় ভঙ্গিতে। দশ লক্ষ বছর আগের একটি প্রাণী বাঘ দশা কোনওরকমে টিকে গিয়েছিল, সে রাতে বেরয় একা একা, বুড়ো লোকটি তাকে দেখতে পায়। কাহিনী বলা সম্ভব নয়, এই নভেলেটটি পড়লে ধরা যাবে লেখার ভেতরে কোথাও এক দৈবী পাগলামি আছে।

প্রেমচাঁদ কিষেণচাঁদের মতো লেখকরাও উর্দুতে লিখেছেন

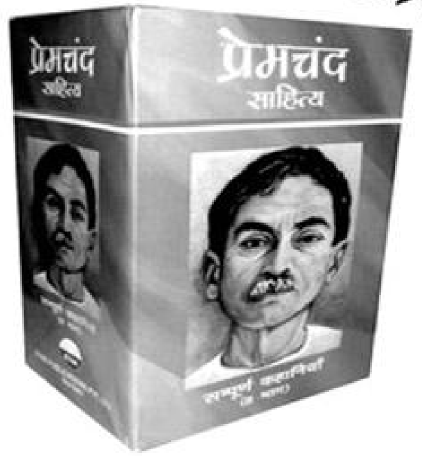

বলেছি। তাদের কথা এর মধ্যে আসছে না, যারা এখনও মন দিয়ে ভাষাটাকেই ভালোবাসে আর যাদের টানে এখন ওই দেশে যেতে ইচ্ছে করে আর যাদের সান্নিধ্য নিয়ে ফিরে এসে কিছুদিন আবার এদেশে কাটানোর জোর পাই।

▶ অরুণ চক্রবর্তী

(ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। 'বহির্বঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক)

'রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ' মানে 'আঞ্চলিক' তো নয়। রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ কেবলমাত্র একটি চলতি ধারণা। অফিশিয়ালি বলা হয় অহমীয়া, বাংলা এবং হিন্দি— মেজর ভারতীয় ভাষাগুলির অন্যতম। অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারেই হিন্দি ব্যবহৃত হয়। সুমন ভুল প্রচার করছেন। গান বাঁধলেই আই পি টি এ-এর বৈপ্লবিক সম্মান মেলে না।

▶ শমীক ঘোষ

অরুণ চক্রবর্তী স্যার, আপনার বোধহয় একটু ভুল হল। অফিশিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজেস অ্যাক্ট-এ এই কথাটা ছিল। ভারতবর্ষের কোনও রাষ্ট্রভাষা নেই। অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বলে কয়েকটা ভাষাকে চিহ্নিত করা আছে মাত্র। কিন্তু রাজভাষা বলে যে হিন্দির প্রচার চলছে, তা নিয়ে বার বার এত গন্ডগোল হল, সেটা কি ভুল? ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা পি এস ইউ-তে 'রাজভাষা' বলে একটা দপ্তর থাকে যাদের কাজ শুধু হিন্দি প্রচার করা। আমি যখন চাকরিতে ঢুকি তখন আমাকে লিখিত বয়ান দিতে হয়েছিল যে আমি হিন্দি জানি। আমার ভিজিটিং কার্ড থেকে স্ট্যাম্প— সবকিছু দ্বিভাষিক, শুধু হিন্দি আর ইংরিজিতে। মহারাষ্ট্রেও মারাঠি ভাষায় নেই। আর টেলিভিশনের মাধ্যমে বারংবার হিন্দি 'রাজভাষা' রাষ্ট্রভাষা— এটা কি প্রচার করা হয় না? আপনি কি জানেন যে আমি বাঙালি বলে যদি হিন্দি-র 'প্রাজ্ঞ' ইত্যাদি কোর্স করি, তাহলে ষোলো হাজার টাকা পুরস্কার পাব? বিশ্বাস না হলে এই সাইটটি দেখতে পারেন: http://rajbhasha.nic.in/ (ডিপার্টমেন্ট অব অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ-এর ওয়েবসাইট যেখানে লেখা রয়েছে— 'আমি হিন্দির মাধ্যমে প্রান্তিক ভাষাগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাই না বরং হিন্দিকেও ওগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাই')।

চন্দ্রাণী, ভাষা নিয়ে আপনার এই কথাটা খুব সত্যি। ভারি চমৎকার লিখেছেন। কোমল লাগল। কিন্তু ভাষার তো একটা রাজনীতিও আছে। আমি গুজরাতে অনেক বন্ধু পেয়েছি যারা তালের সাধ্যের বাইরে গিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আজও ফোন করেন। দীপাবলির দিন মিষ্টি পাঠাতেন বাড়িতে।

এরা আমার সহকর্মী নন। পথেঘাটে, অফিসের সূত্রে চেনা। আবার গুজরাতে আমি বাঙালি বলে যে পরিমাণ হেনস্থা হয়েছি, সেটাও ভুলতে পারি না। তফাত হল, আমি বলি আর কেউ কেউ প্রবাসী হওয়ার পর এই চাপটা না নিতে পেরে নিজেরাই বাঙালিদের গাল দেয়।

▶ অরুণ চক্রবর্তী

শমীক, আমরা মূল বিন্দু থেকে সরে আসছি। আমার মনে হয়েছে যে আমরা 'আঞ্চলিক', এটা বোঝাতে চেয়েই আপনি কবির সুমনের কথা তুলেছিলেন। এটা ঠিক নয়। বাংলাকে 'রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ' অর্থাৎ 'প্রাদেশিক ভাষা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বহু আগে থেকেই হিন্দি ভারতবর্ষের মূল ভাষা। কয়েক বছর আগে দমদমে যে ষষ্ঠ শতকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল, তাতে দেবনাগরী ভাষার লিপি পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিরা বাংলাকে তাদের রাজ্যের মুখ্য ভাষা করেনি। এর জন্য কে দায়ী? পশ্চিমবঙ্গে আবশ্যিকভাবে বাংলা শিখতে বাধ্য করা কীভাবে সম্ভব? আমার কাছে এর কোনও উত্তর নেই। (মূল বক্তব্য ইংরিজি থেকে অনূদিত)।

▶ শমীক ঘোষ

স্যার, আমি আপনার কথা বুঝতে পারলাম না। বাংলা ভাষা 'রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ' হতে পারে না। শুধু এই কারণে নয় যে এটি অন্য একটি দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা, বরং এজন্যেও যে ভারতের সংবিধান কখনও এরকম কোনও কিছু মেনে নেয়নি। আমি যতদূর জানি, হিন্দুস্থানি ও উর্দু নামে দুটি ভাষা ছিল। হিন্দি ভাষাটি অনেক পরে আসে। প্রেমচাঁদ, কিষেণচাঁদ-এর মতো বড় মাপের লেখকরাও উর্দুতেই লিখেছেন। হঠাৎই তাঁরা হিন্দিভাষী লেখক হিসেবে পরিচিত হতে লাগলেন। দেবভাষা সংস্কৃতের লিপি ছিল দেবনাগরী। কিন্তু হিন্দি কীভাবে দেবনাগরীর সমমানের হয়? 'প্রাদেশিক' শব্দটা 'রিজিওনাল' শব্দটার মতোই নেতিবাচক একটা শব্দ। আমি আসলে আলোকপাত করতে চেয়েছি যেভাবে 'ভারতবর্ষ' নামের এই অনবদ্য ধারণাটির বহুমাত্রিকতা (হেটেরোজেনিটি অব দিস ওয়ান্ডারফুল কনসেপ্ট কলড ইন্ডিয়া) 'এক ভাষা এক রাষ্ট্র' নীতির দ্বারা বারংবার বিধ্বস্ত হচ্ছে, সেই বিষয়টিতে। এটা খুবই ভীতিপ্রদ কারণ এই নীতির চর্চা থেকেই 'এক ভাষা এক ধর্ম' নীতির প্রবর্তনের পথ পরিষ্কার হবে। এটুকুই আমার বক্তব্য। (মূল বক্তব্য ইংরিজি থেকে অনূদিত)

▶ অরুণ চক্রবর্তী

স্যার, আপনার বক্তব্যে কিছু অসঙ্গতি আছে। হিন্দির অনুপস্থিতির কারণে প্রেমচাঁদ এবং অন্যান্যরা উর্দুতে লিখেছিলেন। না না, লোকের মুখে শোনা কথা বিচার করলে আমাদের চলবে না।

(মূল বক্তব্য ইংরিজি থেকে অনূদিত)

▶ শমীক ঘোষ

এ প্রসঙ্গে আরও কিছু বলুন, আর আমাকে স্যার বলবেন না। শব্দটায় ঔপনিবেশিকতার গন্ধ লেগে রয়েছে। আপনাকে বা এই গ্রুপের অন্য কয়েকজনকে স্যার বলা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই যেহেতু আপনারা আমার থেকে অনেকটাই বয়োজ্যেষ্ঠ। আমি এও বুঝলাম না যে ষষ্ঠ শতকে দেবনাগরী লিপির ব্যবহার কীভাবে সেই সময় থেকে হিন্দির উপস্থিতিকে প্রতিষ্ঠা করল। বাংলা মাগধী প্রাকৃত থেকে তৈরি হয়েছিল। আমি যদিও ভাষাবিদ নই। আরেকটা কথা, কতজন জানেন যে প্রেমচাঁদ এবং কিষেণচাঁদ উর্দুতে লিখতেন? এখন তাঁদের হিন্দি লেখক হিসেবে প্রচার করা হয় কেন?

দেখুন, আপনার মনে হতে পারে যে আমি হিন্দি-বিরোধী কিন্তু আমি আসলে তা নই। নির্মল ভার্মা আমার প্রিয় লেখকদের অন্যতম। আমার পক্ষে হিন্দি-বিরোধী হওয়া সম্ভব নয়। আরেকবার সুমনকে কোট করছি, "আমি চাই সাঁওতাল তাঁর ভাষায় বলবে রাষ্ট্রপুঞ্জে"। আমি ভারতবর্ষের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দিকে তুলে ধরার বিরুদ্ধে কারণ তা ভারতবর্ষ নামের বহুমাত্রিক ধারণাটিকে সমূলে গুঁড়িয়ে দেয়। আমার কিছু বই প্রয়োজন। আপনাকে অবজ্ঞা করা সম্ভব নয় আপনি এতটাই বিশিষ্ট মানুষ। উত্তর দেওয়ার আগে আমার আরও একটু সময় দরকার। কাজের চাপে মাথা খারাপ এখন।

(মূল বক্তব্য ইংরিজি থেকে অনূদিত)

▶ সুরজিৎ ঘোষ

এটা একটা অসাধারণ তরজা। দুজনই বাঙালি। বাংলা ভাষা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, অথচ পুরোটাই ইংরিজিতে।

▶ অরুণ চক্রবর্তী

আমার কলোনিয়াল আতঙ্ক নেই। ইংরিজি ভারতের মুখ্য ভাষাগুলির অন্যতম। মৌলবাদী ভাবধারাকে আমি ঘৃণা করি। আমাদের ভেতর থেকে উন্নত হতে হবে। যেভাবেই হোক বাংলাকে কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে, এটা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় সেটা বোঝা যাবে যদি আমরা জানি যে কেন ইংরিজি এখনও ভারতীয় ভাষাগুলির একটা আর কেন ফারসি কেবল স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েই থেকে গিয়েছিল, আর কেন বাংলা রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি ভাষা। (মূল বক্তব্য ইংরিজি থেকে অনূদিত)

▶ অমর মিত্র (গল্পকার-ঔপন্যাসিক। 'অশ্বচরিত' উপন্যাসের জন্য ২০০১ সালে বঙ্কিম পুরস্কার ও 'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাসের জন্য ২০০৬ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত)

চমৎকার আলোচনা হচ্ছে, আরও হোক।

▶ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় (কবি, 'বৈখরী ভাষ্য' পত্রিকার একজন সম্পাদক)

হিন্দি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়া উচিত।

বই-ঠেক

অমর মিত্র

▶ **কালো রুটি** এক অখ্যাত লেখক সমীর রায়চৌধুরির লেখা উপন্যাস। এক তেরো বছরের কিশোর খাওয়ার জন্য কলকাতার উত্তরভাগে ছুটে বেড়ায়। ক্ষুধা আর ক্ষুধার্তের এমন ভয়ানক কাহিনি আমাকে স্তম্ভিত করেছিল অনেকদিন আগে। দারিদ্র্য কত নিদারুণ হতে পারে তা শহরতলির পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে টের পাওয়া যায়। আবার পড়তে গিয়ে ম্যাক্সিম গোর্কির **মাই চাইল্ডহুড**-এর কথা মনে পড়ে যায়। সমীর রায়চৌধুরি অকালপ্রয়াত।

▶ **ভয় ভয়** তরুণ লেখক জয়ন্ত দে'র উপন্যাস। এক নিতান্ত মধ্যবিত্ত ব্যক্তি তার বাড়িটি প্রোমোটারকে দিয়ে ফ্ল্যাটের অপেক্ষায়। বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়, লোকটি অপেক্ষা করে, তার জমিতে ঘাসের জঙ্গল, বাড়ি ওঠে না। সে প্রত্যহ খোঁজ করতে যায় অসামাজিক প্রোমোটারের ঘাঁটি এক নির্মীয়মাণ বহুতলে। ওখানে একদিন জ্ঞানহারা হয়ে কোমায় চলে যায়। উপন্যাস হয়তো এখানেই শুরু। অজ্ঞান সেই মানুষ, লোভী জমি-হাঙর, এই সমাজ, দেশ— এ যেন এই ভারতবর্ষের আর এক চেহারা। অজ্ঞান দৃষ্টির রূপ।

উদয়ন ঘোষচৌধুরি

▶ অরুণেশ ঘোষের **গল্পসমগ্র ১** আঙুল ঠুসে দেয় আমাদের ঠুলি-পরা ন্যক্কতার চোখে। পরতে পরতে চিরে দেওয়া গদ্য, জ্যান্ত চরিত্র, প্রান্তিক স্বরক্ষেপণ— যা মূল বাজারে না-জানা। বাড়তি পাওনা গল্পগুলির ওপর লেখকের ডায়েরি-নিংড়ানো নোট। স্বাভাবিক দুঃখ— কলেজ স্ট্রিটের ধাঁধায় এ বইয়ের অনুপস্থিতি।

▶ **বাংলা স্ল্যাং-সমুচয় ঠিকুজীকুষ্ঠী:** অজিত রায়ের এই বই অশালীন? অনাচারিক? ভালগার? ইতরসুলভ? যৌনতাবাচক? প্রান্তিক? কী এবং কী নয়? সংজ্ঞার্থ, ভাষাতত্ত্ব, গড়ন, মেয়েলি চোরাগোপ্তা, ছলছুতো, সাহিত্যানুষঙ্গ— সবশেষে একটি অভিধান। কিছুটা অসম্পূর্ণ— লেখক বলেছেন, অর্থাভাবে। কেউ ভেবে দেখতে পারেন— একটি পূর্ণাঙ্গ রিসার্চের জন্য।

▶ **প্রিয় সুব্রত:** বইটির লেখক ভাস্কর চক্রবর্তী। প্রকৃত এক কবির কলমে সাবলীল গদ্য। একটু ব্যক্তিগত, তবু বোধ ও চেতনে সার্বিক। স্মার্ট ইস্ত্রির নীচে প্রিয় ফুসকুড়ির মতো। কমলকুমার মজুমদারের অসম্ভব লাগসই প্রচ্ছদ— ক্যালিগ্রাফি-কেরামতির জ্বলজ্বলে এক উদাহরণ।

স্বাধীনতার এত বছর পরে ওটাকে পাল্টানোর কোনও প্রয়োজন দেখি না। হিন্দি ভারতবর্ষেরই একটি ভাষা, এটা মনে রাখা দরকার। বাংলা ভাষা নিজেদের রাজ্যের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত বলেই মনে হয়। কিন্তু আমি যদি গুজরাতে গিয়ে দেখি সব গাড়ির নম্বর গুজরাতিতে লেখা, সেটা আমার একদমই ভালো লাগবে না, কারণ আমার অসুবিধা হবে খুব। রাজ্যের ভাষা ছাড়াও অন্তত হিন্দিতে সেটা লেখা থাকা উচিত। মহারাষ্ট্র কিছু জিনিস ভুল করছে বলে আমাদেরও বদলা নিতে সেটাই করতে হবে, এটা ঠিক নয়। আজকের বিশ্বে তো নয়ই।
নিজেদের ভাষা শেখো, প্রচার করো, কিন্তু গোঁড়াবাদী হতে চাই না। গুজরাতিদের মধ্যে কতজন সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামায় আর কতজন ব্যবসা নিয়ে। তা বলে কি আমরাও তাই অনুসরণ করব? কেন করব? তবে হ্যাঁ, আমাদের ভাষাশিক্ষা যেহেতু রুজির সঙ্গে যুক্ত, সেইজন্যই হয়তো বাংলা অনেক ক্ষেত্রে আমরা শুদ্ধ চর্চার মধ্যে রাখি না। বাংলা যদি কর্মক্ষেত্রেও কাজে লাগত তাহলে সত্যিই ভালো হত। গুঁতো থাকলে আমরা শিখি তাড়াতাড়ি। কিন্তু একটা জিনিস ভাবি, এত এত বাংলায় এম এ করা ছাত্রছাত্রী দেখি— এত "ভোঁতা" যে মনে হয় ভাগ্যিস ওটা করিনি।

▶ অরুণ চক্রবর্তী

সব আলোচনা সদর্থক হবে তখনই, যখন বাংলাকে আমরা অফিশিয়ালি পশ্চিমবঙ্গের স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারব। সেটার জন্য বাংলা ভাষাপ্রেমীরা চুপ করে আছেন কেন? অনেক লড়াই, অনেক কষ্ট করতে হবে, সেই ভয়ে? এইজন্যেই বাংলা-বাংলা বলে কাউকে চিৎকার করতে দেখলে হাসি পায়।

▶ শমীক ঘোষ

অনির্বাণ বলেছেন, 'হিন্দি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়া উচিত। স্বাধীনতার এত বছর পরে ওটাকে পাল্টানোর কোনও প্রয়োজন দেখি না'। কী মুশকিল! হিন্দি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হল কবে থেকে? অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্টটা ভালো করে দেখতে বলছি। ভারতবর্ষের কোনও রাষ্ট্রভাষা বা রাজভাষা নেই। যা আছে তা হল খানকুড়ি অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। অরুণ চক্রবর্তী ভালো লিখেছেন। কিন্তু বেশ কয়েকজন গলা তুলে বাংলা বাংলা বলে না চেঁচালে সেটা কোনওদিনও হবে না।

▶ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

শমীক, হিন্দি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা নয় বলেই তো বললাম যে হওয়া উচিত।

▶ দোলনচাঁপা চক্রবর্তী

অনির্বাণ, শমীক... "ওরা কেবল, কথার পাকে নিত্য আমায় বেঁধে রাখে"!

▶ অমর মিত্র

পশ্চিমবঙ্গে যারা থাকেন, তাদের বাংলা পড়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। হয়নি, এখানে অবাঙালির শক্তি বেশি, তারা সরকারকে করতে দেয়নি। শুনেছি এতে একজন মন্ত্রী অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন— এটা কয়েক বছর আগেকার কথা। স্কুলশিক্ষায় এটি করতে প্রস্তাব এসেছিল। এখানে সবটাই ভোটের রাজনীতি।

▶ দোলনচাঁপা চক্রবর্তী

সব জায়গাতেই ভোটের রাজনীতি অমরদা। কিন্তু এমন নিশিতে পাওয়া জাত আর একটাও দেখি না!

অনির্বাণ, তুমি বলছিলে, গুজরাতে গিয়ে সব গাড়ির নাম্বার-প্লেট গুজরাতিতে দেখলে তোমার অসুবিধা হবে। নিশ্চয়ই হবে, বিরক্ত লাগবে। কিন্তু কী জানো, এভাবেই আমরা ওই ভাষাটা খুব তাড়াতাড়ি শিখেও যাব।

নিজের প্রতিবেশী ক'টা রাজ্যের ভাষা আমরা জানি? হিন্দি বলয়েই হিন্দি ব্যতীত আরও অনেক ডায়ালেক্ট চলে, যা হিন্দির চেয়ে অনেক শ্রুতিমধুর, বলাও সহজ। কিন্তু হিন্দি জানা-বোঝার কারণে আমরা সেগুলো শিখতেও চেষ্টা করি না, কাজ তো চলে যায়— তাহলে আর কী দরকার! অথচ সত্যিই দরকার আছে।

মৈথিলী বলতে পারলে একজন মৈথিলীভাষী মানুষের যত কাছে যাওয়া যায়, হিন্দির মাধ্যমে তা কখনওই সম্ভব নয়। আর, দক্ষিণীরা তো হিন্দি বলেই না— বরং ইংরিজি প্রেফার করে, কিন্তু হিন্দি নয়। আমাদের ভাবা উচিত, এই বিতৃষ্ণার কারণ কী।

হিন্দির জন্যই বরং আমরা আরও বেশি রিজিড হয়ে পড়ছি অন্য ভাষাভাষীদের সেন্টিমেন্টের ব্যাপারে, ও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ নষ্ট হচ্ছে। হিন্দি, ইংলিশ শিখলেই কাজ চলে যায় সর্বভারতীয় স্তরে— কে আর বাংলা পড়ে সময় নষ্ট করে। বাংলায় এম এ করা শিক্ষার্থীরা dull হলে সেটা তাদের দোষ, আমার ভাষার দোষ নয়।

▶ অমর মিত্র

দোলনচাঁপা, কে বোঝাবে এই জাতিকে, বাংলা ভাষার প্রতি এদের কী তুচ্ছতা! অন্য প্রদেশ পারলে আমরা পারব না কেন? আমাদের সব তো ভিনপ্রদেশি বেনিয়াদের কাছে বাঁধা দিয়ে রেখেছি, ভাষাও। আসলে রাজনৈতিক দলগুলি সরব না হলে কিছুই করা যাবে না। লোক দেখানো পয়লা বৈশাখ আর পঁচিশে বৈশাখ পালন হবে। সাইন বোর্ডে কালি লেপা হবে।

▶ দোলনচাঁপা চক্রবর্তী

একদম তাই অমরদা। মজার ব্যাপার হল, বড়বাজারের মারোয়াড়িরাও তাদের গদিতে যাওয়া বাঙালিদের সঙ্গে যেটুকু বাংলা বলে, আমাদের পরের প্রজন্ম রিয়েলিটি শো-এর দৌলতে সেটুকুও শিখছে না। রাজনৈতিক নেতাদের দায় পুরোটা নয়। মায়েদের চটজলদি যশের আকাঙ্ক্ষাও বাঙালি শিশুদের বাংলার শিকড় থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

▶ অরুণ চক্রবর্তী

দোলনচাঁপা, আমরা যারা বহির্বঙ্গে থাকি তাদের কাছে কিন্তু অন্য ভাষা জানাটা নিজের বাংলা ভাষাকে আরও ভালোবাসার পরিচয়। হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল 'নিরালা' বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্ক জুড়েছিলেন। এমনকি, তাঁর অনুজ কবি (জ্ঞানপীঠ পুরস্কৃত) সুমিত্রানন্দন পন্থের প্রশ্নের উত্তর দিতেন বাংলায়, কবিতা লিখে। এ তাঁর বাংলা ভাষার প্রতি বশ্যতা ছিল না, ছিল আপন ভাষার প্রতি আনুগত্য। গতবছর দিল্লিতে বহির্বঙ্গ উৎসবে আয়োজন করেছিলাম সর্বভারতীয় ভাষার কবিসভা। বাংলার বড় মাঝারি ছোট অনেক কবিই (নবনীতা দেবসেন, সব্যসাচী দেব প্রমুখ) ছিলেন সেই সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে। সেখানে ভিন ভাষার অধিকাংশ কবিই বাংলায় নিজেদের কবিতার পরিচয় দিয়ে তারপর নিজেদের ভাষায় কবিতা পাঠ করেন। মৈথিলী কবি গঙ্গেশ গুঞ্জন তো মৈথিলী ও বাংলা, দুটি ভাষায় দুটি কবিতা পাঠ করলেন। অন্যদিকে বাংলার একজন কবিও একটি বাক্যও হিন্দি বা ইংরিজিতে বলার প্রয়াস করেননি। 'আমরা জানি আমরা জানি' বলে ভিনভাষী কবিরা আমাদের কবিদের অস্বস্তি নিবারণ করছিলেন। আমি যদিও অনুষ্ঠানের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে বাংলা-ইংরিজির মিশেলে সঞ্চালন করছিলাম, তবু কেউ কোনও ইঙ্গিত গ্রহণ করেননি। ভাষা নিয়ে একি আমাদের উন্নাসিকতা? জানি না। অথচ, এই থ্রেডে দু-দুবার উল্লেখ করার পরেও একজনও খেয়াল করলেন না যে, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা সরকারিভাবে রাজ্যের স্বীকৃত ভাষা নয়। তবু কথা কথা কথা...

▶ শমীক ঘোষ

স্যার, আমার মনে হচ্ছে হয় আমি সংশয়ে রয়েছি অথবা অন্যদের সংশয়াম্বিত করে ফেলছি। মন্তব্য করার জন্য বিষয়টা সামান্য হলেও বোঝা দরকার এবং অন্যদের মন্তব্যগুলো পড়া দরকার। আমি,

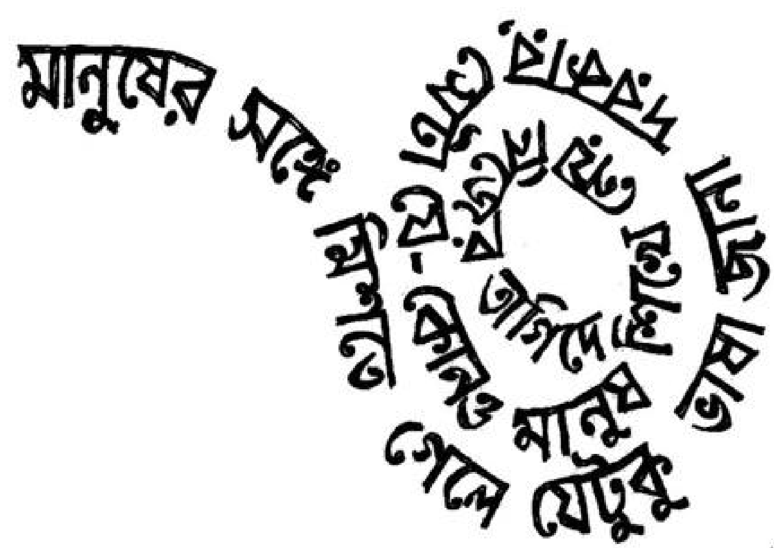

ব্যক্তিগতভাবে আমেদাবাদে থাকাকালীন প্রথম মাসেই গুজরাতি ভাষা পড়তে শিখে নিয়েছিলাম। তবে গুজরাতি ভাষায় কথা বলতে আমার আরও তিন-চার মাস লেগেছিল। মারাঠি এমন একটা ভাষা যা আমি সব সময়ই শিখতে চেয়েছি যাতে আমি মারাঠি নাটক দেখতে পারি যা, সারা ভারতবর্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। আমি নেপালি ভাষা বুঝতে পারি, কষ্ট করে হলেও বোধহয় পড়তেও পারব এখনও। এতদসত্ত্বেও আমার হিন্দির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, যেহেতু আমি কোনওদিন হিন্দি শিখতে চেষ্টাই করিনি।

আপনি বারবার বলছেন যে বাংলা পশ্চিমবঙ্গের সরকারিভাবে স্বীকৃত ভাষা নয়। হিন্দি এবং ইংরিজি বাদেও, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি কাজ বাংলা, নেপালি এবং উর্দুতে (সম্ভবত অলচিকি-তেও) করা সম্ভব। মূল কথাটা হল পশ্চিমবঙ্গে যে সরকারি কাজ বাংলায় করা হয় না, তার জন্য একটি ধারণা দায়ী যে আইনি জটিলতা এড়ানোর ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাটা নিখুঁত নয়।

যদি এখানে কিছু ব্যতিক্রমও থাকত, অন্য সব বিষয়ের মধ্যে, সেটা আবার একেবারে গোড়ায় যা বলেছি তা থেকেই বেরিয়ে আসে। আপনার আগের মন্তব্যগুলোর মধ্যে পরিস্ফুট কয়েকটি খাপছাড়া ধারণা নিয়েও আমার কয়েকটা কথা বলার আছে।

আপনি লিখেছেন, 'রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ' মানে 'আঞ্চলিক' তো নয়! রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ কেবলমাত্র একটি চলতি ধারণা। অফিশিয়ালি বলা হয় অহমীয়া, বাংলা ও হিন্দি— মেজর ভারতীয় ভাষাগুলির অন্যতম। অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারেই হিন্দি ব্যবহৃত হয়।' জানতে চাইব যে, কোন বর্ণানুক্রম অনুসারে হিন্দি অহমীয়া'র আগে আসতে পারে। অথবা সম্ভবত, আপনি অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছেন, বোঝার সুবিধার জন্য দয়া করে ব্যাখ্যা করবেন?

সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত ষষ্ঠ শতকের মুদ্রায় দেবনাগরী লিপি থাকার কথা আপনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আপনি 'দেবনাগরী' শব্দটি ব্র্যাকেটের ভেতরে রেখে 'হিন্দি' কথাটাই ব্যবহার করেছিলেন। আপনি নিশ্চয়ই হিন্দি ও দেবনাগরীর মধ্যে কী পার্থক্য, তা জানেন। তাই আপনার এই কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না।

আমি একবার 'হিন্দুস্থানি' শব্দটা আমার কথায় উল্লেখ করেছি। হিন্দি, হিন্দুস্থানি এবং উর্দুর মধ্যে পার্থক্যগুলো জানতে চাইব আপনার কাছে।

ভারতীয় সংবিধান এবং সরকারি ভাষা কমিশনের আটটি এজেন্ডা সম্পর্কে কি আপনার ধারণা আছে? এই বিষয়ে আপনার ধারণা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জানতে পারলে আমাদের কথোপকথনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সুবিধা হবে। (আমার মন্তব্যটি আমি বেশ কয়েকবার মুছে লিখেছি। এর ফলে আপনাদের কাছে পৌঁছতে দেরি হয়েছে এবং তার জন্য আমি দুঃখিত)। (মূল বক্তব্য ইংরিজি থেকে অনূদিত)

▶ অমর মিত্র

ভূপালে ভারত ভবনে ১৯৮৮ সাল নাগাদ গিয়েছিলাম 'অন্তর্বর্তী' নামের একটি তিন-চার দিনের অনুষ্ঠানে। যে হিন্দিভাষী লেখক-কবিরা এসেছিলেন, তারা হিন্দি ব্যতীত এক বর্ণ ইংলিশও ব্যবহার করেননি। সকলে গল্প বা কবিতা ইংলিশে অনুবাদ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দি কবি বা গল্পকাররা ব্যতিক্রম। এই অভিজ্ঞতা আরও হয়েছে। বহির্বঙ্গ উৎসবে বাংলা জানা হিন্দি লেখক-কবিরা এসেছিলেন। যেহেতু এটি বাঙালিদের

বই-ঠেক

উদয়ন ঘোষচৌধুরি

▶ আহা ভাত প্রিয় ভাত: মাত্র দেড় ফর্মায় কুড়িটি ছটফটে কবিতা লিখেছেন প্রবীর মণ্ডল। 'খিদে' বিষয়টা যারা বোঝেন, কেঁদে ফেলবেন কিছু পঙক্তিতে। দেখতে পাই এক মাথা-উঁচু মানুষ— অভাবেও যিনি কবিতার স্পর্ধা রাখেন— উৎসর্গে তিনিই লিখতে পারেন: 'যারা খিদে পেলেও/আপনার দোরে যায় না'। শঙ্কর হালদারের একটি সুন্দর অলঙ্করণ, যা বোধহয় প্রচ্ছদে থাকলেই মানাত বেশি।

▶ খালাসিটোলা: সম্পাদনা: বারীন ঘোষাল দেশি মদের ঠেক— ধর্ম-বর্ণ-পেশা— সব সততার গেলাস উল্টে প্রকৃত সাম্যবাদ (একসেপ্ট জেন্ডার)। না-গেলে পাওয়া যেত না'আঁতেল' মেডেল। প্রিয় তালেবর লিস্টি: ঋত্বিক ঘটক, কমলকুমার মজুমদার, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শামসের আনোয়ার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বেলাল চৌধুরী, অমিতাভ দাশগুপ্ত... সেইসব সোনালি প্রায়-ইতিহাস ধরা এই সংকলনে। নানা কথা শেয়ার করেছেন; শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, উদয়ন ঘোষ, বারীন ঘোষাল, কমল চক্রবর্তী প্রমুখ।

▶ নিরাকৃত ভ্রাম্যমাণ তুমি: লিখেছেন অতনু ভট্টাচার্য। 'ঠাকুমার আমলের শিলনোড়া/ঘষতে ঘষতে এতটুকু স্মৃতিচিহ্ন/আজ তাকে ধুয়ে মুছে/ঠাকুরের সিংহাসনে তুলে রাখো, মা/আমাদের পারিবারিক চিহ্ন' —খোলসের থেকেও তস্যখোলসে যখন ঢুকে যাচ্ছে প্রাত্যহিক লড়াই— এ'বই ফিরিয়ে ডাকে ফিকে হতে-থাকা প্রিয়শৈশব। প্রচ্ছদ ও নামলিপি দূর থেকে টানে না। আরেকটু ভাবলে হত।

▶ সোনালি ডানার চিল:
নামকরণেই ধরতাই, জীবনানন্দের জীবনাশ্রয়ী এই উপন্যাস। তথ্যনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, ইতিহাসনিষ্ঠ। সুরঞ্জন প্রামাণিকের এই বইটি পড়ার পরে মনে হয়, তিমিরবিলাসী নন— প্রকৃত তিমিরবিনাশী। চমৎকার গদ্যভাষা। বারবার পড়বার মতো। বিশুদ্ধ নির্দেশের মতো। নিঃসঙ্গ চেতনার মতো।

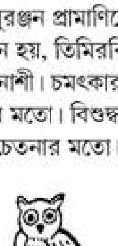

পশ্চিমবাংলায় বাংলা কাজের ভাষা হয়নি

উৎসব, সেখানে ব্যতিক্রম হয়েছে, আর ব্যতিক্রম হতেই পারে। ট্রেন্ড হল, হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করে তোলা। বহু মা-বাবা এই ভয়ে প্রথম ভাষা ইংরিজি ও দ্বিতীয় ভাষা হিন্দি পড়াতে শুরু করেছেন। পশ্চিমবাংলায় বাংলা কাজের ভাষা হয়নি, এটা সত্যি। আর, কাজের ভাষা না হলে নিম্নবর্গের ভাষা হয়ে যাবে ধীরে ধীরে, তাঁরাই বাঁচিয়ে রাখবেন আমাদের মায়ের ভাষাকে।

▶ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

দোলন, ভাষাশিক্ষাটা একটা স্তরের পর পছন্দের ব্যাপার। নিজ উদ্যম বা প্রয়োজনে মানুষ নতুন ভাষা শিখে নেয়। আমি ওড়িয়া ভাষায় শুধু কথা বলা শিখে গিয়েছিলাম কারণ, ভাষাটা সহজ, বাংলার বেশ কাছাকাছি এবং সেটা জানলে আমার কাজের সুবিধা হত। কিন্তু লিখতে বা পড়তে শিখিনি এবং তা নিয়ে আমার বিশেষ কোনও দুঃখ নেই। সার্ত পড়তে হলে আমাকে ফরাসি ভাষা জানতে হবে না— ইংরিজি জানলেই তো হল; আর, মানুষের সঙ্গে মিশতে গেলে যেটুকু ভাষা জানা দরকার, সেটা যে-কোনও মানুষ শিখে নেয় নিজের তাগিদে। আর অন্য প্রদেশে আমি যদি তিনদিনের জন্য যাই, তাহলে কি সেই তিনদিনের জন্য সেই প্রদেশের ভাষা শিখে নেব? আর, কোন ভাষা মিষ্টি বা মধুর, সেটা আপেক্ষিক ব্যাপার।

শমীক, লোকজনকে খুব প্রয়োজন না হলে 'স্যার' বলো না। দাদা না বললেও 'বাবু' বলে সম্বোধন করো না। অবশ্য তুমি আগে তার কারণ দিয়েছ, কিন্তু সেটা খুব একটা সুবিধার নয়। এটা গান নয়, কিন্তু পড়তে গিয়ে বড় চোখে লাগছে, আর কিছু নয়।

▶ শমীক ঘোষ

দুমদাম বাবার বয়সি লোককে 'দাদা' বলতে আমার আটকায়। আর 'বাবু' শব্দটা আমার একটুও ভালো লাগে না। কেমন টাক মাথা, খ্যাষটা পাঞ্জাবি পরে বাজার করতে যাচ্ছে মনে হয়। আমি 'মশাই' বলি। তবে স্যার মানেও মহাশয়।

কিন্তু আমাদের দেশে তার একটা অন্য মানে হয়ে যায় যেটা আমার পছন্দ নয়। আমাকে আমার অফিসেও কেউ স্যার বললে আমি আপত্তি করি। তবে দ্যাখো, তিনদিনের জন্য কেউ আমেরিকা থেকে এলে, সেও মুম্বই, দিল্লিতে দেবনাগরী সংখ্যায় হিন্দি দেখে বাসে উঠতে পারবে না। আমি নিজেই পারি না!

▶ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকা থেকে এসে কেউ বাসে ওঠে না সাধারণত। তবে হ্যাঁ, আইডিয়ালি, এয়ারপোর্ট বা ইন্টারস্টেট বাসস্ট্যান্ডে ইংরিজিতে অন্তত নির্দেশনাটুকু লেখা থাকা উচিত। আর বাইরের দেশ থেকে যেসব পর্যটক আসেন কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গায়, তাঁরা একটি অভিধান নিয়ে আসেন। যেহেতু আমাদের কোনও একক ভাষা নেই, তাই তাকে মুম্বই যেতে হলে জার্মান বা ফ্রেঞ্চ থেকে মারাঠি ইত্যাদি অভিধান কিনতে হবে যা কিনা বেশ দুষ্প্রাপ্য। সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়তো করা যায় না, কিন্তু একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরির কথা বলছিলাম। আর হিন্দি পড়ে আমরা যদি বাসে উঠতে না পারি, সেটা বেশ লজ্জার। সে আমরা বাঙালি হলেও লজ্জার, দক্ষিণ ভারতীয় হলেও লজ্জার... কাশ্মীরি হলে লজ্জার নয় অবশ্যই।

▶ শমীক ঘোষ

হিন্দি না-জানা লজ্জার কেন হবে? কলকাতায় থেকে বড় হওয়া, ব্যবসা করা ক'জন মারোয়াড়ি বাংলা পড়তে পারে?

▶ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

এখানে আমরা ধরেই নিচ্ছি যে যারা মন্তব্য করছে তারা এই বিষয় নিয়ে ভাবে বা ভাবতে ইচ্ছুক। যে-কোনও 'নেশন স্টেট'-এর নাগরিকের একটি কমন ভাষা জানা দরকার বলে আমি মনে করি। এটা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। তাই হিন্দি না পড়তে পারা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে একটু লজ্জাজনক।

▶ শমীক ঘোষ

তুমি ব্যক্তিগতভাবে কী মনে করো, তা নিয়ে বোধহয় কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে ভারতবর্ষের সংবিধান কী বলে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যখন রাজি হওয়া হয়েছিল, তখন কী বলতো। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোও যে চিরায়ত, এমন নয়। বিশেষ করে ভাষা-রাজনীতির কারণেও তাতে চিড় ধরতে পারে। বাঙালি এক কালে ব্যবসা করত। পরে ব্যবসা ব্যাপারটাকেই ঘৃণা করতে শুরু করে। মারোয়াড়িরা কলকাতায় যখন ব্যবসা শুরু করে তখন এমন সব ব্যবসা করত যেটা বাঙালিরা নাক উঁচু করে করত না। সমস্যা হল, অর্থনীতিটাই পুঁজিবাদী, তাই পুঁজি আছে যাদের তারাই শাসক। আর আমরা বাঙালিরা বেওসা-বেওসা করে এখন তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসী, নয়তো তোমার-আমার মতো অতিদূরে পর্যবসিত। প্রবাসী বাঙালিদের বিশেষত হিন্দির আধিপত্য মেনে নেওয়ার কারণ আছে, খুব অর্থনৈতিক একটা কারণ।

▶ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

গোটা আলোচনাটাই তো শুরু হয়েছিল কবির সুমনের লেখা দিয়ে। সেটা তো ওনার মন্তব্য বা এক্সপ্রেশন। সেখানে এই দেশের সংবিধান নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আসলে তো সবাই নিজেদের মতামতটাই প্রকাশ করছিল। বাঙালির হীনম্মন্যতার কথা কি সংবিধানে লেখা ছিল নাকি?

দোলনচাঁপা চক্রবর্তী সংকলিত

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা
গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে
জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

বইমেলায় ৩৫৬ নং স্টলে

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়

সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সংগীত ও পরিচালনা: **দীপক চৌধুরী**
অভিনয়: **সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে**
ভাষ্যপাঠ: **অনসূয়া মজুমদার**
গান: **স্বপন বসু ও আরও অনেকে**

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▶ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
Traveller
To be launched shortly
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in ● www.bhraman.com
www.ebhraman.com ● www.echhelebela.com ● www.ekarmakshetra.com
আরও অনেক বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

KALER KASHTIPATHAR □ Vol. 1 No. 9 □ 1 January 2013 □ Rs. 30 Title Code: WBBEN 14529/25/1/2012-TC □ Declaration No. 185 dt. 05/09/12

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

Editor Amarendra Chakravorty.

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

No. 1 Travel Magazine in India with the largest readership*

Available at Newsstand, also with Newspaper Hawker, OR

Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in

**Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q2*

Website: www.bhraman.com □ www.ebhraman.com